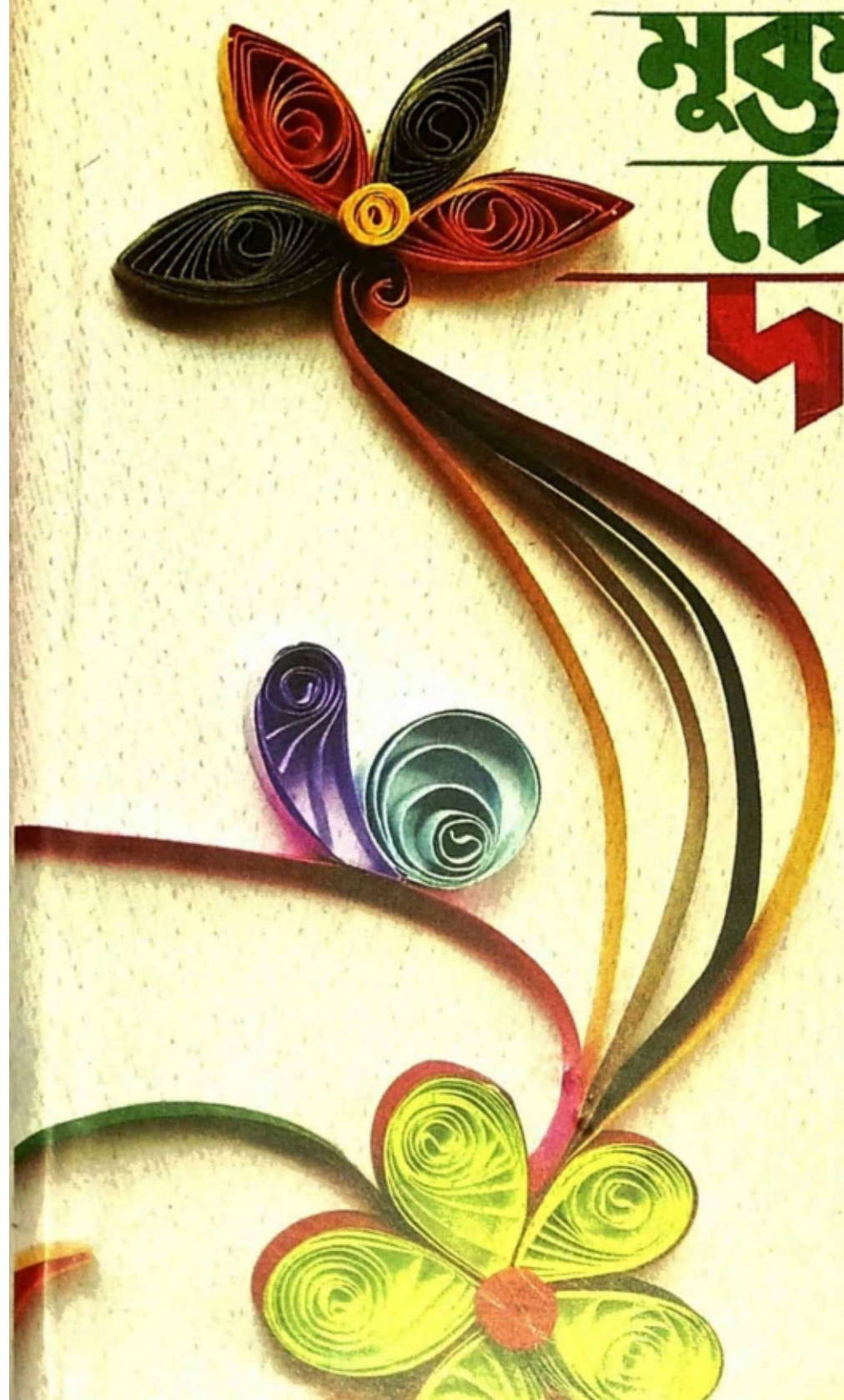
মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

মুক্তার চেয়ে দামী ৬



মুক্তার চেয়ে দামী

(একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মুক্তার চেয়ে দামী-৬

(একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড)

মূল

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

ইবনে মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.

যিম্মাদার : মুম্বাই, মারকায, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা ওমর ফাইয়ায

মাওলানা ফয়সাল ওমর

আকিক পাবলিকেশন্স ! এদারায়ে কুরআন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড) দোকান নং- ৪

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৪৭১১৩৩৬৫, ০১৩২৪২৫৪৬৪৮

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৯ ঈ., সপ্তম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঈ.

মুক্তার চেয়ে দামী-৬
(একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড)

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশক : মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
আকিক পাবলিকেশন্স
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৩৬৫, ০১৩২৪২৫৪৬৪৮
E-mail : akikpublication@gmail.com

পরিবেশক
কথাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : +৮৮০২ ২২৩৩৫২০৭৩, ০১৩২৪-২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা- ১১০০
ফোন : +৮৮০২ ৪৭৩৯১৯২৫, ০১৩২৪-২৫৪৬৩৫

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

মূল্য : ৬০০/= (ছয়শত টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-93071-9-8

উৎসর্গ–

মাওলানা ইলয়াস কান্ধলভী রহ.

তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা

আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার যিনি দিয়েছেন বাকশক্তি ও কলম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা। দুরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূলের সমীপে যিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী সৃজনশীল প্রকাশনার জগতে **'আকিক পাবলিকেশন্স'** একটি অনন্য নাম। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী বই-পুস্তক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প-উপন্যাস ও জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা ইউনুস পালনপুরী'র ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার "বিখরে মোতী" গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ **'মুক্তার চেয়ে দামী'** গ্রন্থটি'র একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড একত্রে প্রকাশ হচ্ছে। লেখক কুরআন-হাদীস, নবী-সাহাবী এবং বুযুর্গানেদীনের অমূল্যবাণী ও তাঁদের নন্দিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মণি-মুক্তা দ্বারা গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন। ইসলামী মননশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান। যা আহরণ করে ইহকাল ও পরকালের জীবন সফল ও স্বার্থক করতে সহায়ক হবে। ইতঃপূর্বে লেখকের প্রথম থেকে দশম খণ্ড পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই খণ্ডটিও পাঠক মহলকে উপকৃত করবে।

পরিশেষে দয়াময় আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং লেখক, প্রকাশক ও একাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং পরকালে নাজাতের ফয়সালা করেন। আমীন॥ —প্রকাশক

সূচি

একাদশ খণ্ড

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত----২১
টাকা ঘরে রাখতে রাখতে কমে যাচ্ছে----২১
তাহাজ্জুদে ওঠো এবং এই দোয়া পড়ো----২২
অন্তরে কল্যাণ থাকলে আল্লাহ কল্যাণ দেবেন----২৩
বিস্ময়কর তিন সদকা----২৪
অতীত দুঃখ-কষ্ট মনে পড়লে----২৫
সবচে বড় ঈমানদার কে?----২৫
ক্রুদ্ধ অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখো----২৬
রসূলের ইনতেকালের পর অদৃশ্য ঘোষণা----২৮
তাওবা সম্পর্কে এক আশ্চর্য হাদীস----২৯
আল্লাহ ক্ষমা করবেন----২৯
ইবরাহীম আ. আল্লাহর বন্ধু হওয়ার কারণ----৩০
জান্নাতী ও জাহান্নামী----৩১
ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছে কুরায়শের প্রশ্ন----৩২
গোপন সদকার ফযিলত----৩৩
তিন সৌভাগ্যবান ও তিন হতভাগা----৩৩

মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের উপমা----৩৪
ক্ষমা করো, তোমাকে ক্ষমা করা হবে----৩৫
চড়া মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে শস্য মজুদ করা অন্যায়----৩৫
ঋণগ্রস্থকে অবকাশ দাও----৩৬
যে ফেতনা থেকে বেঁচে যায়----৩৮
সুরা ইউসুফের বিশেষ ফজিলত----৩৮
পরস্পরকে ভালোবাসো----৩৯
এক বিস্ময়কর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা----৪০
তাবুক যুদ্ধের তীব্রতা----৪১
উম্মতের জন্য সুসংবাদ----৪২
ব্যাঙ মেরো না----৪২
দুঃখ কষ্ট দূর করার দোয়া----৪৩
সম্পদ বিলীয়মান ছায়া----৪৩
কালো কুকুর শয়তান----৪৪
মুসলমানদের আমলের রূপ----৪৪
হাওয়া আ.-এর কারণেই গর্ভযন্ত্রণা----৪৫
মৃত্যুর সময় দীনদার ও বেদীনের অবস্থা----৪৫
হাশরের মাঠে রসূল সা.-এর সুপারিশ----৪৮
এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতী----৫০
আল্লাহ তাআলার কুদরত----৫০
দৃষ্টিকে সংযত করলে অন্তর পবিত্র থাকে----৫৪
মুনাফিকের মুখ মুমিন আর অন্তর কাফের----৫৬
হযরত ইয়াকুব আ.-এর চিঠি----৫৭
গুনাহের কারণে বান্দা রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়----৫৮
কৃপণ ও দাতার উপমা----৫৮
গোপন দোয়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়----৫৯
আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করো----৬০
নুহ আ. ছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা----৬১
শেষ যুগে হাফেযদের অন্তর থেকেও কুরআন মুছে যাবে----৬২
নেক ও মন্দের পরিণাম----৬২
আকাশ ও পৃথিবীর সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে----৬৩
দুই শরিক ব্যবসায়ী----৬৪
স্বপ্নে আল্লাহর সাথে রসূল সা.-এর সাক্ষাত----৬৭

সুরায়ে আ'লার বিশেষ ফযিলত----৬৮
দীনের ওপর অটল থাকা কঠিন----৬৮
ক্ষমা শান্তি দেয়----৬৯
রসূল সা.-এর বিস্ময়কর নসিহত----৭০
দা'ঈর দশটি গুণ----৭১
মুনাফিকের আলামত----৭৩
স্বামী-স্ত্রীর ঘটনার সূত্র----৭৩
আল্লাহ নির্বোধদের নেতৃত্ব থেকে রক্ষা করুন----৭৪
বাড়ি থেকে দীনের নিয়তে বের হও----৭৫
আলী রা.-এর ফয়সালা----৭৫
দানের ফযিলত----৭৭
তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো----৭৭
দাওয়াতের কাজকে নিজের কাজ বানাও----৮৩
এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত----৮৫
এক ইংরেজের ইসলাম গ্রহণ----৮৯
এক দরিদ্র ধোপীর বরকতে ধনী নারীর ইসলাম গ্রহণ----৯০
রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখার একটি পরীক্ষিত আমল----৯১
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা----৯১
আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্ত----৯৩
অন্ধ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ----৯৪
পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্থদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ----৯৪
আপনি যদি অসহায় ও নিঃস্ব হন----৯৪
যদি আপনি অশিক্ষিত কেউ হন----৯৫
এমন ভুল না করা উচিত----৯৬
জীবনের আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া না হওয়া----৯৬
হতাশা দূর হয়ে যাক----৯৭
প্রকৃত বন্ধু আমাদের জন্য আয়নার মতো----৯৭
এমন অহমিকার পরিণাম----৯৮
একটি ঘটনা----১০০
সঠিক দিক নির্দেশনা ছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব----১০১
আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক----১০৪
দাওয়াতের কাজ বড় পরীক্ষা----১০৮
তাওবাকারী মুরিদ----১১৬

হাশরের মাঠের এক প্রশ্ন ১২৩
আপনি এবং আপনার প্রতিবেশী ১২৭
ইবাদত ও আনুগত্যের হকদার কে? ১২৯
মুমিনের সব অবস্থাই কল্যাণকর ১৩৩
নিজের মন থেকে উত্তর নিন ১৩৬
আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্খা ১৪০
মালিককেই ডাকো ১৪৩
ভাগ্যের দোষ দেবেন না ১৪৭
কুরআন তিলাওয়াত ১৪৯
মৃত্যুর দুয়ারে ১৫৬
আল্লাহর রহমত লাভের আশা ১৬১
কৃতজ্ঞতা ও কল্যাণকামী ১৬৫
আমলে খায়রের বন্ধন ১৬৮
মন্দের সঙ্গে সমঝোতার ভয়ানক পরিণতি ১৭০
পরকালের ভাবনা ১৭৫
ঝুঁকির মুখে ঈমান ১৭৮
হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার উপায় ১৮০
পাপীকে ঘৃণা নয়, সংশোধনের কথা ভাবুন ১৮৫
বন্ধু দিয়ে মানুষ চেনা যায় ১৮৮
সাহাবীদের নামে মসজিদের নাম রাখুন ১৮৯
ইহকাল ও পরকালে কুরআনই যথেষ্ট ১৯০
কুরআন শরীফের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব ১৯০
মুক্তার চেয়ে দামী গ্রন্থটি সম্পর্কে ১৯২
রসূল সা.-এর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যাবলি ১৯৩
রসূল সা. এর শানে কবিতা ১৯৫
একটি ভাবনা ১৯৬
জ্ঞানীদের কিছু বাণী ২০০
সোনার হরফে লেখা একটি বাণী ২০০
সক্রেটিস-এর বাণী ২০০
হযরত আলী রা. এর বাণী ২০১
হযরত হাসান বসরী রহ. এর বাণী ২০১
আরও কিছু বাণী ২০২

সূচি

দ্বাদশ খণ্ড

পাপ করার পর অজুহাত খোঁজা----২০৫
তাকওয়া ও জুলুম----২০৭
সরল পথ থেকে সরে যাওয়া----২০৯
তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি----২১১
আল্লাহই দাঈকে সাহায্য করেন----২১৩
মুনাফিক কথায় সবার আগে, কাজে সবার পেছনে----২১৫
মুনাফিকরা রসূলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ভাণ করতো----২১৬
মুনাফিকের আরেক রোগ অন্তরের কপটতা----২১৭
প্রতিটি মানুষের ভেতরই বড় হওয়ার স্বপ্ন থাকে----২১৮
কোনো কোনো ধারণা পাপ----২১৯
মুনাফিক মানুষকে শুধু নিজের কথা শোনাতে চায়----২২০
মুনাফিক স্বার্থপর হয়----২২১
মুনাফিক দুনিয়া পূজারী হয়----২২২
দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়----২২৩
আল্লাহর নাম শুনলে প্রকৃত মুমিনের অন্তর আলোড়িত হয়----২২৬
আল্লাহই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী----২২৮
জান্নাত কার জন্য?----২৩০
হকের জন্য বাস্তুহারা ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য পায়----২৩২

বিপদ এলে আল্লাহকেই স্মরণ করুন----২৩৩
যদি আসমানী কিতাবের বাহকরাই বিগড়ে যায় তখন কী হয়?----২৩৫
জান্নাত কারো বংশীয় সম্পত্তি নয়----২৩৬
দুনিয়া পূজা ও পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ----২৩৮
জ্ঞান মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির পেছনে চলতে বাধা দেয়----২৪০
প্রবৃত্তির চাহিদাই সবচে বড় পৌত্তলিকতা----২৪২
একজন দাঈ অবশ্যই দীনদার হবেন----২৪৩
দাঈকে ধৈর্যশীল হতে হয়----২৪৪
কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়----২৪৫
এ পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে বিপদাপন্ন----২৪৬
দম্ভ পথভ্রষ্টতার মূল কারণ----২৪৮
ইহুদিরা আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না----২৫০
হক পৃথিবীতে আল্লাহর মানদ- প্রতিষ্ঠা করে----২৫২
যে বান্দার ওপর আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন----২৫৪
মুনাফিক প্রকাশ্য দীনদার ও গোপন বেদীন----২৫৬
মসজিদ মুসলিম সমাজের হৃৎপি-ের মতো----২৫৮
প্রবৃত্তি পূজারীরা বাস্তবতা বুঝতে পারে না----২৬০
কখনো শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হয়----২৬২
কোনো বিষয় বুঝতে বুদ্ধিমত্তা জরুরি----২৬২
আল্লাহর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার পরিণতি----২৬৩
মানুষের অন্তরেই আল্লাহর প্রতিনিধি রয়েছে----২৬৫
মানুষ সহজে মুক্তি পেতে চায়----২৬৭
পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ----২৬৮
মুনাফিক শপথ করে নিজের কথা বিশ্বাস করাতে চায়----২৬৮
তারা বুযুর্গদের আসনে বসে, নিজে বুজুর্গ হতে পারে না----২৭০
মানুষের সূচনা এক তুচ্ছ শুক্রকিট থেকে----২৭২
দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ধ্বংস ডেকে আনে----২৭৪
ভ্রান্ত নেতা ও সাধারণ মানুষ----২৭৫
শয়তানকে ভাই বানিয়ো না----২৭৭
মুনাফিক ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়টি বরবাদ----২৭৮
শুধু মুখে মুখে তওবা করলেই তওবা হয় না----২৭৯
কিতাবী জাতি যখন পথভ্রষ্ট হয়----২৮১
মানুষ অবাধ্য হলে প্রথম তার জন্য সতর্কবার্তা আসে----২৮২

দুনিয়াবিরাগীরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে----২৮৪
মুমিন ও মুনাফিকের লক্ষ্য----২৮৬
মুনাফিক আল্লাহকে ভয় না করে বান্দাদের ভয় করে----২৮৮
মুনাফিক স্বার্থে আঘাত এলেই পেছনে হটে যায়----২৯০
কেউ সত্যিই দীন মানে আর কেউ মুনাফেকি করে----২৯২
অধিকাংশ মুনাফিকই ছিলো সম্পদশালী----২৯৪
মুনাফিক মানুষের ভয়ে দীনদার সাজে----২৯৫
মুনাফিক ও মুরতাদ ভিন্ন রূপে অভিন্ন দল----২৯৭
মুনাফিকরা দুনিয়াদারের প্রতি ঝোঁকে----২৯৯
মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য----৩০০
মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা থাকে----৩০১
মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য----৩০২
মুনাফিক সম্পদ ও সম্মান চায়----৩০৩
দীনি কাজে পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আসবে----৩০৫
অহংকার হককে মানার ক্ষেত্রে সবচে বড় প্রতিবন্ধক----৩০৬
দীনের মূল শিক্ষা তাওহীদ----৩০৭
সৃষ্টিজগতের এক নিরব ঘোষণা----৩০৯
নামায মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে----৩১১
দুনিয়ায় অবিশ্বাসীরাই বেশি দাপুটে ও শক্তিশালী হয়----৩১৩
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সমাজের বড় শত্রু----৩১৫
সকল মানুষ জন্মগতভাবে এক----৩১৬
অধিক সম্পদ জবাবদিহিতা বাড়িয়ে দেয়----৩১৮
দুনিয়ার জীবন কয়েকদিনের তামাশা মাত্র----৩১৯
আল্লাহ মানুষকে কান, চোখ এবং অন্তর কেনো দিয়েছেন----৩২০
প্রত্যেকেই নিজের নেতাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়----৩২২
আল্লাহর জন্য নিজের বড়ত্ব মিটিয়ে দাও----৩২৩
মানুষ দুনিয়ার জন্য দীন ছেড়ে দেয়----৩২৪
সত্যিকার দীন খুঁজে বের করা কঠিন----৩২৪
দাওয়াতে দূরদর্শিতা ও কল্যাণকামিতা জরুরি----৩২৫
দাঈর সবচে বড় হাতিয়ার হলো ধৈর্য----৩২৭
প্রকৃত নেককাজ খোদাভীতি কমায় না----৩২৯
প্রকৃত দাঈ ব্যক্তিগত আক্রমণ করে না----৩৩০
হকের জন্য লাঞ্ছিতরাই মূলত সম্মানিত----৩৩১

হঠকারিতা মানুষকে সুপথে ফিরতে দেয় না----৩৩২
যারা বাকপটুতায় মানুষকে প্রভাবিত করতে চায়----৩৩৩
হক না মানার জন্য আন্দোলন করা বড় অন্যায়----৩৩৪
আল্লাহর নেয়ামতকে নিজের যোগ্যতায় অর্জিত মনে করে----৩৩৫
জীবনের সফলতার মাপকাঠি আখেরাত----৩৩৬
মুসলিম নেতার উচিত কোমল হৃদয় এবং নম্রভাষী হওয়া----৩৩৭
দীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত বিষয়----৩৪০
ভ্রান্তির পক্ষেও দলিল থাকে----৩৪১
আল্লাহ মানুষকে হক ও বাতিল চেনার যোগ্যতা দিয়েছেন----৩৪৩
আল্লাহর দৃষ্টিতে জীবিত কে----৩৪৪
পবিত্রাত্মাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক----৩৪৬
শয়তানের ধ্বনি বেশি আকর্ষণীয়----৩৪৮
মু'জিযা দেখিয়ে মুগ্ধ করার নাম দীন নয়----৩৫০
অন্তরের আওয়াজ আল্লাহরই আওয়াজ----৩৫২
ক্ষমতা পেয়ে মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে----৩৫৪
দুনিয়ায় সবারই ভুল হয়----৩৫৫
নিজের স্বার্থ ও ইনসাফ----৩৫৭
অন্যের নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত ছিলো না তারা----৩৫৯
হকের পক্ষে থাকা বর্তমানে সবচেয়ে কঠিন কাজ----৩৬১
জালিমকে বাঁধা দেওয়ার কেউ যখন থাকে না----৩৬৩
অহমিকা সবচেয়ে মারাত্মক ব্যধি----৩৬৫
স্পষ্ট দলীল সামনে আসার পরও তারা মেনে নেয় না----৩৬৬
আত্মম্ভরিতাই সবচেয়ে বড় স্বার্থপরতা----৩৬৯
আল্লাহর কিতাব দেওয়ার মানে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়া----৩৭০
সত্যিকারের মুমিন দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান পছন্দ করে না----৩৭২
শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়া দুটোই পরীক্ষা----৩৭৪
তারা নিজেদের নির্বাচিত উম্মত ও নবীদের সন্তান ভাবে----৩৭৬
মানুষ নিজের ভ্রান্তি সুন্দর শব্দে উপস্থাপন করে----৩৭৮
তারা নিজেদের কৃত গুনাহের কথা ভেবে অস্থির হয়----৩৮০
অনেক জাতি পতনের গহ্বরে হারিয়ে গেছে----৩৮১
প্রভাবশালীরা অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে গিয়েছিলো----৩৮২
সত্যিকারের তাওবা আখেরাতের জ্যোতি----৩৮৩
আল্লাহর ভয়ের দীনের বদলে মানুষ উৎসবের দীন চায়----৩৮৪

দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী পুরস্কার নয়----৩৮৬
নিজেকে নিজের মালিক মনে করা সব অন্যায়ের মূল----৩৮৮
হক গ্রহণ করলে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয়----৩৮৯
নিজের কাজ নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে----৩৯০
ভালো ও খারাপ উভয় অবস্থাই মানুষের পরীক্ষার জন্য----৩৯২
অহংকার ও দুনিয়া পূজা হক গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়----৩৯৩
আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে----৩৯৫
পরকালের ফয়সালা হবে কাজ অনুযায়ী----৩৯৭
আল্লাহর নিদর্শন নীরব ভাষার হয়ে থাকে----৩৯৯
সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি----৪০১
ইহুদিরা শুধু নিজেদেরই হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করতো----৪০১
আল্লাহর পরিচয় লাভের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা----৪০৪
তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে----৪০৬
মিশ্রিত দীন ও খাটি দীন----৪০৮
আল্লাহর নিকট আমল অনুযায়ী ফয়সালা----৪০৯
আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন----৪১০
মানুষ হক প্রত্যাখ্যানের শাস্তি তৎক্ষণাৎ পায় না----৪১১
আল্লাহর আসল দীন একটি----৪১২
তাকওয়া ঐক্য সৃষ্টি করে----৪১৩
হকের দিকে ডাকলে মানুষ শত্রু হয়ে যায়----৪১৪
দেখার পর মেনে নেওয়ার গুরুত্ব নেই----৪১৫

মুক্তার চেয়ে দামী

(একাদশ খণ্ড)



অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসি। এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। রসূল সা. একদিন সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জানো আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ? তারা উত্তরে বলেন, আল্লাহ এবং তার রসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। রসূল সা. কয়েকবার একই প্রশ্ন করলে উবাই ইবনে কা'ব রা. বললেন, আয়াতুল কুরসি। রসূল সা. বললেন, হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তাআলা তোমার ইলমে বরকত দান করুন। ওই সত্ত্বার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! এই আয়াতের রয়েছে জিহ্বা ও ওষ্ঠ। এটি আরশের পায়ের কাছে বসে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে।[১]

সহীহ মুসলিম শরীফেও এই হাদীসটি রয়েছে। তবে আল্লাহর শপথ করে বলা বাক্যটি তাতে নেই।[২]

টাকা ঘরে রাখতে রাখতে কমে যাচ্ছে

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, আমার কাছে এক বস্তা খেজুর ছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম, দিনদিন খেজুর কমে যাচ্ছে। একরাতে আমি জেগে থেকে তা পাহারা দিলাম। গভীর রাতে এক যুবক এলো। আমি তাকে সালাম দিলাম। সে আমার সালামের উত্তর দিলো। আমি বললাম, তুমি মানুষ না জিন? সে বললো, আমি জিন। আমি বললাম, তোমার হাতটা বাড়াও তো দেখি। সে হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি তার হাত ধরলাম। তার হাতটি ছিলো কুকুরের হাতের মতো। চামড়া ছিলো রোমশ। আমি বললাম, জিনরা কি এমনই হয়? সে বললো, জিনদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমি বললাম, তুমি আমার জিনিস চুরি করতে এলে কেনো? সে বললো, আমি জানি আপনি সদকা

---

[১] মুসনাদে আহমদ (হাদিস: ২১৩১৫)

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১/৩৪৮

করতে ভালোবাসেন। তাই ভাবলাম আমি কেনো বঞ্চিত থাকবো? আমি বললাম, তোমার ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কী? সে বললো, আয়াতুল কুরসি।

সকালে আমি রসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাতের পুরো ঘটনা খুলে বললাম। রসূল সা. বললেন, সে ছিলো শয়তান। কিন্তু এ কথাটা তো একেবারেই সত্য বলেছে![৩]

নোট ঃ আপনিও ঘরের কোণগুলোতে আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এর আমল এটাই ছিলো।[৪]

তাহাজ্জুদে ওঠো এবং এই দোয়া পড়ো

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. যখন রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য উঠতেন তখন এই দোয়া পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব! হে আসমান-যমীনের স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত সত্তা! তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে, তুমিই সেসব বিষয়ের ফায়সালা করো। যেসব বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, সেসব বিষয়ে তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও। নিশ্চই তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়ে থাকো।[৫]

রসূল সা. থেকে আরেকটি দোয়া বর্ণিত আছে,

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنُضِلَّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

---

[৩] আবু ইয়া'লা

[৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৪৮)

[৫] সহীহ মুসলিম (হাদিস: ৭৭০)

হে আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্যরূপে দেখাও এবং তার অনুসরণ করার তওফিক আমাদের দান করো। মিথ্যাকে মিথ্যারূপে দেখাও এবং আমাদেরকে তা থেকে বেঁচে থাকার তওফিক দাও। সত্য ও মিথ্যাকে আমাদের সামনে এতো অস্পষ্ট করবেন না যে আমরা পথভ্রষ্ট হই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সৎ ও খোদাভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।[৬]

অন্তরে কল্যাণ থাকলে আল্লাহ কল্যাণ দেবেন

রসূল সা. থেকে বর্ণিত আছে, একবার বনী ইসরাইলের একব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে এক হাজার টাকা ঋণ চাইলো। ঋণদাতা বললো, একজন সাক্ষী নিয়ে এসো। ঋণগ্রহীতা উত্তর দিলো, আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ঋণদাতা বললো, তাহলে জামিন আনো। ঋণগ্রহীতা উত্তর দিলো, আল্লাহই জামিন হিসেবে যথেষ্ট। তখন ঋণদাতা বললো, তুমি সত্যই বলেছো। তারপর ঋণ আদায়ের মেয়াদ নির্ধারিত হয় এবং ঋণদাতা এক হাজার টাকা দিয়ে দেয়।

টাকা নিয়ে ঋণগ্রহীতা জলপথের সফরে বের হয়। ঋণ পরিশোধের দিন যখন ঘনিয়ে এলো, ঋণগ্রহীতা লোকটি সমুদ্রের অন্য তীরে অবস্থান করছিলো। সে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে চাইলো। কিন্তু সফরের জন্য প্রস্তুত কোনো জাহাজের খোঁজ সে পেলো না। সে যখন বুঝতে পারলো যথা সময়ে ঋণদাতার কাছে সে পৌঁছতে পারবে না, তখন সে একটি কাঠের তক্তা চিরে তার ভেতরে এক হাজার টাকা এবং একটি চিরকুট রাখলো। তারপর তক্তাটির মুখ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো, হে পরওয়ারদেগার! আপনি ভালো করেই জানেন, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়েছি। তিনি আমার কাছে জামানত চেয়েছিলেন। আমি আপনাকেই জামিন হিসেবে পেশ করেছি। তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সাক্ষী উপস্থিত করতে বলেছিলেন। আমি আপনাকেই সাক্ষী রেখেছি। তিনি এতেও সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন যখন নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে চলেছে, আমি তার কাছে যাওয়ার জন্য কোনো জলযান পাচ্ছি না। এখন আমি এই টাকা আপনার দায়িত্বে অর্পণ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি। আপনি এই টাকা তার কাছে পৌঁছে দিন।

তারপর কাঠের টুকরোটি সে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলো।

ওদিকে যে ব্যক্তি ঋণ দিয়েছিলো সে জানতো আজ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির

---

[৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/২৯১)

আসার তারিখ। তাই সেও সমুদ্রের তীরে এসে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবছিলো আজ ঋণগ্রহীতা লোকটি আসবে অথবা কারো হাতে টাকা পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও কোনো জাহাজ সেদিক থেকে এলো না। নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় সমুদ্রের পারে একটি কাঠের টুকরো দেখতে পেয়ে সে ভাবলো, খালি হাতেই তো যাচ্ছি। এরচেয়ে ভালো এই কাঠের টুকরোটি নিয়ে যাই। এটা চিরে শুকিয়ে জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাড়িতে গিয়ে তক্তাটি চিরে সে দেখলো ভেতরে অনেক টাকা। গণনা করে দেখলো পুরো এক হাজার টাকাই আছে। সাথে রাখা চিরকুট পড়ে সে বুঝতে পারলো এই টাকা ঋণগ্রহীতাই পাঠিয়েছে।

কিছু দিন পর ওই লোকটি তার কাছে এক হাজার টাকা নিয়ে এসে বললো, আপনার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করুন। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো জাহাজ না পাওয়ায় আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেছে।

ঋণদাতা বললো, আপনি কি আমার টাকা পাঠিয়ে দেননি? ঋণগ্রহীতা বললো, আমি তো আপনাকে বলেছি আমি জাহাজ পাই নি। ঋণদাতা বললো, আপনি আপনার টাকা নিয়ে যান। আপনি কাঠের ভেতর যে টাকাগুলো রেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তা আল্লাহ তাআলা আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আমার প্রাপ্য টাকা পেয়ে গেছি।[৭]

বিস্ময়কর তিন সদকা

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি সংকল্প করলো, আজ রাতে কিছু টাকা সদকা করবো। সে টাকা নিয়ে বের হয়ে এক ব্যাভিচারিণী নারীর হাতে দিলো। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতে এক ব্যক্তি এক ব্যভিচারিণী নারীকে দান করে গেছে। লোকটিও তা শুনলো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলো।

তারপর সে আবার ঠিক করলো, আজ রাতেও সদকা করবো। রাতের অন্ধকারে টাকার থলে নিয়ে বের হয়ে সে এক ব্যক্তির হাতে দিয়ে চলে এলো। সকালে মানুষ বলাবলি করতে লাগলো, আজ রাতে এক সম্পদশালীকে কেউ দান করে গেছে। লোকটি শুনে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলো।

তারপর আবার সে সদকা করার নিয়ত করলো। আগের মতোই সে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে এক ব্যক্তির হাতে টাকা দিলো। দিনের বেলা জানতে

---

[৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৭৭)

পারলো, লোকটি চোর ছিলো।

সে বললো, হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করছি বদকার নারীকে দিতে পেরে, সম্পদশালী এবং চোরকে দিতে পেরেও।

রাতে স্বপ্নে এক ফেরেশতা এসে তাকে বললো, তোমার তিন সদকাই কবুল হয়েছে। বদকার নারী সম্পদ পেয়ে হয়তো হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে। সম্পদশালী উপদেশ গ্রহণ করে নিজেও সদকা করতে শুরু করবে। চোর টাকা পেয়ে চুরির অভ্যাস ছেড়ে দেবে।[৮]

অতীত দুঃখ-কষ্ট মনে পড়লে

মুসনাদে আহমাদে আলী রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি দুঃখ-কষ্টের ঘটনা ঘটার দীর্ঘ দিন পর সেই কথা মনে পড়ে গেলে আবার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে, তাহলে দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে সে যে প্রতিদান পেয়েছিলো, আবার তাকে সেই প্রতিদান দেয়া হবে।

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে, আবু সিনান রা. বলেন, আমি আমার এক সন্তানকে দাফন করে তার কবর থেকে বের হচ্ছিলাম। এ সময় আবু তালহা খাওলানি রা. আমার হাত ধরে আমাকে বের হতে সাহায্য করলেন এবং বললেন, শোনো! আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শোনাচ্ছি। রসূল সা. বলেছেন, কারো সন্তানকে মৃত্যু দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা মালাকুল মাউতকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যখন আমার বান্দার চোখের শীতলতা ও কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে নিয়েছো, তখন সে কী বলেছে? সে বলে, হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো ও তার নাম রাখো বাইতুল হামদ।[৯]

সবচে বড় ঈমানদার কে?

হাদীস শরীফে আছে, রসূল সা. একবার তার সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দৃষ্টিতে সবচে বড় ঈমানদার কারা?

তারা বললেন, ফেরেশতারা।

রসূল সা. বললেন, তারা ঈমান আনবে না কেনো! তারা তো আল্লাহর কাছেই আছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, তাহলে কি আমরা? রসূল সা. বললেন,

---

[৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৬৭)

[৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/২২৯)

তোমরা কেনো ঈমান আনবে না! স্বয়ং নবীই তো তোমাদের মধ্যে রয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিই বলুন হে আল্লাহর রসূল। রসূল সা. বললেন, সর্বোত্তম ঈমানদার হবে ওই ঈমানদার ব্যক্তিরা, যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা আল্লাহ ও রসূলের কথা শুধু কিতাবে লিখিত পেয়েই ঈমান আনবে।[১০]

ক্রুদ্ধ অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখো

বর্ণিত আছে, হাদিসে কুদসিতে আল্লহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি ক্রুদ্ধ অবস্থায় আমাকে স্মরণ রাখো অর্থাৎ আমার নির্দেশ মেনে ক্রোধ সংবরণ করো, তাহলে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ রাখবো। অর্থাৎ ধ্বংসের সময় তোমাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করবো।[১১]

রসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংযত করে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে নিজের আযাব দূরে হটিয়ে দেন। যে ব্যক্তি নিজের যবান শরীয়ত বিরোধী কথা থেকে সংযত করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তাআলা তার ওযর কবুল করেন।

অন্য হাদীসে রসূল সা. বলেছেন, ওই ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কাউকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে বরং প্রকৃত বীর পুরুষ ওই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখে।[১২]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যার কাছে নিজের ওয়ারিসদের সম্পদ নিজের সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয়? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এমন কেউ নেই। সবার কাছেই নিজের সম্পদই বেশি প্রিয়। রসূল সা. বললেন, আমি তো দেখছি তোমরা তোমাদের ওয়ারিসদের সম্পদই বেশি পছন্দ করছো। কারণ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সম্পদ তো ওটাই যা তোমরা জীবিত অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করো। আর যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের সম্পদ নয়; বরং তোমাদের ওয়ারিসদের সম্পদ। তাই আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কম খরচ করা এবং বেশি জমা করে রাখা দেখে মনে হয়, তোমরা যেনো ওয়ারিসদের সম্পদই বেশি ভালোবাসো।

তারপর রসূল সা. বললেন, তোমরা কাকে বীর পুরুষ মনে করো? সাহাবায়ে

---

[১০] তাফসীরে ইববে কাসীর (১/৪৩৯)

[১১] ইবনে আবি হাতেম

[১২] মুসনাদে আহমদ

কেরাম উত্তর দিলেন, যাকে কেউ মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে না। রসূল সা. বললেন, প্রকৃত শক্তিশালী বীর পুরুষ ওই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সংযত রাখতে পারে।

তারপর বলেন, তোমরা কাকে নিঃসন্তান বলো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যার কোনো সন্তান নেই। রসূল সা. বললেন, বাস্তবে নিঃসন্তান ওই ব্যক্তি যার সামনে তার কোনো সন্তান মারা যায়নি।[১৩]

আরেক বর্ণনায় আছে, রসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের দৃষ্টিতে দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম রা. উত্তর দিলেন, যার কাছে ধন-সম্পদ নেই। রসূল সা. বললেন, প্রকৃত দরিদ্র ওই ব্যক্তি যে নিজের জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যায় করে না।[১৪]

হযরত হারেছা ইবনে কুদামাহ সাদী রা. একবার নবীজির খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোনো উপকারী কথা বলুন। তা যেনো আমি মনে রাখতে পারি এমন সংক্ষিপ্ত হয়।

রসূল সা. বলেন, ক্রুদ্ধ হয়ো না। তিনি আবার একই প্রশ্ন করলেন। রসূল সা. একই উত্তর দিলেন। এরপর আরও কয়েকবার তিনি একই প্রশ্ন করেন। রসূল সা. একই উত্তর দেন।[১৫]

কোনো এক সাহাবী রসূল সা.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন? রসূল সা. বললেন, ক্রুদ্ধ হয়ো না। তিনি বলেন, পরে আমি চিন্তা করে বুঝলাম, ক্রোধই হচ্ছে সব অন্যায়ের মূল।[১৬]

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আবু যর রা. কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হলেন। তখন তিনি বসে পড়লেন। তারপর বসা থেকে শুয়ে পড়লেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এমন করছেন কেনো? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, কারো রাগ উঠে গেলে সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেনো বসে পড়ে। তাতেও যদি রাগ না কমে তবে যেনো শুয়ে পড়ে।[১৭]

মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে, একবার হযরত উরওয়া ইবনে মুহাম্মাদ রা. কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হন। সাথে সাথে তিনি অযু করতে বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আমার উস্তাদের কাছে এই হাদিসটি শুনেছি, রসূল সা. বলেছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। শয়তানকে

---

[১৩] মুসলিম
[১৪] মুসনাদে আহমদ
[১৫] মুসনাদে আহমদ
[১৬] মুসনাদে আহমদ
[১৭] মুসনাদে আহমদ

আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুনকে পানি দিয়ে নেভানো যায়। তাই তোমরা ক্রোধের সময় অযু করতে বসে যাও।

রসূল সা. থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ঋণগ্রহীতার ঋণ আদয়ের নির্ধারিত সময় পিছিয়ে দেয় অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

হে লোকসকল! শোনো, জান্নাতের আমল খুব কঠিন। আর জাহান্নামের কাজ সহজ। সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যে ফেতনা থেকে বেঁচে যায়। ক্রোধ হজম করা আল্লাহর কাছে যতোটা প্রিয়, অন্য কোনো কিছু হজম করা এতো প্রিয় নয়। এমন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।[১৮]

রসূল সা. বলেন,যে ব্যক্তি নিজের রাগ মেটানোর ক্ষমতা থাকার পরও রাগ দমন করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধানের সামর্থ্য থাকার পরও বিনয়ী হয়ে তা ত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মান ও ইজ্জতের পোষাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বাদশাহী মুকুট পরাবেন।[১৯]

রসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকার পরও নিজের ক্রোধ সংযত করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের সামনে ডেকে এনে স্বাধীনতা দেবেন, সে যে কোনো হূর পছন্দ করে নিতে পারে।[২০] [২১]

রসূলের ইনতেকালের পর অদৃশ্য ঘোষণা

হযরত আলী রা. বলেন, রসূল সা.-এর ইনতেকালের পর হঠাৎ আমাদের মনে হলো, যেনো কেউ আসছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। পায়ের শব্দ এগিয়ে এসে থেমে গেলো এবং আওয়াজ ভেসে এলো, হে নবী পরিবারের লোকসকল! আপনাদের ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণভাবে তোমাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। প্রত্যেক মসিবতের ক্ষতিপূরণ আল্লাহর কাছেই আছে। সব মৃত ব্যক্তিরই প্রতিদান আছে। আল্লাহর ওপরই ভরসা করো। তার কাছেই কল্যাণের আশা করো। জেনে রাখো, প্রকৃত বিপদগ্রস্থ ওই ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। তোমাদের

---

[১৮] মুসনাদে আহমদ

[১৯] আবু দাউদ

[২০] মুসনাদে আহমদ

[২১] তফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪৫৭)

ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।[২২]

হযরত আলী রা. বলেন, আমার ধারণা তিনি ছিলেন হযরত খিযির আ.।[২৩]

তাওবা সম্পর্কে এক আশ্চর্য হাদীস

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, চারজন সাহাবী একবার এক জায়গায় একত্র হলেন। তাদের একজন বললেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুর একদিন আগে তাওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবাও কবুল করবেন। দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি সত্যিই রসূল সা.-কে এই কথা বলতে শুনেছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন দ্বিতীয়জন বললেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যদি মৃত্যুর অর্ধদিবস আগে কেউ তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবাও কবুল করে নেন।

তৃতীয়জন বললেন, তুমি কি সত্যি এই কথা শুনেছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি নিজের কানে শুনেছি। তৃতীয়জন বললেন, আমি তো তাকে বলতে শুনেছি, যদি এক প্রহর আগে কেউ তওবা করে, তার তাওবাও কবুল হয়ে যায়।

চতুর্থজন বললো, তুমি কি সত্যিই এ কথা শুনেছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। চতুর্থজন বললেন, আমি তো রসূল সা.-কে এ কথাও বলতে শুনেছি, কণ্ঠনালী থেকে রূহ বের না হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে।[২৪]

আল্লাহ ক্ষমা করবেন

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. একদিন হযরত যমযম ইবনে জাওশ ইয়ামামি রহ.-কে বললেন, হে ইয়ামামি! কাউকে কখনো এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না কিংবা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

ইয়ামামি রহ. বলেন, আমরা নিজেদের ভাই ও বন্ধুদের ওপর রেগে গেলে এমন কথা বলে থাকি। আবু হোরায়রা রা. বললেন, সাবধান! কখনো এমন বলো না। জেনে রাখো, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাইলে দুই ব্যক্তি ছিলো। একজন ছিলো উচ্চস্তরের আবেদ। অপরজন নিজের জীবনের ওপর নানা ধরণের জুলুম করতো। তবে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো। আবেদ ব্যক্তিটি প্রায় সময়ই তার বন্ধুকে কোনো না কোনো পাপ কাজে লিপ্ত থাকতে দেখতো আর

---

[২২] ইবনে হাতেম

[২৩] তফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪৮৮)

[২৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৫২৩)

বলতো, ভাই! তুমি এ কাজ থেকে বিরত থাকো। সে উত্তরে বলতো, তুমি আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি তো আমার রক্ষক নও।

একবার আবেদ ব্যক্তি দেখলো, তার বন্ধু এমন একটি কাজ করছে; যে কাজটিকে সে অনেক বড় পাপ মনে করে। সে বললো, আফসোস তোমার জন্য, পাপাচারের পথ থেকে ফিরে এসো। সে আগের মতোই উত্তর দিলো, আমাকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও। তখন আবেদ ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না অথবা জান্নাত দান করবেন না।

আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠালেন এবং তাদের রূহ কবয করে নিলেন। যখন তারা উভয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ালো, তখন আল্লাহ তাআলা পাপী ব্যক্তিকে বললেন, যাও! আমার দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করো। আর ওই আবেদকে বললেন, তোমার কি প্রকৃত জ্ঞান ছিলো? তুমি কী আমার জান্নাত-জাহান্নামের ওপর ক্ষমতাবান ছিলে?

তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

রসূল সা. বলেন, ওই সত্ত্বার কসম যার হাতে আবুল কাসিমের প্রাণ! সে এমন এক কথা মুখ থেকে বের করেছে, যা তার দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে দিয়েছে।[২৫]

ইবরাহীম আ. আল্লাহর বন্ধু হওয়ার কারণ

মুসনাদে ইবনে আবি হাতেমে বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইবরাহীম আ. এর অভ্যাস ছিলো, তিনি সব সময় মেহমানের সাথে খাবার খেতেন। একদিন তিনি মেহমানের খোঁজে বের হলেন। কিন্তু কোনো মেহমান না পেয়ে ফিরে এলেন। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে ঘরে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? সে বললো, এই বাড়ির আসল মালিকই আমাকে অনুমতি দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, তুমি কে? সে বললো, আমি মালাকুল মউত। আমাকে আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন এ সুসংবাদ জানানোর জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এ কথা শুনে ইবরাহীম আ. বললেন, তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বলে দাও ওই সম্মানিত ব্যক্তিটি কে? আল্লাহর কসম! তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেনো, আমি অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করবো। তারপর নিজের বাকি জীবন তাঁর সেবা করেই কাটিয়ে দেবো।

---

[২৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৫৮১)

মালাকুল মাউত বললেন, ওই ব্যক্তিটি তো আপনিই।

ইবরাহীম আ. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোন গুণ বা কাজের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

ফেরেশতা বললেন, কারণ হলো আপনি সবাইকে শুধু দান করেন। কারো কাছে কিছু চান না।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন থেকে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেন এবং এ বরকতময় উপাধিতে ভূষিত করেন তখন থেকে তার অন্তরে আল্লাহর ভীতি এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তার অন্তর কম্পিত হওয়ার শব্দ দূর থেকে শোনা যেতো; পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ যেমন শোনা যায়।[২৬]

জান্নাতী ও জাহান্নামী

জান্নাতী মানুষ তিন প্রকার,

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। যিনি উত্তম আচরণ করেন এবং দান সদকা করেন।

২. দয়ালু ব্যক্তি। যিনি আত্মীয়স্বজন ও মুসলমানদের সঙ্গে বিনয়ী ও নম্র ব্যবহার করেন।

৩..যিনি দরিদ্র অবস্থায়ও হারাম থেকে বেঁচে থাকেন। অথচ তার পরিবার পরিজন রয়েছে।

জাহান্নামী মানুষ পাঁচ প্রকার,

১. এমন নিম্নস্তরের মানুষ যে ধর্মহীন, তোষামোদকারী এবং চাটুকার। যার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ নেই।

৩. এমন খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যার দাঁত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তুর ওপরও লেগে থাকে এবং সে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের ক্ষেত্রেও খিয়ানত করতে ছাড়ে না।

৩. এমন মানুষ যারা সকাল সন্ধ্যা অন্যকে পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে প্রতারিত করে।

৪. কৃপণ। অথবা বলেছেন মিথ্যাবাদী।

৫. অশ্লীলভাষী।[২৭]

---

[২৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৬৪৪)

[২৭] মুসলিম ও নাসায়ীর সূত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৭৩২)

ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছে কুরায়শের প্রশ্ন

তাবরানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরায়শরা ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করলো, হযরত মূসা আ. তোমাদের কাছে কী কী মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন?

তারা বললো, অজগরে পরিণত হয়ে যাওয়া লাঠি এবং দীপ্তিময় হাত।

তারা খৃষ্টানদের জিজ্ঞাসা করলো, হযরত ঈসা আ. কী কী নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন?

খৃষ্টানরা উত্তর দিলো, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা।

তখন কুরায়শরা রসূল সা.-এর এর কাছে এসে তাকে বললো, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন তিনি যেনো আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। রসূল সা. দোয়া করলেন। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বাতাসের দিক পরিবর্তনে, আসমান ও যমীনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান কওমের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[২৮]

অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন যারা দেখে তাদের জন্য এগুলোর মধ্যেই রয়েছে বড় বড় নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করলেই কুশলী স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের মস্তক অবনত হয়ে আসবে।[২৯]

---

[২৮] সূরা বাকারা (আয়াত: ১৬৪)

[২৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪৯২)

গোপন সদকার ফযিলত

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তা দুলছিলো। তারপর আল্লাহ তাআলা পাহাড় সৃষ্টি করে তাতে গেড়ে দিলেন। এর ফলে পৃথিবীর কম্পন থেমে গেলো। ফেরেশতারা পাহাড়ের দৃঢ়তা ফেরেশতাদের বিস্মিত করলো। তারা আল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে দৃঢ় ও মজবুত কিছু আছে?

আল্লাহ তাআলা বললেন, লোহা পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী। এর চেয়ে শক্তিশালী আগুন। আগুনের চেয়ে শক্তিশালী হলো পানি। পানির চেয়েও শক্তিশালী বাতাস।

ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করলেন, এর চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে?

আল্লাহ তাআলা বললেন, আদম সন্তানের যে দান সম্পর্কে তার বাম হাতও জানতে পারে না তা এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী।[৩০]

তিন সৌভাগ্যবান ও তিন হতভাগা

১. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেন, তিন ধরণের মানুষের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না।

এ কথা শুনে হযরত আবু যর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ লোকগুলো কারা? এরা তো বড়ই দুর্ভাগা!

রসূল সা. উত্তর দিলেন, যারা দম্ভভরে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে, যারা মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রি করে এবং যারা অনুগ্রহ করে খোটা দেয়।

২. মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আবু আহমাস রহ. বলেন, আমি হযরত আবু যর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলি, আমি শুনেছি আপনি রসূল সা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি বললেন, শোনো! আমি তো রসূল সা.-এর ওপর মিথ্যারোপ করতে পারি না। যেহেতু আমি এ সম্পর্কে রসূল সা.-এর কথা সতর্কবাণী শুনেছি। তুমি বলো সেই হাদীসটি কি?

আমি বললাম, হাদিসটি হলো, তিন প্রকারের লোকদের আল্লাহ তাআলা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। আর তিন প্রকারের লোকদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! এই হাদীস আমি বর্ণনা করেছি এবং রসূল সা.

---

[৩০] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৬৬)

থেকে শুনেছিও বটে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাদেরকে তিনি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, এক. যিনি বীরত্বের সঙ্গে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে যান। তারপর হয়তো নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন অথবা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন। দুই. যিনি কোনো কাফেলার সঙ্গে সফররত অবস্থায় রয়েছেন। বহু রাত পর্যন্ত কাফেলা চলতে থাকে। অতঃপর ক্লান্ত হয়ে যখন সবাই অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যান। এরপর যাত্রার সময় সকলকে জাগিয়ে দেন। তিন. যিনি প্রতিবেশীর অত্যাচারের ওপর ধৈর্য ধারণ করেন; যতো দিন মৃত্যু অথবা সফর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে না দেয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর ওই তিন ব্যক্তি কারা যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট? তিনি বললেন, যে ব্যবসায়ী বেশি শপথ করে, অহংকারী দরিদ্র এবং যে কৃপণ ব্যক্তি কখনো অনুগ্রহ করে ফেললে পরে এ নিয়ে খোটা দেয়।[৩১]

মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের উপমা

ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন, মুমিন, কাফির ও মুনাফিকের উপমা হচ্ছে ওই তিন ব্যক্তির মতো যারা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছে। একজন তীরেই দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়জন নদীতে নেমে নদী অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। তৃতীয় ব্যক্তি নদীতে নেমে মাঝ নদীতে পৌঁছার পর এ তীরের লোকটি তাকে পেয়ে বলছে, ধ্বংস হতে চলেছো এ দিকে ফিরে এসো! অন্য তীরের লোকটিও তাকে ডেকে বলছে আমার দিকে চলে এসো। তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং আমার মতো গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। অর্ধেক রাস্তা তো অতিক্রম করেই ফেলেছো। মাঝনদীতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে কখনো এদিকে দেখে কখনো ওদিকে তাকাচ্ছে। দোদুল্যমান হয়ে ভাবছে, কোন দিকে যাবো। এই সময় এক বিরাট ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এবং হাবুডুবু খেতে খেতে সে মারা গেলো।

নদী অতিক্রমকারী ব্যক্তি মুসলমান। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি কাফের। নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক।

অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, মুনাফিকের উপমা ওই বকরীর মতো যে সবুজ-শ্যামল টিলার ওপর বকরী চরছে দেখে এগিয়ে যায়, কিন্তু ঘাস শুঁকে না খেয়েই চলে আসে। যাকে আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে দেন

---

[৩১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪২৫)

তাকে পথ দেখানোর ক্ষমতা আর কার আছে? আল্লাহ তাআলা এই মুনাফিকদেরকে তাদের নিকৃষ্ট ও জঘন্য আমলের কারণে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কেউ তাদের সঠিক পথে আনতে পারবে না, তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিপরীত কে করতে পারে? তিনি সবার ওপর ক্ষমতাবান। তার ওপর কারো ক্ষমতা নেই।[৩২]

ক্ষমা করো, তোমাকে ক্ষমা করা হবে

একদিন এক কুরায়শী এক আনসারীকে জোরে ধাক্কা দেয়। তাতে আনসারীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। হযরত মুআবিয়া রা. এর কাছে এই ঘটনার বিচার যায়। আনসারী খুব উত্তেজিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া রা. তাকে বললেন, আচ্ছা যাও তোমাকে বিবাদীর ব্যাপারে অধিকার দেয়া হলো।

হযরত আবু দারদা রা. বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলমানের শরীরে যদি আঘাত দেয়া হয় আর সে ধৈর্যধারণ করে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

আনসারী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সত্যিই রসূল সা.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন? হযরত আবু দারদা রা. বলেন, হ্যাঁ, আমার কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।

আনসারী বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার বিবাদীকে মাফ করে দিলাম। হযরত মুআবিয়া রা. এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন।[৩৩]

চড়া মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে শস্য মজুদ করা অন্যায়

মুসনাদে আহমাদের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক রা. মসজিদ থেকে বেরিয়ে শস্য ছড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এই শস্য কোথা থেকে এসেছে? লোকেরা বললো, বিক্রির জন্য এসেছে। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাতে বরকত দান করো। লোকেরা বললো, এই শস্য চড়া মূল্যে বিক্রির জন্য মজুদ করে রাখা হয়েছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে জমা করে রেখেছিলো? লোকেরা বললো, একজন উসমান রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আরেকজন আপনার আজাদকৃত গোলাম। তিনি তাদের উভয়কে ডেকে এনে বলেন, তোমরা এরকম কেনো করেছো? তারা উত্তর

---

[৩২] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৬৫৫)

[৩৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৭৬১)

দিলো, আমরা আমাদের টাকায় ক্রয় করি। তাই যখন ইচ্ছা বিক্রি করতে পারি। এই এখতিয়ার তো আমাদের আছে।

হযরত ওমর ফারুক রা. বললেন, জেনে রাখো! আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে বেশি মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য জমা করে রাখে, তাকে আল্লাহ তাআলা দরিদ্র করে দেবেন অথবা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করবেন।

এ কথা শুনে হযরত উসমান রা. এর গোলাম বললো, আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি এবং অঙ্গীকার করছি, এই কাজ আর কখনো করবো না। কিন্তু হযরত ওমর রা. এর গোলাম আবার আগের কথাই বললো, আমি আমার টাকা দিয়ে ক্রয় করি এবং আমার ইচ্ছে মতো সময়ে বিক্রি করি। এটা কী এমন খারাপ কাজ হলো!

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু ইয়াহইয়া রহ. বলেন, পরবর্তীতে আমি তাকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখেছি।

সুনানে ইবনে মাজায়ও বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখে আল্লাহ তাআলা তাকে দরিদ্র করে দেবেন। অথবা তাকে কুষ্ঠ রোগ দেবেন।[৩৪]

ঋণগ্রস্থকে অবকাশ দাও

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে কোনো দরিদ্রকে ছাড় দেয় এবং তার সাথে নম্র আচরণ করে, তাহলে সে যতো দিন পর্যন্ত তার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করতে না পারবে ততো দিন পর্যন্ত প্রতি দিনই সে ওই পরিমাণ টাকা দান করার সওয়াব পেতে থাকবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, রসূল সা. বলেছেন, দরিদ্র ঋণগ্রস্থকে ছাড় দিলে সে ঋণ আদায় করতে সক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত ঋণদাতা প্রতিদিনই ঋণের দ্বিগুণ টাকা দান করার সওয়াব পেতে থাকবে। এ কথা শুনে হযরত বুরাইদা রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আগে তো আপনি তার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়ার কথা বলেছিলেন, আজ দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলছেন কেনো? রসূল সা. বললেন, মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।

হযরত আবু কাতাদাহ রা. এর কাছে একব্যক্তির কিছু ঋণ ছিলো। কাতাদাহ রা. ঋণের টাকা নিতে আসলে লোকটি লুকিয়ে থাকতো, তার সাথে

---

[৩৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৭২)

দেখা করতো না। একদিন তিনি তার ঘরের সামনে গেলে ঘর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। তিনি ছেলেটিকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, হ্যাঁ তিনি তো ঘরেই আছেন। খাবার খাচ্ছেন। হযরত আবু কাতাদাহ রা. উঁচু আওয়াজে তাকে ডেকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি বাড়ীতেই আছো। তাই বেরিয়ে এসো। সে নিরুপায় হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি কেনো লুকিয়ে থাকছো? সে বললো, হযরত! আসল ঘটনা হলো, আমি একজন দরিদ্র মানুষ। এই মুহূর্তে আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই। তাই লজ্জায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি না। তিনি বললেন, আল্লাহর নামে শপথ করো। সে শপথ করলো। কাতাদা তখন কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্থকে অবকাশ দেয় অথবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে থাকবে।[৩৫]

হযরত আবু ইয়ালা রহ. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. বলতেন, কিয়ামতের দিন একটি লোককে আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি আমার জন্য কোনো নেক কাজ করেছো? সে বলবে, হে আল্লাহ! অণু পরিমাণ ভালো কাজও আমি করতে পারি নি যার প্রতিদান আজ আমি আপনার কাছে চাইতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আবার তাকে একই প্রশ্ন করবেন। সে একই উত্তর দেবে। আল্লাহ তাআলা আবার তাকে প্রশ্নটি করবেন। তখন লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! একটি ছোট ভালো কাজের কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু অর্থ আমাকে দিয়ে রেখেছিলেন। আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। লোকজন আমার থেকে ঋণ নিতো। আমি যখন দেখতাম, কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যথাসময়ে ঋণ আদায় করতে পারছে না, তখন আমি তাকে আরো কিছু দিনের অবকাশ দিতাম। ধনীদেরকেও ঋণ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করতাম না। বেশি দরিদ্র হলে ক্ষমা করে দিতাম।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাহলে আমি আজ কেনো তোমার সাথে সহজ আচরণ করবো না? আমি তো সবচেয়ে বেশি সহজকারী। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।

মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীকে সাহায্য করে, ঋণগ্রস্থ দরিদ্রকে সাহায্য করে অথবা মুকাতাব গোলামকে (যে গোলামকে তার মনিব বলেছে, এই পরিমাণ টাকা দিলে তুমি

---

[৩৫] মুসলিম

আযাদ হয়ে যাবে) সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা তাকে ওই দিন ছায়া দান করবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কামনা করে, তার দোয়া কবুল করা হোক, তার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দূর হয়ে যাক, সে যেনো অস্বচ্ছল লোকদের স্বচ্ছল বানায়।[৩৬]

যে ফেতনা থেকে বেঁচে যায়

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসূল সা. একদিন মসজিদে যাওয়ার সময় মাটির দিকে ইশারা করে বললেন, যে কোনো অসহায়ের ওপর দয়া করবে অথবা তাকে ক্ষমা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। জেনে রেখো! জান্নাতের কাজ কঠিন এবং প্রবৃত্তি কামনা করে না এমন। জাহান্নামের কাজ সহজ এবং প্রবৃত্তি পছন্দ করে এমন। সৌভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে রক্ষা পায়। মানুষের কোনো গলধঃকরণই আল্লাহর কাছে তার রাগ গিলে ফেলার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। এমন ব্যক্তিদের অন্তর আল্লাহ তাআলা ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন।

তবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির ওপর দয়া করে নিজের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে তার প্রতি কঠোর না হয়, আল্লাহ তাআলাও তার গুনাহের কারণে তাকে পাঁকড়াও করেন না। অবশেষে সে তাওবা করে নেয়।[৩৭]

সুরা ইউসুফের বিশেষ ফজিলত

এই সুরার ফজিলত সম্পর্কে রসূল সা. বলেছেন, নিজের অধীনস্থদের সুরা ইউসুফ শেখাও। যে মুসলমান এই সূরা তেলাওয়াত করবে অথবা নিজের পরিবারের লোকজন অথবা অধীনস্থদের শেখাবে আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যু যন্ত্রনা লাঘব করবেন। তার অন্তর থেকে হিংসা দূর করে দেবেন।[৩৮]

---

[৩৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৭৪)

[৩৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৭৫)

[৩৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৫২০)

পরস্পরকে ভালোবাসো

হযরত আনাস রা. বলেন, একদিন আমরা নবী করীম সা.-কে মুচকি হাসতে দেখলাম। হযরত ওমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল সা.! আপনি হাসছেন কেনো? রসূল সা. বললেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে হাঁটুর ওপর ভর করে দাঁড়াবে। একজন আল্লাহকে বলবে, সে আমার ওপর অত্যাচার করেছে। আমি এর প্রতিশোধ চাই।

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, নিজের অত্যাচারের বদলা আদায় করো।

অত্যাচারী উত্তর দেবে, হে আমার রব! আমার কোনো নেক বাকী নেই যা আমি আমার অত্যাচারের বিনিময়ে তাকে দিতে পারি।

অত্যাচারিত ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমার গুনাহের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিন।

এ কথা বলতে গিয়ে রসূল সা. কেঁদে ফেললেন এবং কান্নাজড়িত স্বরে বললেন, সেটা বড়ই কঠিন দিন হবে। মানুষ নিজের গুনাহের বোঝা অন্য কারো ওপর চাপানোর সুযোগ খুঁজবে।

আল্লাহ তাআলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলবেন, মাথা উঠিয়ে জান্নাতের দিকে তাকাও।

সে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে বলবে, হে আল্লাহ! সেখানে তো স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণি-মুক্তার তৈরি অট্টালিকা রয়েছে। হে আল্লাহ! এই অট্টালিকা কি কোনো নবী, সিদ্দীক বা শহীদের? আল্লাহ তাআলা বলবেন, যে তার মূল্য আদায় করবে তাকেই তা দিয়ে দেওয়া হবে। সে বলবে, হে আমার রব! কে এর মূল্য আদায় করতে পারবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমিই এর মূল্য আদায় করতে পারো। তখন সে আরয করবে, হে আল্লাহ! আমি কিভাবে এর মূল্য আদায় করতে পারি? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি নিজের ভাইকে ক্ষমা করে দিলে সেটাই হবে এর মূল্য। সে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এখন তোমরা উভয়ে একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ কর।

রসূল সা. বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও ভালোবাসা তৈরি করো। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাও মু'মিনদের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেবেন।[৩৯]

---

[৩৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২৬৯)

এক বিস্ময়কর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

একদিন আওফ ইবনে মালেক রা. আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম, আকাশ থেকে একটি রশি ঝুলে আছে। রসূল সা. রশিটি ধরে আকাশে উঠে গেলেন। তারপর রশিটিকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো। তখন আবু বকর রা. ধরলেন এবং আকাশে উঠে গেলেন। তারপর মিম্বরের চারপাশের লোকদের মাপা হলো। তখন দেখা গেলো, ওমর মিম্বরের দিকে তিন গজ এগিয়ে আছেন।

ওমর রা.ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইটুকু শুনে বললেন, আরে রাখুন তো আপনার স্বপ্ন! কী না কী স্বপ্ন দেখেছেন এটা শুনে আমরা কী করবো!

আওফ রা. চুপ হয়ে গেলেন।

ওমর রা. খলিফা হওয়ার পর একদিন আওফ রা.-কে বললেন, আওফ! তোমার ওই স্বপ্নটি একটু শোনাও তো। আওফ রা. বললেন, এখন আবার শুনতে চাচ্ছেন কেনো? সেদিন তো আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। ওমর রা. বললেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি আসলে চাচ্ছিলাম না যে, আপনি রসূল সা.-এর খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে তার মৃত্যু-সংবাদ শোনান। তখন হযরত আওফ রা. আবার তার স্বপ্নটি বর্ণনা করলেন। ওমরের তিন গজ বেশি হওয়া পর্যন্ত পৌঁছলে ওমর বললেন, এই তিন গজের ব্যাখ্যা হলো তার তিনটি বৈশিষ্ট্য। এক. তিনি খলিফা হবেন। দুই. তিনি আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির ভয় করেন না। তিন. তিনি শহীদ হবেন।

ওমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

অতঃপর আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কর্ম কর তা দেখার জন্য।[৪০]

সূতরাং হে ওমর! এখন তুমি খলীফা হয়েছো। কাজেই যে কোনো কাজের সময় ভেবে দেখবে তুমি কি করছো?[৪১]

---

[৪০] সুরা ইউনুস (আয়াত: ১৪)

[৪১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪৩৯)

তাবুক যুদ্ধের তীব্রতা

হযরত কাতাদাহ রহ. বলেন, তাবুক যুদ্ধের জন্য যখন মুজাহিদরা যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন ছিলো কঠিন গরমের সময়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, মুজাহিদরা তখন কত কষ্ট সহ্য করেছেন। বর্ণিত আছে, একটি খেজুরকে দু টুকরো করে দু'জন মুজাহিদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হতো। মাঝে মাঝে একটি খেজুর কয়েকজনকে দেয়া হতো। খেজুরটি হাত বদল হতে থাকতো। সবাই ওটা চুষে পানি পান করে সান্তনা পেতে চাইতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে একবার তাবুকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা নবী সা.-এর সাথে তাবুকের উদ্দেশে বের হই। তখন ছিলো কঠিন গরমের মৌসুম। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায় এমনভাবে কাতর হয়ে পড়ি যে, আমরা ভাবছিলাম আমরা বোধ হয় আর বাঁচবো না। কেউ পানির খোঁজে বের হলে সে এটা ধরে নিয়েই বের হতো যে, ফিরে আসার আগেই তার মৃত্যু ঘটবে। লোকেরা উট জবাই করে সেগুলোর পাকস্থলীর জমা পানি পান করতো এবং অবশিষ্টাংশ বুকের সাথে লাগিয়ে রাখতো।

এই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. রসূল সা.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে দোয়া কবুল হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এটাই চাও? সিদ্দীকে আকবর রা. বললেন, হ্যাঁ।

রসূল সা. দোয়ার জন্য হাত ওঠালেন। দোয়া শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো। মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। লোকজন নিজেদের পাত্রগুলা ভর্তি করে নিলো। আমরা যখন সেনাছাউনি থেকে বের হলাম, দেখলাম, ছাউনির আশেপাশে আর কোথাও বৃষ্টি হয়নি।[৪২]

---

[৪২] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪১৯)

উম্মতের জন্য সুসংবাদ

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সা. বলেছেন, জিবরাইল আ. আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি শিরক করে না এমন অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যিনা অথবা চুরির অপরাধে অপরাধী হয় তবুও? জিবরাইল আ. উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, যদিও সে যিনা অথবা চুরির অপরাধে অপরাধী হয় তবুও। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল আ. বললেন, হ্যাঁ, যদি সে মদ্যপানের অপরাধে অপরাধী হয় তবুও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রসূল সা.-কে তিনবার প্রশ্ন করেছিলেন আবু যর রা. নিজেই। তৃতীয়বার রসূল সা. আবু যর রা. কে বলেছিলেন, হ্যাঁ! আবু যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হোক, যদি সে যিনা অথবা চুরির অপরাধে অপরাধী হয় তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু যর রা. যখনই এই হাদীস শোনাতেন তখন হাদীসটি বলে শেষ করার পর সাথে সাথে এ কথাও বলতেন, 'আবু যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হোক'।

হযরত আবু যর রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার প্রতি আশাবাদী থাকবে এবং দোয়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার পাপ ক্ষমা করতে থাকবো। এটা দেখবো না তুমি কত বড় পাপ করেছো। যদি তুমি আমার কাছে পাপে তাপে পৃথিবী পরিপূর্ণ করে উপস্থিত হও, তাহলে আমিও তোমাকে পৃথিবী সমান ক্ষমা দেবো। তবে শর্ত হলো, তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ সমানও হয় আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।[৪৩]

ব্যাঙ মেরো না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রসূল সা. বলেছেন, তোমরা ব্যাঙ মেরো না। যখন ফিরাউন সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি হিসেবে ব্যাঙ পাঠান, তখন একটি ব্যাঙ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আগুনের চুল্লীর মধ্যে পড়ে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা ব্যাঙ এর বাসস্থান ঠাণ্ডা জায়গায় বানিয়েছেন। অর্থাৎ পানিকে তাদের বসবাসের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর তাদের ডাককে তাসবীহ গণ্য করেছেন।[৪৪]

---

[৪৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১৩৯)

[৪৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২১৪)

দুঃখ কষ্ট দূর করার দোয়া

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, কেউ যখন কোনো দুঃখ কষ্টে পড়বে, সে যেনো এই দোয়া পড়ে,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ فِي نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ عَلَى أَحَدٍ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ حُزْنِي وَنُورَ بَصَرِي وَذَهَابَ هَمِّي.

সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল সা.! আমরা কি এটা মুখস্থ করবো? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, এবং পরবর্তীতে যারা এই দোয়া শুনবে, তারাও যেনো মুখস্থ করে নেয়।[৪৫]

সম্পদ বিলীয়মান ছায়া

সহীহ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ।' অথচ তোমার সম্পদতো শুধু ততোটুকুই যতোটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছো, পরিধান করে পুরাতন করেছো এবং যা দান করে নিজের জন্য বাকী রেখেছো। এ ছাড়া তোমার সব সম্পদই অন্যের।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার জমানো বিপুল সম্পদ কোথায়? তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমার জমানো সব সম্পদ তো দুনিয়াতেই রেখে এসেছি। আল্লাহ বলবেন, এই দিনের জন্য আগে কী পাঠিয়েছো? সে উত্তর দিবে, কিছুই পাঠাইনি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার সেই সুপারিশকারীরা কোথায় যাদেরকে তুমি আমার শরীক মনে করতে? এখন তারা সুপারিশ করছে না কেনো? এভাবেই কেয়ামতের দিন তাদেরকে তিরস্কার করা হবে ও লজ্জা দেয়া হবে যারা দুনিয়াতে মূর্তি ও প্রতিমার পূজা করতো আর ভাবতো, এগুলো তাদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে উপকারী হবে।

কিয়ামতের দিন মানুষের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সব ভ্রান্তি ঘুচে যাবে। মূর্তির রাজত্বের অবসান ঘটবে। তখন আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে সম্বোধন

---

[৪৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২৪৯)

করে বলবেন, তোমাদের সেই মূর্তিগুলো এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা আমার শরীক ভাবতে? তারা কি এখন তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে নাকি তোমরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে?[৪৬]

কালো কুকুর শয়তান

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসূল সা. বলেছেন, কালো কুকুর শয়তান।[৪৭]

মুসলমানদের আমলের রূপ

সহীহ হাদীসে আছে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন একজন সুন্দর তরুণের আকৃতিতে আসবে। কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে? সে বলবে, আমি কুরআন। সারারাত তোমাকে জাগিয়ে রাখতাম। এরপর সারা দিন তোমাকে রোযার হুকুম পালনার্থে পিপাসিত রাখতাম।

আরেক হাদিসে আছে, কবরে মুমিনের কাছে একজন সুদর্শন যুবক আসবে। কবরবাসী তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? সে উত্তর দিবে, আমি তোমার নেক আমল।

অন্য এক হাদিসে আছে, এক ব্যক্তিকে কাগজের একটি টুকরো দেয়া হবে। ওটা মিযানের এক পাল্লায় রাখা হবে। অপর পাল্লায় নিরানব্বইটি কাগজের একটি খাতা রাখা হবে। যার প্রতিটি খাতা দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ ও বড় হবে। আর ওই কাগজের টুকরায় লেখা থাকবে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। সে বলবে, কোথায় এই কাগজের টুকরো আর কোথায় ওই বড় খাতা। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ তোমার ওপর জুলুম করা হবে না। এরপর দেখা যাবে গুনাহের বড় খাতার চেয়ে আর ওই কাগজের ছোট টুকরোটি বেশি ভারী।

কোনো কোনো হাদীসে আমলকারীকে ওযন করার কথাও এসেছে। যেমন এক হাদিসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একজন মোটাতাজা লোককে আনা হবে। কিন্তু সে আল্লাহর নিকট পাখির পালকের সমান ওয়নেরও হবে না। তখন আল্লাহ কুরআনের এই আয়াত বলবেন,

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য ওযনের কোনো ব্যবস্থা

---

[৪৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৯৬)

[৪৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১১২)

রাখবো না।[৪৮]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, একবার রসূল সা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা ইবনে মাসউদের সরু সরু পা দেখে আশ্চর্য হও? আল্লাহর কসম! মিযানের পাল্লায় তার সরু পা উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী হবে।

এই তিন ধরণের হাদীস একত্র করে আমরা বুঝতে পারি, কখনো আমল, কখনো আমলনামা আবার কখনো আমলকারীকে ওযন করা হবে।[৪৯]

হাওয়া আ.-এর কারণেই গর্ভযন্ত্রণা

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হযরত আদম আ. যখন গন্দম খেয়ে ফেললেন তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তোমাকে নিষেধ করার পরও তুমি কেনো এর ফল খেলে? হযরত আদম আ. বললেন, হাওয়া আমাকে এমন পরামর্শ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, আমি হাওয়াকে এই শাস্তি দিলাম যে, গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তার কষ্ট হবে, গর্ভপাতের সময়ও তার কষ্ট হবে। এ কথা শুনে হযরত হাওয়া আ. কাঁদতে লাগলেন। তখন বলা হলো, সন্তান প্রসবের সময় তুমি এবং তোমার সন্তান উভয়েই কাঁদবে।

হযরত আদম আ. তার রবের কাছ থেকে বাক্যটি শিখেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করো, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।[৫০ ৫১]

মৃত্যুর সময় দীনদার ও বেদীনের অবস্থা

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, আমরা এক আনসারীর জানাযাকে বিদায় জানাতে নবী করীম সা.-এর সঙ্গে চলছিলাম। চলতে চলতে কবর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে রসূল সা. বসে পড়লেন। আমরাও তার চারদিকে বসে পড়লাম। সবাই এমনভাবে নীরব রইলাম যেনো আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। রসূল সা.-এর হাতে একটি লাঠি ছিলো। তিনি তা দিয়ে মাটিতে

---

[৪৮] সূরা কাহাফ (আয়াত: ১০৫)

[৪৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১৫৭)

[৫০] সুরা আ'রাফ (আয়াত: ২৩)

[৫১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১৬৩)

গোলাকৃতির মতো একটি চিহ্ন আঁকলেন। তারপর রসূল সা. নিজের মাথা উঠিয়ে বললেন, 'কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো!' কথাটি তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন।

তারপর তিনি বললেন, মু'মিন যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং আখেরাতের দিকে যাত্রা করে, তখন আকাশ থেকে জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী ফেরেশতারা জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি সাথে নিয়ে অবতরণ করে। তাদের সংখ্যা এতো বেশি থাকে যে তাদের জমায়েতের ব্যাপ্তি দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে যায়। তারপর মালাকুল মউত এসে তার শিয়রে বসে বলে,

হে সন্তুষ্ট আত্মা! আল্লাহর ক্ষমার দিকে চলো! এটা শোনামাত্রই আত্মা বেরিয়ে পড়ে। যেভাবে মশকের মুখ থেকে পানির ফোটা বের হয়। আত্মা বের হওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশতারা তাকে জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দেয় এবং তার গায়ে জান্নাতী খুশবু মাখিয়ে দেয়। এই খুশবুর মতো উত্তম কোনো খুশবু দুনিয়ায় নেই। তারপর তারা তাকে নিয়ে আকাশে উঠতে থাকে। যে জায়গা দিয়েই তারা যায়, ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে বলা হয়, অমুকের ছেলে, অমুকের আত্মা। আকাশে পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলা হলে দরজা খুলে দেয়া হয়। তার সাথে অন্য সব ফেরেশতা দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত আসে। সে এক এক আসমান করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এই বান্দার নাম ইল্লিয়্যীনের দফতরে লিখে দাও এবং তাকে যমীনের দিকে ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি তাকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি। তাই এর মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দেবো। দ্বিতীয়বার মাটি থেকেই তাকে ওঠাবো। তারপর তার আত্মাকে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এখানে দুজন ফেরেশতা আসে। তার কাছে বসে তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ আমার রব। জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কী? উত্তরে সে বলে, আমার ধর্ম ইসলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে লোকটিকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিলো তিনি কে? সে উত্তরে বলে, তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। প্রশ্ন করা হয়, তোমাদের জ্ঞানার্জনের মাধ্যম কি ছিলো? জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে তার ওপর ঈমান এনেছিলাম। তখন আসমান থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা আনো। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও। জান্নাতের একটি দরজা তার জন্য খুলে দাও; যেনো জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি তার কাছে পৌঁছতে পারে। তার কবর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও।

এরপর একজন সুদর্শন যুবক সুন্দর পোষাক পরিধান করে সুগন্ধিতে সুরভিত হয়ে তার কাছে এসে তাকে বলে, সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আজ তোমার সঙ্গে

যে ওয়াদা করা হয়েছিলো তা পূর্ণ করা হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? সে লোকটি বলবে, আমি তোমার নেক আমল।

তখন মৃত ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি এখনই কিয়ামত সংঘটিত করুন। আমি আমার পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হতে চাই।

রসূল সা. বলেন, অন্যদিকে কাফের ব্যক্তি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকে, তখন কৃষ্ণবর্ণের এক ফেরেশতা চট নিয়ে উপস্থিত হয়। তার আকার হয় দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিশাল। তারপর মালাকুল মাউত এসে তাকে বলে, হে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে যা। তখন ওই আত্মা শরীরের আরও ভেতরের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফেরেশতা তাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে; যেভাবে লোহার শিক ভেজা বালির ভেতর থেকে বের করা হয়। আত্মা বের হওয়া মাত্রই ওই বিকট আকৃতির ফেরেশতা তাকে চটের মধ্যে পেচিয়ে নেয়। তার ভেতর থেকে পঁচা মৃতদেহের মতো দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতা তাকে নিয়ে আসমানের দিকে যায়। যে জায়গা দিয়েই যায়, ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, এটা কার অপবিত্র আত্মা? বলা হয়, অমুকের ছেলে অমুকের। যখন আকাশে পৌঁছে বলা হয়, দরজা খোলো! তখন দরজা খোলা হয় না।

রসূল সা. কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।[৫২]

আল্লাহ তাআলা বলেন, তাকে যমীনের অতল গহ্বর সিজ্জীনে নিয়ে যাও। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার আত্মা সিজ্জীনে নিক্ষেপ করা হয়।

তারপর রসূল সা. নিচের আয়াতটি পাঠ করেন,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

যে আল্লার সঙ্গে শরীক স্থাপন করে সে যেনো আসমান থেকে পড়লো অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেড়ে নিয়ে গেলো, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।[৫৩]

তার আত্মা তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। দুজন ফেরেশতা এসে তাকে

---

[৫২] সূরা আ'রাফ (আয়াত: ৪০)

[৫৩] সুরা হাজ্জ (আয়াত: ৩১)

জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমার ধর্ম কী? উত্তরে সে বলে, আমি জানি না। এরপর প্রশ্ন করা হয়, তোমার কাছে কাকে পাঠানো হয়েছিলো? সে বলে, আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে আওয়াজ ভেসে আসে, আমার বান্দা মিথ্যা বলছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা আনো। জাহান্নামের দরজা তার জন্য খুলে দাও। যেনো জাহান্নামের তাপ এবং গরম বাতাস তার কবরে যায়। তার কবর তার ওপর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাকে এমনভাবে চেপে ধরা হয় যে, তার পাজরের হাড্ডি মড় মড় করে ভাঙ্গতে শুরু করে। এক কুশ্রী ব্যক্তি নোংরা কাপড় পরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তার কাছে এসে বলে, আমি তোমাকে তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ দিচ্ছি। এটাই সেই দিন যেদিনের ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিলো। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার বদআমল। কাফির লোকটি তখন জাহান্নামে যাওয়ার ভয়ে বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেনো সংঘটিত না হয়।[৫৪]

হাশরের মাঠে রসূল সা.-এর সুপারিশ

কেয়ামতের দিন যখন সব বান্দার ফায়সালা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। লোকেরা হযরত আদম আ. এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আমাদের পিতা। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, তোমরা কি জানো যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিজের বিশেষ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন? ফেরেশতারা কি আমাকে ছাড়া আর কাউকে সেজদা করেছেন? সবাই বলবে, না। হযরত আদম আ. বলবেন, তারপরও আমি আল্লাহর সত্ত্বার রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জানি না। আমার সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার ছেলে ইবরাহিমের কাছে যাও।

লোকেরা হযরত ইবরাহীম আ. এর কাছে গিয়ে সুপারিশ করার আবেদন জানাবে। তিনি বলবেন, আল্লাহ তাআলা কি আমাকে ছাড়া আর কাউকে খলীল হিসেবে মনোনীত করেছেন? আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কি তার জাতি আগুনে নিক্ষেপ করেছে? সবাই বলবে, না। হযরত ইবরাহীম আ. বলবেন, তবুও আমি আল্লাহর রহস্যের ব্যাপারে পুরোপুরি জানি না। আমি শাফায়াত করতে পারবো না। তোমরা মুসার কাছে যাও।

লোকেরা হযরত মূসা আ.-এর কাছে এসে সুপারিশের আবেদন করবে।

---

[৫৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১৭২)

মূসা আ. বলবেন, আল্লাহ তাআলা কি আমাকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন? কিন্তু তারপরও আমি আল্লাহর রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জানি না। তোমরা ঈসার কাছে যাও।

লোকেরা ঈসা আ.-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন, আল্লাহ তাআলা কি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন? আমি ছাড়া আর কেউ কি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করতে পেরেছে? আমি ছাড়া আর কেউ কি মৃতকে জীবিত করতে পেরেছে? সবাই বলবে, না। তিনি বলবেন, তবুও আমি তার সত্ত্বার রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জানি না। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত। তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে যাও।

রসূল সা. বলেন, লোকেরা আমার কাছে আসবে। আমি বুকে হাত দিয়ে বলবো, হ্যাঁ আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করবো। তারপর আমি আল্লাহর আরশের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। সে সময় আমি এমন সব বাক্যে আল্লাহর প্রশংসা করবো, যা তোমরা কখনো শোননি। তারপর আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান। বলুন কী চান? আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

আমি মাথা উঠিয়ে আবার অশ্রুতপূর্ব কথায় আল্লাহর গুণকীর্তণ করবো। এরপর আবার সিজদায় পড়ে যাবো। আবার বলা হবে, উঠুন! আপনার আবেদন পেশ করুন। আমি তখন মাথা উঠিয়ে আরয করবো, হে আমার রব! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ, ক্ষমা করে দিলাম। তখন এমন কোনো নবী বা ফেরেশতা থাকবে না আমার ওপর যার ঈর্ষা হবে না। এটাই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ। তারপর আমি আমার পুরো উম্মতকে নিয়ে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবো। জান্নাতের দরজা আমার জন্য খুলে যাবে। তারপর আমার উম্মতের সবাইকে 'নাহরে হায়াত' বা 'সঞ্জীবনি নদী'র দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এই নদীর উভয় তীর মনিমুক্তা ও হীরা জহরত দ্বারা বাঁধানো থাকবে। এর মাটি হবে মিশকের এবং পাথর হবে ইয়াকূতের। ওই নদীতে গোসল করার পর তাদের শরীরের রঙ জান্নাতীদের মতো হয়ে যাবে। তাদের শরীরে জান্নাতীদের সুঘ্রাণ সৃষ্টি হবে। তাদেরকে দেখা যাবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তবে তাদের বুকে উজ্জ্বল নিদর্শন থাকবে যা দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে। তাদেরকে 'মাসাকীনু আহলিল জান্নাহ' বলা হবে।[৫৫]

---

[৫৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১৭৮)

এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতী

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, এক বেদুইন বলেন, নবী সা.-এর যুগে দুধ বিক্রির জন্য আমি মদীনায় যাই। দুধ বিক্রি শেষ করার পর আমি সঙ্গীদের বললাম, চলো রসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তার কিছু কথাবার্তাও শুনে যাই। আমি দেখলাম, রসূল সা. হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত ওমর রা. এর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পেছনে পেছনে গেলাম। দেখলাম, তারা তিনজন এক ইহুদীর বাড়িতে ঢুকছেন যিনি তাওরাতের আলিম ছিলেন। তার নওজোয়ান ও সুদর্শন সন্তানটি ছিলো মৃত্যু শয্যায়। বাবা তার সন্তানের শিয়রে বসে তাওরাত পড়ছিলো। রসূল সা. ওই ইহুদীর সাথে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে বললেন, তোমাকে তাওরাত অবতীর্ণকারীর কসম! সত্য করে বলো! তাওরাতে কি আমার গুণাবলি ও আগমণের সংবাদ নেই? সে মাথা নেড়ে বললো, নেই। তখন তার মৃত্যু শয্যায় শায়িত সন্তান বলে উঠলো, তাওরাত নাযিলকারীর কসম! আমরা আমাদের কিতাবের মধ্যে আপনার গুণাবলি ও আগমনের সংবাদ পেয়েছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

এর কিছুক্ষণ পরই ছেলেটি মারা গেলো। রসূল সা. বললেন, ছেলেটি মুসলমান। ইহুদীদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কাফন-দাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করলেন।[৫৬]

আল্লাহ তাআলার কুদরত

হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, এক পাহাড় আরেক পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করে, আজ কী তোমার ওপর এমন কোনো ব্যক্তি আরোহণ করেছে যে আল্লাহর যিকির করেছে? অপর পাহাড়টি উত্তর দেয়, হ্যাঁ, করেছে। সুতরাং পাহাড়ও মিথ্যা কথা এবং ভালো কথা শোনে।

বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে মানুষের আগমণের পর প্রথম দিকে পৃথিবীর সব গাছগাছালিই মানুষকে ফুল-ফল দিতো। কিন্তু যখন পৃথিবীর অধিবাসীরা 'আল্লাহর সন্তান আছে' এমন অপবাদ আরোপ করে, তখন যমীন দুলতে শুরু করে এবং গাছগুলোতে কাঁটা জন্মায়। ফেরেশতারা ক্রুদ্ধ হয় এবং জাহান্নাম ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।

মুসনাদে আহমাদে রসূল সা. বলেছেন, কষ্টদায়ক কথায় আল্লাহ তাআলার চাইতে অধিক ধৈর্য ধারণকারী কেউ নেই। মানুষ তার সাথে শরীক স্থাপন করে। তার সন্তান আছে এমন গুরুতর কথা বলে। অথচ তিনি তাদের নিরাপদ

---

[৫৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/২২৭)

রাখেন। রিযিক দান করতে থাকেন। তাদের বিপদাপদ দূর করতে থাকেন। তারা যখন বলে, আল্লাহর সন্তান আছে, তখন আকাশ, মাটি এবং পাহাড় পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। সন্তান থাকা আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে এটা শোভনীয় নয়। কারণ সমস্ত সৃষ্টিজীব তারই দাসত্ব করছে। তার সঙ্গী বা সমকক্ষ কেউ নেই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই তার আদেশাধীন এবং তার অনুগত দাস। তিনি সবার মনিব ও প্রতিপালক। তিনিই সবার দেখাশোনা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। তার জ্ঞান-সীমার বাইরে কেউ নেই। সবাই তার ক্ষমতাধীন। সব নারী-পুরুষ এবং সব ছোটো-বড়ো ব্যাপারে তিনি অবগত আছেন। সৃষ্টির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পুরোটার সম্পর্কেই তিনি অবগত। তার কোনো সাহায্যকারী নেই। নেই কোনো সঙ্গী ও অংশীদার। সকলকেই বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারী ছাড়া কিয়ামতের দিন তার সামনে পেশ হবে। সমস্ত সৃষ্টির ফায়সালা তার হাতে। তিনি এক ও একক। তার কোনো অংশীদার নেই। সবার ফায়সালাই তিনি করেন। যা চান তা-ই করেন। তিনি ন্যায়পরায়ন, অত্যাচারী নন। কারো হক নষ্ট করা তার শানের বিপরীত।[৫৭]

ভালো ও মন্দের প্রতিদান

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ.

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্থ; জাহান্নাম হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।[৫৮]

যেদিন পুনরুত্থানের জন্য শিংগায় ফু দেয়া হবে এবং মানুষ জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসবে, সেদিন না কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক বাকী

---

[৫৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৩২০)

[৫৮] সুরা মুমিনুন (১০১-১০৪)

থাকবে, না কেউ কারো খোঁজখবর নেবে। না কোনো পিতা তার সন্তানের প্রতি কোনো দয়াদ্র হবে, না সন্তান পিতার দুঃখে দুঃখিত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে দেখার পরও তার কোনো খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করবে না। মানুষ দেখবে তার আপনজন বিপদে রয়েছে। গুনাহের বোঝায় ডুবে যাচ্ছে। তবুও সে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করবে না। কিছু জিজ্ঞাসাও করবে না। বরং চোখ ফিরিয়ে নেবে। যেমনটি কুরআনেও বলা হয়েছে,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে ভাই থেকে তার পিতা-মাতা এবং তার স্ত্রী সন্তানাদি থেকে।[৫৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করবেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, কারো কাছে যার হক রয়েছে, সে যেনো এসে তার থেকে নিজের হক নিয়ে যায়। এ ঘোষণা শুনে যদি কারো হক নিজের বাবার ওপর, নিজের সন্তানের ওপর অথবা নিজের স্ত্রীর ওপর থাকে, সেও খুশিতে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে আসবে এবং নিজের হক চাইতে শুরু করবে। যেমনটি এই আয়াতে রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে সঙ্কলিত একটি হাদীসে রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, ফাতেমা আমাদের শরীরের একটা অংশ। যা তাকে অসন্তুষ্ট করে তা আমাকেও অসন্তুষ্ট করে। যা তাকে খুশি করে তা আমাকেও খুশি করে। কিয়ামতের দিন সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে; কিন্তু আমার বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। এই হাদীসের মূল অংশটি বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে সঙ্কলিত আরেকটি হাদীসে আছে, রসূল সা. একদিন মিম্বারে বসে বললেন, কিছু মানুষের কী হলো যে তারা বলে রসূলের আত্মীয়তাও তার সম্প্রদায়ের কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়া ও আখেরাতে সংযুক্ত রয়েছে।

লোক সকল! কেয়ামতের দিন তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, এক লোক বলবে, হে আল্লাহর রসূল সা.! আমি অমুকের পুত্র অমুক। আমি উত্তর দেবো, হ্যাঁ, বংশ তো আমি চিনেছি। কিন্তু কিছু লোক আমার পরে বিদআত উদ্ভাবন করেছিলো এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, যখন আমীরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল

---

[৫৯] সুরা আবাসা (আয়াত: ৩৪-৩৬)

খাত্তাব রা. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা. এর মেয়ে উম্মে কুলসুম রা.-কে বিয়ে করেন তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! আমার এই বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিলো যে, আমি রসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সব আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে; কিন্তু আমার আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

বর্ণিত আছে, তিনি তাদের উভয়ের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি এই বিয়েতে চল্লিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা মোহর নির্ধারণ করেছিলেন।

ইবনে আসাকিরে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া সব আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, আমার সঙ্গে যাদের বিবাহ হয়েছে তারা সবাই যেনো জান্নাতেও আমার সঙ্গে থাকে। আল্লাহর তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। পাপের চেয়ে যার একটি নেকীও বেশি হবে সে সফলকাম। সে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে নিজের কাঙ্খিত স্থানে পৌছে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। অন্য দিকে যার পাপ তার নেক কাজের চেয়ে বেশি হবে সে ধ্বংস হবে।

রসূল সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মীযানের ওপর একজন ফেরেশতা থাকবেন। তিনি প্রত্যেককে নিয়ে এসে দুই পাল্লার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তারপর পাপ ও পূণ্য ওজন করা হবে। যদি পূণ্য বেশি হয় তখন তিনি উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করবেন, অমুকের ছেলে অমুক মুক্তি পেয়ে গেছে। এরপর আর কোনো ক্ষতি কখনো তাকে স্পর্শ করবে না। আর যদি তার পাপের পাল্লা ভারি হয়, তাহলে সবাইকে ঘোষণা করবেন, অমুকের ছেলে অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামের আগুন তার মুখ ঝলসে দেবে। তার চেহারা জ্বালিয়ে দেবে। কোমর ভেঙ্গে দেবে। সে নিরাশ হয়ে যাবে। আগুনকে কখনো তারা ঠেকাতে পারবে না। রসূল সা. বলেন, জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করা মাত্রই জাহান্নামীদের সারা শরীরের গোশত হাড্ডি থেকে আলাদা হয়ে পায়ের ওপর পড়ে যাবে। তাদের চেহারা বীভৎস হয়ে যাবে। দাঁত বের হয়ে যাবে। ওপরের ঠোঁট ওপরের দিকে উঠে যাবে। নীচের ঠোঁট নীচের দিকে নেমে যাবে। ওপরের ঠোঁট তালু পর্যন্ত উঠে যাবে। নীচের ঠোঁট নাভী পর্যন্ত নেমে আসবে।[৬০]

---

[৬০] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৪৭০)

দৃষ্টিকে সংযত করলে অন্তর পবিত্র থাকে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

মুমিনদেরকে বল, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত ॥[৬১]

এই আয়াতে আল্লাহ যে সকল বস্তু দেখা হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দৃষ্টিকে সংযত করতে বলেছেন। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তাহলে দ্বিতীয়বার অথবা মন ভরে যেনো না দেখে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা. রসূল সা.-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। রসূল সা. উত্তর দেন, সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নাও। দৃষ্টি নীচু করো অথবা এদিক সেদিক দেখতে শুরু করো

হযরত আলী রা.-কে রসূল সা. বলেন, হে আলী! দৃষ্টির ওপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি অনিচ্ছায় পড়ে যায় সেটা ক্ষমা করে দেয়া হয়। ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি গুনাহের কাজ।

রসূল সা. একদিন সাহাবীদের বললেন, রাস্তায় বসো না। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কাজকর্মের জন্য তো এটা জরুরী ॥ রসূল সা. বললেন, আচ্ছা! তাহলে রাস্তার হক আদায় করো ॥ তারা জিজ্ঞাসা করলেন, রাস্তার হক কী? রসূল সা. উত্তর দিলেন,

১. দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা
২. কাউকে কষ্ট না দেয়া
৩. সালামের উত্তর দেয়া
৪. ভালো কাজের আদেশ করা
৫. অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা

রসূল সা. বলেন, তোমরা যদি ছয়টি আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, আমি তোমাদের জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব নেবো;

---

[৬১] সূরা নূর (আয়াত: ৩০)

১. মিথ্যা বলো না
২. আমানতের খেয়ানত করো না
৩. প্রতিশ্রুতির খেলাফ করো না
৪. দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখো
৫. হাতকে জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখো
৬. নিজেদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করো

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে আল্লাহ তাআলার অনুগত রাখবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিবো।

হযরত উবাইদা রা. বলেন, যে কাজের পরিণাম আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা, সেটাই কবীরা গুনাহ। যেহেতু দৃষ্টি পড়ার পর অন্তরে ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তাই দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুদৃষ্টি ইবলীসের তীর সমূহের একটি তীর। তাই যিনা থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখাও জরুরী।

রসূল সা. বলেন, তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও বাঁদীদের ছাড়া অন্য সবার থেকে নিজেদের গোপনাঙ্গ হিফাযত করো। হারাম দৃষ্টিপাত না করলে অন্তর পবিত্র হয় এবং দীন পরিচ্ছন্ন হয়। যে ব্যক্তি হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের চোখ এবং অন্তরে নূর দান করেন।

রসূল সা. বলেন, যার দৃষ্টি কোনো নারীর সৌন্দর্যের ওপর পড়ে, এরপর সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার অন্তরে ইবাদতের স্বাদ দান করেন।

তাবরানী শরীফে আছে, হয় তোমরা তোমাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, নিজেদের গোপনাঙ্গ হিফাযত করবে এবং নিজেদের চেহারা সোজা রাখবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের আকৃতি বদলে দেবেন।

দৃষ্টি শয়তানী তীরসমূহের একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে নিজের দৃষ্টি সংযত রাখবে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঈমানের নূর সৃষ্টি করে দেবেন। সে ঈমানের স্বাদ পাবে। মানুষের কোনো আমলই আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন নয়। তিনি চোখের খেয়ানত এবং অন্তরের রহস্যের ব্যাপারেও জানেন।

রসূল সা. বলতেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের ভাগ্যে তার যিনার অংশ লিখে দেয়া হয়েছে। সে অবশ্যই তা করবে। চোখের যিনা হলো দেখা, মুখের যিনা বলা, কানের যিনা শোনা, হাতের যিনা ধরা, পায়ের যিনা চলা। অন্তর কামনা করে. তারপর গোপনাঙ্গ সবগুলোকে সত্যে অথবা মিথ্যা বানিয়ে দেয়।[৬২]

---

[৬২] ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটি তা'লীকে বর্ণনা করেছেন

পূর্ববর্তী অধিকাংশ বুযুর্গানে কেরাম বালকদের দিকেও গভীর দৃষ্টিতে থাকাতে নিষেধ করেছেন। সুফীদের অনেকেই এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আহলে ইলমরা এটাকে সাধারণ হারাম বলেছেন। কেউ কেউ কবীরা গুনাহ্ বলেছেন।

রসূল সা. বলেন, প্রতিটি চোখই কেয়ামতের দিন কাঁদবে। তবে যে চোখ হারাম দৃষ্টি থেকে বিরত থেকেছে, আল্লাহর রাস্তায় জেগে থেকেছে অথবা আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তা মাছির মাথা পরিমাণই হোক না কেনো, সেই চোখ কাঁদবে না।[৬৩]

মুনাফিকের মুখ মুমিন আর অন্তর কাফের

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা অবশ্যই বের হবে; তুমি বলো, শপথ করো না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা করো নিশ্চই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।[৬৪]

এই আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর নবীর কাছে এসে নিজেদের ঈমান ও শুভাকাঙ্খার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে তাকে বিশ্বাস করাতে চাইতো যে, আমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। শুধু তা-ই নয় বরং উন্মুখ হয়ে আছি।। তবে আপনার হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছি। নির্দেশ দেয়া মাত্রই বাড়িঘর, পরিবার ও সন্তান-সন্ততি সব ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যাবো।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তাদেরকে বলে দাও, তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের প্রকৃত রূপ তো স্পষ্ট। তোমরা কথায় অনেক পটু আর কাজের বেলায় শূণ্য। তোমাদের শপথের অবস্থাও সেরকমই। অন্তরে এক রকম, মুখে আরেক রকম। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন, অন্তর ততটাই কাফের। তোমাদের এই শপথ শুধু মুসলমানদের পাশে পাওয়ার জন্য। শপথকে তারা ঢাল বানিয়েছে। তোমাদের সামনে তারা যেমন তোমাদের মতো কথা

---

[৬৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫০০)

[৬৪] সূরা নুর (আয়াত: ৫৩)

বলে, কাফিরদের সামনেও তারা তাদের মতো কথা বলে। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার শপথ করে। তারা এতটাই ভীরু ও কাপুরুষ যে, তাদের সাহায্যও করতে পারে না।

এই আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, তোমাদের কাজ হলো আনুগত্য করা, এভাবে শপথ করে বাকপটুতা দেখানো নয়। তোমাদের সাথে তো অন্য মুসলমানরাও রয়েছে। লক্ষ্য করো, তারা শপথ করে না, তারা এগিয়ে কথাও বলে না। তবে কাজের সময় তারাই সবার আগে বেরিয়ে আসে। কাজও তারা বেশি করে। আল্লাহ তাআলার কাছে কারো কোনো কাজই গোপন নয়। তিনি নিজের বান্দার প্রতিটি কাজের ব্যাপারেই সম্যক অবগত। কে অবাধ্য আর কে অনুগত এটা তার কাছে সুস্পষ্ট। প্রত্যেকের ভেতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাইরের খবর। সুতরাং তোমরা বাইরে যা কিছু প্রকাশ করো না কেনো, তিনি তোমাদের অন্তরের গোপন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।[৬৫]

হযরত ইয়াকুব আ.-এর চিঠি

ইউসুফ আ. যখন তার ভাই বিনয়ামীনকে বন্দী করার ভাণ করেন এবং ছেলেদের মারফত সেই খবর ইয়াকুব আ.-এর কাছে পৌঁছে, তখন হযরত ইয়াকুব আ. ইউসুফ আ.-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, আমরা বিপদগ্রস্থ। আমার দাদা ইবরাহীম আ.-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আমার চাচা ইসমাইল আ.-কে কুরবানীর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আমি নিজেও ইউসুফের বিরহে কাতর।

ছেলেরা বাবার এই অবস্থা দেখে তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, আব্বাজী! আপনি তো ইউসুফের কথা চিন্তা করতে করতে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে যদি আপনি এই অবস্থায় আরো কিছু দিন থাকেন, না জানি আপনার কী হয়ে যায়।

হযরত ইয়াকুব আ. তাদেরকে উত্তর দিলেন, আমি তো তোমাদের কিছুই বলছি না। আমি শুধু আমার প্রতিপালকের কাছে আমার দুঃখ ও বেদনার কথা জানাচ্ছি। সেই রবের কাছেই আমি আশাবাদী। তিনিই কল্যাণ দাতা। ইউসুফের স্বপ্নের কথা আমার মনে আছে। সেই স্বপ্নের তা'বীর প্রকাশিত হবেই।

ইবনে আবী হাতেমে রয়েছে, হযরত ইয়াকুব আ. এর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার এক চোখ কীভাবে নষ্ট হয়ে গেলো?

---

[৬৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫১৮)

আপনার কোমর কীভাবে বাঁকা হয়ে গেলো?

তিনি উত্তর দিলেন, ইউসুফের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ হারিয়েছি। আর বিনইয়ামীনের বিরহে আমার কোমর বাঁকা হয়ে গেছে। তখন জিবরাইল আ. তার কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, অন্যের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তুমি লজ্জাবোধ করো না? হযরত ইয়াকুব আ. সাথে সাথে বললেন, আমি আমার দুঃখ দুর্দশার অভিযোগ আমি আল্লাহর কাছেই করছি। হযরত জিবরাইল আ. বললেন, আপনার অভিযোগের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ভালোভাবেই অবগত আছেন।[৬৬]

গুনাহের কারণে বান্দা রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়

আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি হলো, কৃতজ্ঞ বান্দাদের রিজিক আরো বেড়ে যাবে আর অকৃতজ্ঞ, অস্বীকারকারী ও অবাধ্যদের নেয়ামত তিনি ছিনিয়ে নেবেন এবং তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন।

হাদীসে এসেছে, বান্দা গুনাহের কারণে আল্লাহর রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা.-এর কাছে একজন ভিক্ষুক এলে তিনি তাকে একটি খেজুর দিলেন। দানের স্বল্পতার কারণে সে ক্রুদ্ধ হলো এবং খেজুর না নিয়েই চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আরেকজন ভিক্ষুক এলো। তিনি তাকেও ওই খেজুরটি দিলেন। সে তা খুশি মনে গ্রহণ করলো এবং বার বার বলতে লাগলো, 'আল্লাহর রসূলের দান'। তখন রসূল সা. তাকে চল্লিশ দেরহাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৬৭]

কৃপণ ও দাতার উপমা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত ওই দুই ব্যক্তির মতো যাদের বুক থেকে গলা পর্যন্ত দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। দাতা যতো খরচ করে তার কড়াগুলো ক্রমশ ঢিলে হতে থাকে এবং তা আরও খুলে যেতে থাকে। ওই বর্মটির বড় হয়ে তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করতে চায়, তার বর্মের কড়াগুলো আরো চেপে আসে। সে এটাকে যতই প্রশস্ত করতে চায়; তা ততোই সংকীর্ণ হতে থাকে।

সহীহাইনে আরও বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. হযরত আসমা বিনতে আবি বকরকে বলেছেন, আল্লাহর পথে খরচ করতে থাকো, জমা করো না। অন্যথায়

---

[৬৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/১১)

[৬৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫৭)

আল্লাহ তাআলাও দেয়া বন্ধ করে দেবেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, গুণে গুণে রেখে দিয়ো না। নতুবা আল্লাহ তাআলাও গুণে গুণে দান করা বন্ধ করে দেবেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. আবু হুরায়রা রা.-কে বলেছেন, তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকো, আল্লাহ তাআলাও তোমাকে দিতে থাকবেন॥

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অন্য হাদীসে রয়েছে, রসূল সা. বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করে। একজন দোয়া করে, হে আল্লাহ! দাতাকে প্রতিদান দিন॥ আর দ্বিতীয়জন দোয়া করে, কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন॥

সহিহ মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে, দান-সদকাতে কারো সম্পদ কমে যায় না। দানশীলকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য অন্যদের সঙ্গে বিনয়ী আচরণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদা দান করেন।

এক হাদীসে আছে, লোভ থেকে বেঁচে থাকো॥ এটাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। লোভ লালসার প্রথম নির্দেশ হলো, কার্পণ্য করো। তারপর সে কার্পণ্য করে॥ তারপর সে তাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলে। সে তা-ও করে॥ তারপর অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়। এবারও সে তার কথামতোই কাজ করে।

বায়হাকীতে রয়েছে, মানুষ যখন দান করে, তখন সত্তরজন শয়তানের চোয়াল ভেঙ্গে যায়।

মুসনাদে আহমদের হাদীসে রয়েছে, মধ্যমপন্থায় ব্যয়কারী কখনো দরিদ্র হয় না।[৬৮]

গোপন দোয়া আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত যাকারিয়া আ. একজন ছুতার ছিলেন এবং এ কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন আল্লাহ যেনো তাকে সন্তান দান করেন। এই দোয়াটি তিনি গোপনে করতেন। কারণ মানুষ তার দোয়া শুনলে ভাববে, এই বুড়ো বয়সে সে সন্তান চায়। গোপনে দোয়া করার আরেকটি কারণ ছিলো, গোপন দোয়াই আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। খোদাভীরুদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তাআলা খুব

---

[৬৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/১৯৭)

ভালোভাবেই জানেন। তাকে চুপিসারে ডাকলেও তিনি পুরোপুরি শোনেন।

পূর্ববর্তী কোনো বুযুর্গ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে ঘুমে বিভোর রেখে একা গভীর রাতে আল্লাহ তাআলাকে ডাকে, হে আমার পরওয়ারদেগার! হে আমার পালনকর্তা! হে আমার প্রতিপালক!

আল্লাহ তাআলা তখন উত্তর দেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত। আমি তোমার কাছেই আছি।[৬৯]

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করো

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।[৭০]

এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটি হাসান হাদীস মুসনাদে ইমাম আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিন রসূল সা. নিজের বাড়ির উঠানে বসে ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা. তার কাছে এলেন। রসূল সা. বললেন, বসছো না কেনো? তিনি বসে গেলেন। রসূল সা. তার দিকে ফিরে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি দৃষ্টি আকাশের দিকে ওঠালেন। বেশ কিছুক্ষণ ওপরের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ নীচু করে তার ডান পাশের যমীনের দিকে তাকিয়ে একপর্যায়ে তিনি নিজের চেহারাও নীচু করলেন। আর এমনভাবে মাথা দোলাতে থাকলেন যেনো কারো থেকে কিছু বুঝে নিচ্ছেন আর কেউ রসূল সা.কে কিছু বলছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি এভাবে মাথা দোলালেন। তারপর তিনি চোখ উঁচু করতে শুরু করলেন। ওঠাতে ওঠাতে আবার তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর তিনি স্বাভাবিক হলেন এবং আগের মতো হযরত উসমানের দিকে ফিরে বসে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনাকে আগে কখনো এমন করতে দেখি নি। রসূল সা. বললেন, তুমি কী দেখেছো? তিনি বললেন, দেখলাম, আপনি আকাশের

---

[৬৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/২৮৭)

[৭০] সুরা নাহল (আয়াত: ৯০)

দিকে তাকালেন তারপর চোখ নীচে নামিয়ে ডান দিকে দেখতে দেখতে ঘুরে বসলেন। তারপর এমনভাবে মাথা দোলাতে লাগলেন, যেনো কেউ আপনাকে কিছু বলছে আর আপনিও খুব ভালোভাবে কথাগুলো বুঝে নিচ্ছেন। রসূল সা. বললেন, আমার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ফেরেশতা অহি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর প্রেরিত? রসূল সা. বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহরই প্রেরিত। তিনি প্রশ্ন করলেন, প্রেরিত ফেরেশতা আপনাকে কী বলেছেন? রসূল সা. কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

নিশ্চই আল্লাহ সদাচরণ ও ন্যায়পরাণতার নির্দেশ দেন।[৭১]

হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা. বলেন, তখনই আমার অন্তরে ঈমান ও রসূল সা.-এর প্রতি ভালোবাসা সুদৃঢ় হয়ে যায়।

অন্য একটি বর্ণনায় উসমান রা. বলেন, আমি রসূল সা.-এর সামনে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, জিবরীল এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমি যেনো إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ আয়াতটিকে অমুক সূরার এই জায়গায় লিখে দেই। এই বর্ণনাটিও সহীহ।[৭২]

নুহ আ. ছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা

বর্ণিত আছে, হযরত নুহ আ. যেহেতু পানাহার, পোশাক পরিধানসহ সব সময়ই আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন তাই তাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ ও হাদীসের অন্য গ্রন্থগুলোতে রসূল সা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজের ওই বান্দার প্রতি অনেক খুশি হন, যে খাবারের লোকমা খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, পানির ঢোক পান করেও শুকরিয়া আদায় করে। আরও বর্ণিত আছে যে, রসূল সা. সব সময় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে থাকতেন।

শাফাআতের যে দীর্ঘ হাদীস বুখারী ও হাদীসের অন্য গ্রন্থগুলোতে সঙ্কলিত হয়েছে তাতে আছে, যখন মানুষ আল্লাহর কাছে সুপারিশ চাওয়ার জন্য হযরত নুহ আ. এর কাছে আসবে, তখন তাকে বলবে, পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে আপনিই সর্বপ্রথম রসূল। আল্লাহ তাআলা আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।[৭৩]

---

[৭১] সূরা নাহল (আয়াত: ৯০)

[৭২] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/১৩৯)

[৭৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/১৮২)

শেষ যুগে হাফেযদের অন্তর থেকেও কুরআন মুছে যাবে

আল্লাহ তার প্রিয় রসূল মুহাম্মাদ সা.-কে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহর একটি নিয়ামত হলো, তিনি তার ওপর ওই পবিত্র কিতাব নাযিল করেছেন যাতে কখনও কোনো মিথ্যা মিশ্রিত হবে না। তিনি চাইলে এই কিতাব উঠিয়েও নিতে পারেন।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, শেষ যুগে এক ধরণের লাল বাতাস প্রবাহিত হবে। যা সিরিয়ার দিক থেকে উঠবে। সে সময় কুরআনের পাতা এবং হাফেযদের অন্তর থেকে কুরআন মুছে যাবে। একটি হরফও বাকী থাকবে না। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে এই বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্মবিধায়ক পেতে না।[৭৪]

এর পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ কুরআন প্রত্যাহার না করাকে আল্লাহর বড় অনুগ্রহ উল্লেখ করে বলেন, এই কুরআনে কারীমের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে যে, পৃথিবীর সব মানুষ ও জিন মিলেও এর মতো কোনো গ্রন্থ লিখতে অপারগ। আল্লাহ তাআলা নিজে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়, একইভাবে তার কালামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় ।[৭৫]

নেক ও মন্দের পরিণাম

সফওয়ান ইবনে মুহরিয রহ. বলেন, কিয়ামতের দিন দুই ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। একজন গোটা পৃথিবীর বাদশাহ ছিলো। তার হিসাব নিয়ে দেখা যাবে সারা জীবনে সে একটি সৎ কাজও করে নি। তাকে জাহান্নামে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। আরেকজন একটি কম্বলকে সম্বল করে দুনিয়ার জীবনকে কাটিয়ে দিয়েছে। তার থেকে হিসাব নেওয়ার সময় সে বলবে, হে আমার রব! দুনিয়াতে আমার কাছে এমন কী ছিলো যে, আজ তার হিসাব নেয়া হবে! আল্লাহ তাআলা বলবেন, সে সত্য বলেছে। তাকে ছেড়ে দাও। তাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

---

[৭৪] সুরা বনী ইসরাঈল (আয়াত: ৮৬)

[৭৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/২২৬)

কিছুক্ষণ পর তাদের উভয়কে ডাকা হবে। জাহান্নামী বাদশাহকে দেখাবে কুচকুচে কালো কয়লার মতো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কেমন আছো? সে উত্তরে বলবে, খুবই খারাপ অবস্থায় আছি, খুবই নিকৃষ্ট এক জায়গায় আমার বসবাস। তারপর জান্নাতীকে ডাকা হবে। তার চেহারা হবে চতুর্দশী চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, বলো, তুমি কেমন আছো? সে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আল্লাহ আমাকে অতিউত্তম বাসস্থান দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, উভয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাও।

হযরত সাঈদ সওয়াফ রহ. বলেন, মুমিনের কাছে কিয়ামতের দিনটি হবে আসর থেকে মাগরিবের সময়ের মত ছোট। তাদেরকে জান্নাতের বাগানে পৌঁছে দেয়া হবে। সমস্ত মাখলুকের হিসাব হয়ে যাবে এবং জান্নাতীরা উত্তম বাসস্থান পাবে।[৭৬]

আকাশ ও পৃথিবীর সব ক্ষমতা আল্লাহর হাতে

মুসনাদের হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দা! তোমরা সবাই গুনাহগার; যাকে আমি ক্ষমা করবো সেই ক্ষমা পাবে। তোমরা সবাই দরিদ্র; যাকে আমি ধনাঢ্যতা দান করি সেই ধনবান। আমি বড় দানশীল। আমি মর্যাদাবান। আমি ধনী। আমি যা ইচ্ছা তাই করে থাকি। আমার পুরস্কারও একটি নির্দেশের ব্যাপার। আমার শাস্তিও একটি নির্দেশের ব্যাপার। আমি যা করতে ইচ্ছা করি শুধু বলে দেই 'হয়ে যাও', সাথে সাথে তা হয়ে যায়।'

তিনি চিরঞ্জীব। তার সত্ত্বা পবিত্র। তিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহ। তার হাতেই আকাশ ও পৃথিবীর সব ক্ষমতা। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই প্রকৃত আইনদাতা। তার কাছেই সবাই প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনিই শাস্তি ও উত্তম প্রতিদানের মালিক।[৭৭]

---

[৭৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৪)

[৭৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৩৫৭)

দুই শরিক ব্যবসায়ী

দুই ব্যক্তি যৌথভাবে ব্যবসা করতো। তাদের কাছে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা জমা হলো। তাদের একজন ব্যবসার কৌশল সম্পর্কে বেশি জানতো। অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতো না। অভিজ্ঞ শরিক তার সঙ্গীকে বললো, এখন আমাদের একসাথে ব্যবসা করা কঠিন। তুমি তোমার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যাও। তুমি ব্যবসা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানো না। সে অনুযায়ী তারা উভয়ে তাদের নিজেদের অংশ আলাদা করে নিয়ে পৃথক হয়ে গেলো।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী তার দেশের বাদশার মৃত্যুর পর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শাহী মহল কিনে নিলো এবং নিজের সঙ্গীকে ডেকে তাকে শাহী মহল ঘুরিয়ে দেখালো এবং বললো, দেখো আমি কেমন জিনিস কিনেছি? সরল বন্ধুটি তার মহলের অনেক প্রশংসা করে ফিরে এলো। এরপর সে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলো, হে আমার রব! আমার বন্ধু এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ কিনেছে। আমি আপনার কাছে জান্নাতের প্রাসাদের আবেদন জানাচ্ছি। আমি আপনার মিসকীন বান্দাদের মাঝে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করে দিচ্ছি।

সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলো।

কিছু দিন পর দুনিয়াদার লোকটি এক হাজার দিনার ব্যয় করে বিয়ে করলো। বিয়েতে সে তার পুরনো বন্ধুকেও দাওয়াত করলো এবং বললো, আমি এক হাজার দিনার খরচ করে এই নারীকে বিবাহ করেছি। এবারও সে তার খুব প্রশংসা করলো। ফিরে এসে সে আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার দিনার দান করে আরয করলো যে, হে আল্লাহ! আমার বন্ধু এক হাজার দিনার খরচ করে এই দুনিয়ার স্ত্রী লাভ করেছে। আর আমি আপনার এক হাজার দিনার দান করে জান্নাতের হুর কামনা করছি।

কিছুদিন পর ওই দুনিয়াদার লোকটি তার বন্ধুকে ডেকে বললো যে, আমি দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছি। দেখো তো কেমন হয়েছে? সে তা দেখে আবারো তার খুব প্রশংসা করলো। এবং ফিরে এসে আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলো, হে পরওয়ারদেগার! আমার বন্ধু দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দুনিয়াতে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার কাছে জান্নাতের দু'টি বাগানের আবেনদ করছি এবং দু'হাজার দিনার আপনার রাস্তায় সদকা করে দিচ্ছি।

ফেরেশতা যখন তাদের উভয়কে জান কবয করলো তখন সদকাকারীকে জান্নাতের প্রাসাদে পৌঁছে দেয়া হলো। সেখানে সে এক অতি অনিন্দ্য সুন্দরী হুর লাভ করলো এবং তাকে দু'টি বাগানও দেয়া হলো। এ ছাড়া আরো এমন বহু নেয়ামত লাভ করলো যা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। তখন তার ওই

অভিজ্ঞ সঙ্গীর কথা মনে পড়লো। তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ফেরেশতারা উত্তর দিলো, সে তো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পারো। সে তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে দেখে বললো, তুমি তো আমাকে প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলেই দিয়েছিলে; তবে এটা আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে তিন হাজার করে দিনার ছিলো। একজন ছিলো কাফির আর অপরজন মুমিন। মুমিন ব্যক্তি তার সব টাকা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেললো। এরপর জীবন ধারণের জন্য তাকে মাথায় টুকরি ও কাঁধে কোদাল নিয়ে বের হতে হলো। পথে তার সাথে এক লোকের সাক্ষাত হলো। লোকটি তাকে বললো, তুমি আমার গৃহপালিত পশুগুলো দেখাশোনা করবে এবং সেগুলোর গোবর পরিস্কার করবে, বিনিময়ে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করবো। মুমিন লোকটি এই চুক্তিতে রাজি হয়ে কাজ শুরু করে দিলো। মালিকটি ছিলো অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। তার কোনো পশুকে অসুস্থ বা দুর্বল দেখলেই সে ওই মিসকিন কর্মচারিকে খুব মারপিট করতো। তাকে পশুখাদ্য চুরির অপবাদ দিতো। লোকটির অত্যাচার তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সে অতিষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন সে ভাবলো, এতো অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে আমি আমার কাফের বন্ধুর কাছে চলে যাই। তার ফসলি জমি আছে। বহু বাগান আছে। আমি সেখানেই কাজকর্ম করবো। আমাকে শুধু খেতে দিলেই হবে। আমার আর নেয়ার কি আছে? এইটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। এই ভেবে সে অত্যাচারী মালিকের বাড়ি ছেড়ে রওয়ানা হলো। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তার আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ দেখে সে বিস্মিত হলো। সেই আলীশান মহলের শান শওকত ছিলো শাহী মহলের মতোই। দরজায় ছিলো দারোয়ান। অনেক চাকর, খাদেম ও গোলাম-বাদীতে বাড়িটি গম্ গম করছিলো। দারোয়ান তাকে ভেতরে যেতে বাঁধা দিলো। সে তাদের বললো, তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে গিয়ে আমার কথা বলো। তিনি খুব খুশি হবেন এবং আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। তারা বললো, এখন ভেতরে যাওয়ার সময় নয়। তুমি এক কোনায় শুয়ে থাকো। সকালে যখন তিনি বের হবেন তখন তুমি নিজেই সালাম করো। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহলে তিনি তোমাকে চিনবেন। আর না চিনলে আমারাই তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো। দরিদ্র ব্যক্তিটি তাদের কথা মতো গায়ের কম্বলটি বিছিয়ে এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে রইলো। সকাল বেলা সে তার বন্ধুর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। যখন সে বের হয়ে তাকে দেখতে পেলো, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বন্ধু! তোমার এই অবস্থা কেনো? টাকা-পয়সা কী করেছো? সে বললো, ওটা আর জিজ্ঞাসা করো

না। এখন আমার যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে পারবে কি না দেখো। অর্থাৎ আমাকে তোমার ক্ষেত-খামারে কাজ করার সুযোগ দাও। চাকর-বাকরকে পরিচালনার দায়িত্বও দিতে পারো। এর বিনিময়ে আমাকে দুই বেলা খেতে দিলেই চলবে। যখন এই কম্বল পুরনো হয়ে ফেটে যাবে, তখন আমাকে একটা নতুন কম্বল কিনে দেবে। সে বললো, তুমি আমার বন্ধু হয়ে আমার কাছে কাজ করে খাবে এটা তো হতে পারে না। আমি তোমার জন্য আরো উত্তম ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু এ কথাটা তো বলো যে, তুমি তোমার টাকা-পয়সা কী করেছো? সে উত্তর দিলো, আমি ওই টাকা একজনকে ঋণ দিয়েছি। সে প্রশ্ন করলো, কাকে ঋণ দিয়েছো? মুমিন লোকটি বললো, যিনি আমার টাকা না নিলেও তার কোনো ক্ষতি নেই বরং তাকে ঋণ দিতে পারলে আমারই লাভ এবং আমার টাকা পরিশোধ করার ক্ষেত্রেও তিনি কখনো অস্বীকার করবেন না। এগুলোকে নষ্টও করবেন না।

তার বন্ধু বললো, তিনি কে? সে উত্তর দিলো, ওই আল্লাহ যিনি আমার এবং তোমার রব। এ কথা শোনা মাত্রই কাফির লোকটি মুমিন বন্ধু থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলো এবং তাকে বললো, নির্বোধ! এটা কী করেছো তুমি? এটা কি কখনো সম্ভব যে, আমরা মরে পঁচে গলে মাটি হয়ে যাবো। তারপর আমরা আবার জীবিত হবো এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রতিদান দেবেন? তোমার বিশ্বাস যখন এতো অদ্ভুত, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না।

এরপর কাফের পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো। আর মুমিনের দিন কাটতে লাগলো অত্যন্ত কষ্টে। শেষ পর্যন্ত উভয়েরই মৃত্যু হলো। মুসলমান লোকটিকে জান্নাত দান করা হলো। সে জান্নাতে এতো নেয়ামত লাভ করলো যে, এতো নেয়ামত লাভ করার কথা সে কখনও কল্পনাও করে নি। সে দেখলো, তাকে এমন এক জায়গায় আনা হয়েছে যেখানে যতদূর চোখ যায় খেজুর ও অন্যান্য ফলমুলের বাগান, সেখানে আছে প্রবাহিত ঝর্না ও নদী। সে খুব বিস্মিত হয়ে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলো, এসব কার জন্য? তারা উত্তর দিলো, এগুলো সবই তোমার। সে বললো, সুবহানাল্লাহ! এটা তো আল্লাহ তাআলার বড়ই মেহেরবাণী। তারপর যখন তিনি আরেকটু অগ্রসর হলো তখন দেখলো, অসংখ্য দাস-দাসী তার আদেশের অপেক্ষা করছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, এগুলো কার? বলা হলো, সবই তোমার। সে আরো বেশী আশ্চর্য ও বিস্মিত হয়ে গেলো। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সে দেখতে পেলো, লাল ইয়াকূত পাথরের নির্মিত একটি মহল দেখা যাচ্ছে। পাশে আরও অনেকগুলো মহল দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি মহল তৈরি হয়েছে বিরাট আকারের একটি মোতি দিয়ে। প্রত্যেকটি

মহলে কয়েকজন করে হূর। সে যখন জানতে পারলো এসবও তারই জন্য, তখন বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার মুখে কথা সরলো না। হঠাৎ তার মনে পড়লো দুনিয়ার কাফের বন্ধুর কথা। সে বললো, হে আল্লাহ! আমার দুনিয়ার ওই কাফের বন্ধু কোথায়? আল্লাহ তাআলা তাকে দেখালেন, সে জাহান্নামে জ্বলছে।[৭৮]

স্বপ্নে আল্লাহর সাথে রসূল সা.-এর সাক্ষাত

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, একদিন ফযরের নামাজে আসতে রসূল সা.-এর খুব দেরি হলো। সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে, তখন তিনি এলেন। ইকামত দেয়া হলো এবং রসূল সা. খুব অল্প সময়ে নামায শেষ করলেন। এরপর সাহাবীদের বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তারপর তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বললেন, রাতে আমি তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলাম। নামায পড়তে পড়তে আমার তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো। আমি দেখলাম, আমি যেনো আমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আল্লাহ তাআলাকে সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা এখন কি নিয়ে বাদানুবাদ করছে তুমি কি জানো? আমি আরয করলাম, হে আমার রব! আমি কীভাবে জানবো? এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর মহান আল্লাহ তাআলা আমার দু'কাঁধের মাঝে হাত রাখলেন। আমি আমার বুকে তার আঙ্গুলগুলোর ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করলাম। সবকিছু আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি সবকিছু জানতে পারলাম। তারপর তিনি আবার আমাকে বললেন, এখন বলো, ঊর্ধ্বলোকের ফেরেশতাদের মাঝে কি নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছে? আমি বললাম, গুনাহের কাফফারা সম্মন্ধে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আল্লাহ বললেন, তুমি বলো কাফফারা (পাপ মোচনের উপায়) কী কী? আমি বললাম, জামাতে নামায আদায় করার জন্য দ্রুত চলা। নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা। মনে না চাইলেও পরিপূর্ণভাবে অযু করা।

তারপর মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি পায়? আমি বললাম, দরিদ্রকে আহার করানো, নম্রভাবে কথা বলা এবং রাতের বেলা যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে নামায পড়ার মাধ্যমে।

আমার রব আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী চাও? আমি বললাম, আমি ভালো কাজ করার, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার এবং দরিদ্রদের ভালোবাসার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আরও প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার প্রতি সদয় হবেন এবং যখন কোনো জাতিকে আপনি ফেতনায় ফেলার

---

[৭৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৩৬৭)

সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন ওই কেতনায় পড়ে যাওয়ার আগেই আমাকে মৃত্যু দেবেন। আর আপনার কাছে আপনার ভালোবাসা, যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং ওই কাজ করার তাওফীক প্রার্থনা করছি যা আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছাকাছি নিয়ে যাবে।[৭৯]

সুরায়ে আ'লার বিশেষ ফযিলত

মুসনাদে আহমাদে আছে , রসূল সা.-এর কাছে এই সূরা অনেক প্রিয় ছিলো। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসেও রয়েছে, রসূল সা. হযরত মুআয রা. কে বললেন, তুমি কোনো সূরা আ'লা, সূরা শামস এবং সূরা লাইল দিয়ে নামায পড়াও না?

মুসনাদে আহমদে আরো বর্ণিত আছে, রসূল সা. দুই ঈদের নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়া পড়তেন। আর যদি জুমাবারে ঈদ হতো তাহলে ঈদের নামাযে এবং জুমার নামাযে উভয় নামাযেই তিনি এই দুই সূরা পড়তেন। আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতেও এমন বর্ণনা রয়েছে। ইবনে মাযাহ ও অন্য হাদীসের গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, বিতরের নামাযে রসূল সা. সূরা আ'লা, সূরা কাফেরূন এবং সূরা ইখলাস পড়তেন। এই হাদীসও একাধিক সাহাবা থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। কিতাবের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে ওই সবগুলো সনদ ও বর্ণনা পৃথক পৃথক শব্দাবলিসহ উল্লেখ করতাম। কিন্তু এখানে এইটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।[৮০]

দীনের ওপর অটল থাকা কঠিন

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর এক প্রতিবেশী একবার কোনো এক সফর থেকে ফিরে এলে হযরত জাবের রা. তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য গিয়ে দেখলেন, তিনি বিভিন্ন জায়গার মানুষের বৈরিতা, শত্রুতা এবং মতানৈক্যের কথা বলছে। তখন রসূল সা.-এর এই সাহাবী স্থীর থাকতে পারলেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহর হাবীব, বিচার দিবসের সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সা.-কে বলতে শুনেছি, লোকজন দলে দলে দীনের মধ্যে প্রবেশ করবে, কিন্তু অচিরেই লোকজন আবার দলে দলে দীন থেকে বেরও হয়ে যাবে।[৮১]

---

[৭৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৪০৮)

[৮০] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৫৩৯)

[৮১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৬১১)

ক্ষমা শান্তি দেয়

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. বলেন, যদি তোমার কাছে কেউ এসে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তাহলে তুমি তাকে উপদেশ দেবে, ভাই! তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করার মধ্যেই মঙ্গল। এটাই তাকওয়ার দাবি। সে যদি তোমার কথা না মানে এবং প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে বলো, প্রতিশোধ নাও, কিন্তু সীমালংঘন করো না। আমি সব সময়ই ক্ষমা করে দেওয়ার উপদেশ দেই। ক্ষমার মধ্যেই আছে শান্তি ও সফলতা। ক্ষমাকারী ক্ষমা করে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। আর প্রতিশোধ গ্রহণকারী প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় রাত দিন অস্থির হয়ে থাকে। রাতে তার ঘুম হয় না।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, এক দিন এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে গালমন্দ করছিলো। আবু বকর রা. নীরবে তার কথা শুনছিলেন। উত্তর দিচ্ছিলেন না। রসূল সা.ও সেখানে উপস্থি ছিলেন। তিনি আবু বকরের নীরব থাকতে দেখে মুচকি হাসছিলেন। লোকটি দীর্ঘক্ষণ গালমন্দ করেও থামছে না দেখে শেষে আবু বকরও তার কয়েকটি কথার উত্তর দিলেন। আবু বকরকে উত্তর দিতে দেখে রসূল সা. অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। সিদ্দীকে আকবর রা. রসূল সা.-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! লোকটি যখন আমাকে গালমন্দ করছিলো আপনি বসে বসে শুনছিলেন। আর আমি তার দু একটি কথার জবাব দিতেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে চলে এলেন! রসূল সা. বললেন, যতক্ষণ তুমি নীরব ছিলে, একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিলো। যখনই তুমি বলতে শুরু করলে তখন ফেরেশতা সেখান থেকে চলে গেলো এবং শয়তান এসে উপস্থিত হলো। শয়তানের উপস্থিতিতে আমি কীভাবে সেখানে বসে থাকি? আবু বকর! তিনটি কথা মনে রাখো: ১. যার ওপর জুলুম করা হয় আর সে সহ্য করে, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন। ২. যে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে দান করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার সম্পদে বরকত দান করেন এবং তার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। ৩. যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে, এর কাছে ওর কাছে চেয়ে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলা তার ধন-সম্পদ থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং তার সম্পদ কমতেই থাকে।[৮২]

---

[৮২] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/২২)

রসূল সা.-এর বিস্ময়কর নসিহত

ইবনে আবি হাতেমের হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে হয়ে আল্লাহর অভিমুখী হয় আল্লাহ তাআলা সব বিপদাপদে তার সাহায্যকারী হয়ে যান। অর্থাৎ তার বিপদাপদ দূর করে দেন। হিসাব ছাড়া রিযিক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ামুখী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার কাছেই ছেড়ে দেন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদিসে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রা. রসূল সা.-এর সাথে তার সওয়ারির পেছনে বসে ছিলেন। রসূল সা. বললেন, কয়েকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে তাহলে তিনিও তোমাকে স্মরণে রাখবেন। আল্লাহর নির্দেশের হিফাযত করবে, তাহলে তাকে তোমার কাছেই উপস্থিত পাবে। যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে আল্লাহর কাছেই চাইবে। যদি কোনো বিষয়ে সাহায্য চাইতে হয়, তার কাছেই সাহায্য চাইবে। আল্লাহর সাহায্য তোমার সাথে থাকলে সবাই মিলে তোমার উপকার করবে। আল্লাহ তাআলা যদি না চান, তাহলে সবাই মিলে হাজারো চেষ্টা করলেও তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। একইভাবে সবাই মিলে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় আর তকদিরে অন্যরকম লেখা থাকে তাহলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের তকদির লিখিত হয়ে কলম উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।

মুসনাদে আহমদের অন্য হাদিসে রয়েছে, যদি কারো কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আর সে মানুষজনের কাছে চেয়ে বেড়ায়, তাহলে এই সম্ভাবনাই বেশি যে তার প্রয়োজন আরো বেড়ে যাবে, সে আরো বেশি বিপদে পড়বে এবং তার কাজকর্ম কঠিন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে নিজের সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে পেশ করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন। হয়তো দ্রুতই এই দুনিয়াতে অথবা কিছুটা বিলম্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পর।[৮৩]

---

[৮৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৩৭৬)

দা'ঈর দশটি গুণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

সুতরাং তুমি তার দিকে আহ্বান কর ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। বলো, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্র করবেন এবং আমরা ফিরে যাবো তারই কাছে।[৮৪]

কুরআনে কারীমের এই আয়াতের একটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কুরআনের আরও একটি আয়াতে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যটি হলো, এই আয়াতের দশটি শব্দে দশটি সতন্ত্র হুকুম রয়েছে। আয়াতুল কুরসীতেও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম হুকুম : ওহী আপনার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরকম ওহীই আপনার পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের ওপরও আসতো। যে বিধানাবলি আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এসব বিধানাবলি আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের জন্যও নির্ধারণ করা হয়েছিলো। তাই আপনি মানুষকে সত্যের পথে ডাকুন। ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজে লেগে থাকুন।

দ্বিতীয় হুকুম : আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও একত্ববাদের বিশ্বাসে আপনি নিজে অটল থাকুন এবং আপনার অনুসারীদেরকেও অটল রাখুন।

তৃতীয় হুকুম : মুশরীকদের মধ্যে যেসব স্বভাব আছে যেমন আল্লাহর অবাধ্যতা, অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া এবং গায়রুল্লাহর উপাসনা করা ইত্যাদি, সাবধান! আপনি কখনোই তাদের এসব কাজের অনুসরণ করবেন না।

---

[৮৪] সুরা শুরা (আয়াত: ১৫)

তাদের চাহিদা মত চলবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির কোনো দাবি মেনে নেবেন না।

চতুর্থ হুকুম : নিজের এই বিশ্বাস উচ্চকিত আওয়াজে প্রচার করুন যে, আল্লাহর অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের ওপর আমি ঈমান এনেছি।

পঞ্চম হুকুম : বলুন আমি তোমাদের মধ্যে ওই বিধানই জারি করতে চাচ্ছি যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছানো হয়েছে। যার ভিত্তি হলো একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ।

ষষ্ঠ হুকুম : বলুন সত্যিকারে মাবুদ ও উপাস্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আমাদের এবং তোমাদেরও সত্যিকারের উপাস্য তিনিই। তিনিই সবার পালনকর্তা। কেউ কেউ অবাধ্য হয়ে তাকে সিজদা না করলেও প্রকৃত অর্থে সকলেই বরং প্রতিটি জিনিসই তার সামনে নত হয়ে আছে। সিজদায় পড়ে আছে।

সপ্তম হুকুম : বলো আমাদের আমল আমাদের সঙ্গে, তোমাদের আমল তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ.

> হে নবী! তারা যদি আপনাকে অবিশ্বাস করে, তবে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আমার জন্য আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমি যে কর্ম করি তা হতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যে কাজ কর তা হতে আমিও দায়মুক্ত।[৮৫]

অষ্টম হুকুম : বলো আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। কোনো তর্ক-বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই। হযরত সুদ্দী রহ. বলেন, এই হুকুম মক্কায় ছিলো; মদিনায় হিজরতের পর জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়। সম্ভবত এটাই সঠিক। কারণ এই আয়াত মক্কী। আর জিহাদের আয়াত মদিনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়।

নবম হুকুম, বলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে,

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

---

[৮৫] সূরা ইউনুস (আয়াত: ৪০)

আপনি বলে দিন যে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক একত্রিত করবেন। অতঃপর আমাদের মধ্যে সত্যের সাথে ফায়সালা করবেন। তিনিই ফায়সালাকারী এবং সর্বজ্ঞ।

দশম হুকুম : বলো তার দিকেই আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[৮৬]

মুনাফিকের আলামত

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সা. বলেন, মুনাফিকদের বহু আলামত রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাদের চেনা যায়। তাদের সালাম হয় অভিসম্পাত। আহার হয় লুটতরাজ। হারাম ও খেয়ানতের সম্পদকে তারা গনীমত মনে করে। তারা মসজিদের নিকটবর্তী হতে অপছন্দ করে। নামাযের জন্য শেষ সময়ে আসে। তারা অহংকারী, আত্মগর্বী এবং উদ্ধত স্বভাবের হয়। বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাবে থাকে না। না তারা নিজেরাও কোনো ভালো কাজ করে আর না অন্যকে ভালো কাজ করার উৎসাহ দেয়। তারা রাতের বেলা কাঠের মতো ঘুমে বেহুশ হয়ে থাকে। দিনের বেলা হট্টগোল করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, দিনের বেলায় খুব পেটুকের মতো আহার করে। আর রাতে শুকনো কাঠের টুকরোর মতো ঘুমে বেহুশ হয়ে থাকে।[৮৭]

স্বামী-স্ত্রীর ঘটনার সূত্র

মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। যাতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, পূর্বেকার যুগে এক স্বামী ও স্ত্রীর ঘটনা। তারা ছিলো খুব দরিদ্র, বলা যায় প্রায় নিঃস্ব। তারা খুব কষ্টে দিন কাটাতো। একবার স্বামী সফর থেকে ফিরে এলো। সে ছিলো খুব ক্ষুধার্ত। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, খাবার কিছু আছে? স্ত্রী বললো, আপনি জেনে আনন্দিত হবেন, আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত রিযিক আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। স্বামী বললো, যা আছে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। আমি খুব ক্ষুধার্ত। স্ত্রী বললো, একটু ধৈর্যধারণ করুন। আশা করি আমাদের ওপর আল্লাহ রহম করবেন। আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলো। কোনো খাবার এলো না। স্বামী অস্থির হয়ে বললো, তোমার কাছে যা আছে তা দিচ্ছো না কেনো? আমি ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছি। স্ত্রী বললো, এতো তাড়াহুড়া করছো কেনো? এখনই আমি চুলো থেকে পাতিল নামিয়ে আনছি। কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখলো যে, স্বামী আর কোনো

---

[৮৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৯)

[৮৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৩৬০)

কথাই শুনতে চাইছে না তখন সে বাধ্য হয়ে উঠে রান্না ঘরে গেলো। আসলে চুলোয় কিছু ছিলো না। কিন্তু সে দেখলো আল্লাহর অসীম কুদরতে চুলোর ওপরের পাতিল বকরীর রানের গোশতে পূর্ণ হয়ে আছে। অন্যদিকে আটা পেষার দু'টি যাতা নিজে নিজেই ঘুরছে এবং ভেতর থেকে আটা বের হচ্ছে। সে চুলো থেকে গোশত নামালো। যাতা ঝেড়ে সব আটা বের করলো।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল সা. বলেছেন, সে যদি শুধু আটা নিতো, যাতা না ঝাড়তো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত ওই যাতা ঘুরতে থাকতো।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি বাড়িতে ফিরে দেখলো, ক্ষুধার জ্বালায় পরিবারের সবার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি জঙ্গলের দিকে গেলেন। এদিকে তার নেককার স্ত্রী যখন দেখলো, তার স্বামী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং তাদের দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে, তখন সে তার যাতা ঠিকঠাক করলো এবং চুল্লিতে আগুন ধরালো। তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদের রিযিক দান করুন। দোয়া শেষ করে উঠে সে দেখলো, পাতিল গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আর যাতা থেকে অনবরত আটা বের হচ্ছে। এর মধ্যে স্বামীও ফিরে এলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছো? স্ত্রী উত্তর দিলো, হ্যাঁ। আমাদের রব আমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। সে গিয়ে যাতার একটি তক্তা উঠিয়ে আটা নিলো। নবী সা. এই ঘটনা বর্ণনাার সময় বলেন, যদি সে তা না ওঠাতো তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এই যাতা ঘুরতে থাকতো। কখনোই বন্ধ হতো না।[৮৮]

আল্লাহ নির্বোধদের নেতৃত্ব থেকে রক্ষা করুন

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত কা'ব ইবনে আজযাহ রা.-কে উদ্দেশ্য করে রসূল সা. বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নির্বোধদের নেতৃত্ব থেকে রক্ষা করুন। হযরত কা'ব রা. বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা আবার কিসের নেতৃত্ব? রসূল সা. বললেন, আমার পর কিছু নির্বোধ ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে বসবে। তারা আমার সুন্নাহ ছেড়ে দেবে। তখন যারা তাদের মিথ্যা কথগুলোকে সত্যায়ন করবে, তাদের অন্যায়ে সহযোগী হবে, তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমিও তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত নই। মনে রেখো! তারা আমার হাউজে কাউসারের সামনেও আসতে পারবে না।

আর যারা তাদের মিথ্যার সত্যায়ন করবে না, তাদের অন্যায় অত্যাচারের

---

[৮৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৩৮০)

সহযোগী হবে না, তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত, আমিও তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা আমার হাউজে কাউসারের কাছে আমার সাথে সাক্ষাত করবে।

হে কা'ব! রোযা ঢালের মতো। সদকা পাপের কাফফারা হয়। আর নামায আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। অথবা বলেছেন, নাযাত লাভের দলিল।

হে কা'ব! ওই শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম সম্পদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে। সেই শরীর তো জাহান্নামে যাওয়ারই যোগ্য।

হে কা'ব! মানুষ প্রত্যেক সকালে নিজের আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। কেউ নিজের আত্মাকে স্বাধীন করে নেয়। আর কেউ আত্মাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।[৮৯]

বাড়ি থেকে দীনের নিয়তে বের হও

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, যখন কেউ ঘর থেকে বের হয়, তখন তার দরজার সামনে দুটি পতাকা থাকে। একটি ফেরেশতার হাতে, অন্যটি শয়তানের হাতে। যদি সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন কোনো কাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়, তাহলে ফেরেশতা নিজের পতাকা নিয়ে তার সঙ্গে যেতে থাকে এবং সে ঘরে ফেরা পর্যন্ত ওই ফেরেশতার পতাকার নীচেই থাকে। আর যদি সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কোনো কাজে বের হয়, তাহলে শয়তান তার পতাকা নিয়ে তার সাথে বের হয় এবং ঘরে ফেরা পর্যন্ত শয়তানের পতাকার নিচেই সে অবস্থান করে।[৯০]

আলী রা.-এর ফয়সালা

গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল হলো ছয় মাস। এর পক্ষে খুবই শক্তিশালী দলিল রয়েছে। হযরত উসমান রা. এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও এটা সমর্থন করেছেন। হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ জুহানি বলেন, আমাদের গোত্রের একটি লোক জুহানিয়্যাহ গোত্রের একটি নারীকে বিবাহ করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পরপরই নারীটি সন্তান প্রসব করলো। তার স্বামী হযরত উসমান রা. এর কাছে তার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলো। হযরত উসমান রা. ওই নারীকে নিয়ে আসার জন্য তার কাছে লোক পাঠালেন। সে খলিফার দরবারে আসার জন্য প্রস্তুত হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। নারীটি তখন তার বোনকে সান্তনা দিয়ে বললো, তুমি কাঁদছো কেনো? আল্লাহর কসম!

---

[৮৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৪৭৯)

[৯০] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৪৭৯)

আমি আমার স্বামী ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কারো সাথে মিলিত হইনি। আমি কখনো কোনো দুস্কর্ম করিনি। তাই তুমি অপেক্ষা করো এবং দেখো, আমার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা কি হয়? নারীটি হযরত উসমান রা. এর নিকট এলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রা. এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে দ্রুত খলিফার কাছে এসে বললেন, খলিফাতুল মুসলিমীন! আপনি এটা কী করতে যাচ্ছেন? হযরত উসমান রা. উত্তর দিলেন, এই মহিলা বিবাহের ছয় মাস পরই সন্তান প্রসব করেছে। বিবাহপূর্ব ব্যাভিচার ছাড়া এটা অসম্ভব। তাই আমি তাকে তার দুস্কর্মের কারণে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছি। হযরত আলী রা. বললেন, আপনি কি কুরআন পড়েননি। তিনি বলেন, হ্যাঁ পড়েছি। হযরত আলী রা. বললেন, আপনি কি কুরআনের وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশমাস) এই আয়াত এবং وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (মা তার সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে) এই আয়াত পড়েননি? প্রথম আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল ত্রিশ মাস। দ্বিতীয় আয়ত থেকে জানতে পারি, দুধ পান করানোর জন্য নির্ধারিত সময় পূর্ণ চব্বিশ মাস। সুতরাং গর্ভধারণের সময়কাল হিসেবে বাকি থাকে ছয় মাস। তাই গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। তার স্ত্রীও এই সময়ের পরই সন্তান প্রসব করেছে। তাহলে কিসের ওপর ভিত্তি করে তার ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে? এ কথা শোনার পর হযরত উসমান গনী রা. বললেন, আল্লাহর কসম! এই কথা পুরোপুরি সঠিক। দুঃখের বিষয় হলো, এটা আমার মাথায়ই আসে নি। উসমান গনী রা. ওই নারীকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত মুআ'ম্মার রহ. বলেন, আল্লাহর কসম! একটি কাক অন্য কাকের সাথে এবং একটি ডিম অন্য ডিমের সাথে এতো বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না, মহিলাটির সন্তান তার বাবার সাথে যতো বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছিলো। তার বাবাও তাকে দেখার পর বলেছিলো, আল্লাহর কসম! এই সন্তানের ব্যাপারে এখন আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। এরপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ওই নারীর স্বামী চেহারায় একটি আঘাত পায়। এই আঘাতটি তাকে যন্ত্রনা দিতে থাকে এবং অবশেষে এ কারণেই তার মৃত্যু ঘটে।[৯১]

---

[৯১] তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৭৬)

দানের ফযিলত

রসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পানীয় পান করাবেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খাবার খাওয়াবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোনো বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে পোশাক পরিধান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমের পোশাক পরিধান করাবেন।[৯২]

তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো

দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান একদিন জঙ্গলে সঙ্গীদের নিয়ে শিকারে বের হয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে একটি হরিণকে ধাওয়া করতে করতে তিনি সাথী-সঙ্গীদের থেকে দূরে চলে গেলেন। কয়েক মাইল পর্যন্ত তিনি হরিণের পেছনে ছুটলেন। শেষ পর্যন্ত হরিণটি একটি ঝাউ বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ছিলো কঠিন গরমের মৌসুম। দুপুরের গরম বাতাসে বাদশাহর শরীর ঝলসে যাচ্ছিলো। পিপাসায় ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিলো। বাদশাহর মনে হচ্ছিলো তার গলায় যেনো কাঁটা বিধে যাচ্ছে। তিনি ঘোড়া থামিয়ে শরীরের ঘাম মুছতে মুছতে ভাবলেন, এখন পানি খোঁজার জন্য কোথায় যাবো। তার ঘোড়াটিও রৌদ্রের গরমে হাঁপাচ্ছিলো। তিনি জঙ্গলের পথ ধরে কয়েক মাইল এগিয়েও কোনো জনবসতির দেখা পেলেন না। আরও বেশ খানিকটা পথ চলার পর তিনি দেখলেন, এক জায়গায় কয়েকটি পশু চরে বেড়াচ্ছে এবং কাছেই কোনো জায়গা থেকে খুব করুণ সুরে বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে। বাদশাহ সেদিকেই বাঁশির আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন, এক যুবক পুরনো, ফাটা ও ময়লা কাপড় পরিধান করে একটি গাছের নিচে বালুর ওপর বসে একমনে বাঁশি বাজাচ্ছে। দুনিয়ার আর কোনো দিকে তার খেয়াল নেই। বাদশাহ দীর্ঘক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই জঙ্গলের বাদশাহ কি এই নিংস্ব নওজোয়ান? যুবক একবার মাথা উঠিয়ে বাদশার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার বাঁশি বাজানোয় মগ্ন হয়ে গেলো। বাদশাহ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিয়া সাহেব! এখানে কি কোথাও পানি পাওয়া যাবে?

এবার ভালো করে শাহজাহানের শাহী পোষাক ও উন্নত ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে রাখাল একটু চমকে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, এখানে পানি কোথেকে আসবে? পানি তো গ্রামে পাওয়া যাবে। একটু সামনেই একটা

---

[৯২] মুসনাদে আহমাদের সূত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৫২৪)

গ্রাম আছে। সেখানে গেলেই পানির সন্ধান পেয়ে যাবেন।

রাখাল হাতের ইশারায় গ্রামে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলো। তারপর আবার সে বাঁশি বাজানোয় মগ্ন হয়ে গেলো। বাদশাহ যখন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। তখন যুবক তার ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থা লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি তৃষ্ণার্ত? বাদশাহ করুণ গলায় বললেন, হ্যাঁ ভাই! আমি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত। পিপাসায় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। রাখাল তার জায়গা থেকে উঠলো এবং গাছের গোড়ায় রেখে দেয়া তার ময়লা পানির পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললো, নিন পানি পান করুন।

শাহজাহান ব্যকুল হয়ে পানি পান করলেন। প্রচণ্ড পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো প্রায়। পানি তো আগে তিনি কতোই না পান করেছেন। কিন্তু সেদিন তার মনে হচ্ছিলো, পানির মত বড় নেয়ামত আর নেই। পানি পান করে বাদশাহ কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের দৃষ্টিতে রাখালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কোথায় থাকো? কয়েক মাইল দূরের গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে রাখাল বললো, আমি ওই গ্রামেই থাকি।

বাদশাহ শাহজাহান জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কখনো শহরে গিয়েছো?

রাখাল উত্তর দিলো, আপনি কি শহরে থাকেন? . . . দিল্লীতে একটা লাল কেল্লা আছে। সেখানে অনেক বড় একটি মসজিদ আছে। সেই মসজিদ আমাদের বাদশাহ নির্মাণ করেছেন। আপনি কি সেখানেই থাকেন? আমি একবার আমার বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম।

শাহজাহান তাকে পুরস্কৃত করার জন্য বললেন, তুমি কাল লাল কেল্লায় এসো। সে বললো, লাল কেল্লাতে? বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ! লাল কেল্লাতে। বাদশাহ তার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা দেখলেই তোমাকে লাল কেল্লাতে ঢুকতে দেবে। কেউ তোমাকে নিষেধ করবে না, বাঁধাও দেবে না।

রাখাল অবাক দৃষ্টিতে শাহজাহানের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি লাল কেল্লায় থাকেন? তাহলে তো আপনি আমাদের বাদশাহ শাহজাহানকে অবশ্যই দেখেছেন।

বাদশাহ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, আমিই শাহজাহান।

রাখাল বললো, আপনিই বাদশাহ! আমাদের বাদশাহ! বিস্ময়ের সঙ্গে রাখাল বাদশাহের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে, সে নিজের চোখে বাস্তবেই বাদশাহ শাহজাহানকে দেখছে, বাদশার সঙ্গে কথা বলছে। নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করছিলো। সেইসাথে ভয়ও পাচ্ছিলো।

কারণ বাদশাহকে সে যথাযথ সম্মান দেখায় নি। বাদশাহ কি শাহী মহলে গেলে তাকে শাস্তি দেবেন? সে কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো।

বাদশাহ নীরবতা ভঙ্গ করে আবার বললেন, তুমি আমার মহলে এসো। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

এরপর কয়েকদিন কেটে গেলো। শাহজাহান মনে মনে রাখালের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু রাখাল এলো না। শাহজাহানের ইচ্ছা ছিলো তার বিপদে সাহায্যকারী সেই রাখালকে তিনি অনেক অর্থ সম্পদ দান করে ধনী বানিয়ে দেবেন।

জুমার দিন বাদশাহ যখন জুমার নামায পড়ার জন্য জামে মসজিদে চলে গেলেন, তখন রাখাল গাছের ছাল পরে কেল্লার মুখে এসে হাজির হলো। তখন কেল্লার প্রহরীরা বাদশাহের হস্তাক্ষর দেখে সাথে সাথে দু'জন সিপাহীর সাথে তাকে জামে মসজিদে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

রাখাল ভয় পাচ্ছিলো। সে যখন জামে মসজিদে প্রবেশ করলো, তখন জুমার নামায শেষ হয়ে গিয়েছে। লোকজনও প্রায় সবাই চলে গেছে। অন্যরাও চলে যাচ্ছিলো। বাদশাহের কয়েকজন সভাসদ জামে মসজিদে ছিলেন। সিপাহীরা রাখালকে সভাসদদের কাছে দিয়ে ফিরে গেলো।

রাখাল জিজ্ঞাসা করলো, বাদশাহ কোথায়? সভাসদরা এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই যে মেহরাবের কাছে যে লোকটি বসে আছেন, তিনিই বাদশাহ। বাদশাহ তখন অনেক অনুনয় বিনয় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন। এ অবস্থা দেখে রাখাল বললো, না, না। ইনি নন। আমি তো বাদশাহ শাহজাহানের কথা জিজ্ঞাসা করছি। যিনি লাল কেল্লা বানিয়েছেন এবং লাল কেল্লাতে থাকেন।

সভাসদরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ভাই! ইনিই বাদশাহ শাহজাহান। কিন্তু রাখাল কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে ইনিই বাদশাহ। সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না যে, একজন বাদশাহ হয়ে তিনি দুই হাত পেতে কেঁদে কেটে ফকিরের মত কী প্রার্থনা করছেন এবং কার কাছে প্রার্থনা করছেন?

সে জিজ্ঞাসা করলো, বাদশাহ কী প্রার্থনা করছেন? আর কার কাছেই বা প্রার্থনা করছেন? তিনি তো বাদশাহ। লাল কেল্লার বাদশাহ। সভাসদরা উত্তর দিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছেন। আল্লাহর কাছে বাদশাহ ফকির সবাই প্রার্থনা করে। রাখাল এই কথা শুনে নীরব হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে হঠাৎ মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। সভাসদরা তাকে

বাঁধা দিতে চাইলেন। বাদশাহের সাথে দেখা না করেই এভাবে চলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে আটকানো গেলো না। সে তাদের প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিলো না।

বাদশাহ শাহজাহান দোয়া শেষ করলে খাদেম বাদশাহকে জানালো, তার সাথে দেখা করার জন্য এক রাখাল এসেছিলো। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় সে? লোকজন বললো, সে চলে গেলো। আমরা তাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেছে। বাদশাহ সাথে সাথে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে তার পেছনে পাঠান। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকগুলো রাখালকে নিয়ে ফিরে এলো। বাদশাহ খুব সম্মানের সাথে রাখালকে নিজের কাছে বসালেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য এসেছিলে। কিন্তু সাক্ষাত না করেই কেনো ফিরে যাচ্ছিলে? সত্যি করে বলো তো মূল বিষয়টা কি?

রাখাল বললো, আমি আপনার কাছ থেকে পুরস্কার নেয়ার জন্য এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এসে দেখলাম, আপনি নিজেই হাত পেতে কেঁদে কেঁদে আরেকজনের কাছে চাচ্ছেন। যখন আপনি নিজেই অন্যের কাছে চান, তাহলে আপনি আমাকে আর কী দেবেন? আমি ভাবলাম, আপনি যার কাছে চাইছেন আমিও কি তার কাছেই চাইতে পারি না? আমি তার কাছেই চাইবো।

এই ঘটনা সত্যি কি না তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যদি ঘটনাটি কাল্পনিকও হয়, তবুও রাখালের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয়েছে, তা পুরোপুরি সত্য ও বাস্তব। কথাগুলো যে যতো বেশি ভাববে, তার ঈমান ততো বেড়ে যাবে।

এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল? যাকে কারো কাছেই কোনো কিছুর জন্য মুখাপেক্ষী হতে হয় না? কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো মানুষের প্রয়োজন পূরণ না হলে সে পেরেশান হয়ে যায়। সে পেরেশানী দূর করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং চতুর্দিকে এমন কাউকে খুঁজতে থাকে, যার কাছে সে নিজের পেরেশানীর কথা বর্ণনা করবে। যার কাছে নিজের অভাবের বিবরণ দিয়ে সে কিছু সাহায্য চাইবে। অথচ আল্লাহর কাছে চাওয়ার কথা তার মনে পড়ে না।

সমস্যা ও প্রয়োজন সবার থাকে। একজন নিঃস্ব ফকিরের যেমন সমস্যা আছে, স্বচ্ছল ও সুন্দর জীবন-যাপনকারী একজন বাদশাহরও নানান সমস্যা আছে। কারো শরীর ঢাকার কাপড় নেই। কারো নিজের পরিবারের খরচের টাকা নেই। কেউ সন্তানকে টাকার অভাবে বিবাহ দিতে পারছে না। কারো ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারছে না। কেউ সুস্থতা লাভের জন্য অন্যের দারস্থ হয়। কারো চাকরির প্রয়োজন হয়।

মোটকথা, দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাদের প্রয়োজন অসংখ্য ও অগণিত। যা গুনে শেষ করা অসম্ভব। অন্যের কথা না হয় বাদ-ই দিলাম, নিজের কথা একটু ভাবুন . . . আমাদের দৈনন্দিন কত জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয়, কত কিছুর মুখাপেক্ষী হতে হয়, যে কারণে আমরা সবসময় পেরেশানীতে থাকি।

আমরা অনেক ধনী এবং অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে পারবো যদি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমাদের প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহই পূরণ করতে পারেন। তাহলে আমরা কখনো তাকে ছেড়ে অন্যের সামনে হাত পাতবো না। অন্যের কাছে কিছু চাইবো না। অন্যের সামনে মাথা নত করবো না।

এটা তো একটা ঘটনামাত্র। কিন্তু ভালোভাবে জেনে রাখুন, দাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। তিনি যদি কাউকে না দিতে চান, তাহলে সারা পৃথিবীর সব মানুষ মিলেও তাকে একটি কানা কড়িও দিতে পারবে না। আর তিনি যদি কাউকে দিতে চান আর গোটা দুনিয়ার সবাই মিলেও তার এই দানকে বাঁধা দিতে চায়, এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

বান্দার কাছ থেকে আমাদের নেয়ার মত কিছুই নেই। আর তার কাছে কোনো কিছু অভাব নেই। তিনি সবাইকে দেয়ার জন্যই বসে আছেন। সবাই তার মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র অমুখাপেক্ষী। যাকে যা খুশি দিয়ে থাকেন। তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কাউকে কোনো কিছু দেয়ার জন্য তাকে কারো কাছে সুপারিশও করতে হয় না। সবাইকে তার দ্বারস্থ হতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যে যত বড় হয় তার চাহিদাও ততো বেশি হয়। লাল কেল্লার বাদশাহও ওই দরবারের ফকির এবং জঙ্গলের রাখালও ওই দরবারের মুখাপেক্ষী। তাই ভাবুন এটা আমাদের কত বড় মূর্খতা ও বোকামী যে আমরা আমাদের মতই দরিদ্র ও ফকীর বান্দার সামনে আমাদের অভাব অভিযোগ পেশ করি। সেই সব বন্ধুদের নিকট সাহায্য চাই যারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

আসুন আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা কখনোই আমাদের অভাব অভিযোগ কোনো মানুষের সামনে পেশ করবো না। প্রয়োজন ছোট হোক বড় হোক, দীনি হোক দুনিয়াবী হোক, আমাদের রবের কাছে আমরা আমাদের প্রয়োজনের কথা জানাবো, শুধু তার কাছেই প্রার্থনা করবো। আল্লাহ তাআলা কখনো আমাদেরকে নিরাশ করবেন না। পৃথিবীতে যে যা কিছু পেয়েছে একমাত্র তার কাছ থেকেই পেয়েছে। তিনি ছাড়া আর কোনো দাতা নেই। আমাদের যার যা কিছু প্রয়োজন, তার কাছ থেকেই চেয়ে নেয়া উচিত। সব পেরেশানী তার দরবারেই পেশ করা উচিত। আমাদের সব কষ্ট ও মসিবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তার কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। কিছু পাওয়া গেলে তার

দরবার থেকেই পাওয়া যাবে। তিনিই হারুনুর রশীদকে বিরাট রাজত্ব দান করেছেন আর শাহ বাহলুলকে সামান্য রুটি পর্যন্ত দেন নি। কার ভাগ্যে কী ঘটবে, কে কী পাবে, এটা একমাত্র তারই সিদ্ধান্ত। তবে যে যা কিছু পাবে একমাত্র তার দরবার থেকেই পাবে। তার ইচ্ছা ছাড়া কেউ এক ঢোক পানিও পান করতে পারবে না। তাই তার কাছে প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তার ধনভাণ্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই।

আমরা যখনই কোনো পেরেশানীতে পড়বো আমরা আমাদের রবের কাছেই চাইবো। তার সামনেই নিজের অভিযোগ পেশ করবো। আর মনে মনে এই বিশ্বাস রাখবো যে, তিনি কখনো আমাদের নিরাশ করবেন না। কখনো শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে নেয়ার পদ্ধতি ও আদব শেখাতে গিয়ে আল্লাহর রসূল সা. উম্মতকে সালাতুল হাজত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ দুই রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলা। রসূল সা. আরও শিখিয়েছেন, তোমরা দোয়ার সময় বলো,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

পরম সহনশীল ও অতি দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি পবিত্র; আরশে আযীমের মালিক। তার জন্যই সব প্রশংসা যিনি সমগ্র বিশ্বের রব। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার অবধারিত রহমত, আপনার অফুরন্ত মাগফিরাত, প্রত্যেক নেককাজের গনীমত এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আরো প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করুন। আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর করুন। আমার সেসব প্রয়োজন পূরণ করে দিন যেগুলোর ওপর আপনি সন্তুষ্ট। হে সর্বাধিক রহমকারী!

দাওয়াতের কাজকে নিজের কাজ বানাও

আমরা হয়তো নিয়মিত নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাতও গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করি, সামর্থ থাকলে হজেও যাই, আমাদের পোশাকও ইসলামী ভাবধারার সাথে মেলে, হালাল হারামের পার্থক্যের ক্ষেত্রেও আমরা যত্নবান, তাকওয়া ও তাহারাতের দিকেও লক্ষ রাখি, নফল নামায, যিকির-আযকার এবং দান-সদকাও অধিক পরিমাণে করে থাকি, তাই আমরা নিজেদেরকে সাচ্চা মুসলমান মনে করি।

আল্লাহর শোকর যে, এই মুসলমান মনে করার ক্ষেত্রে আমি বা আপনি একা নই, আমাদের মতো শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনুসরণকারী উম্মত হাজারো নয়; বরং লক্ষ লক্ষ রয়েছে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অনেক দুরবস্থায় থাকার পরও মুসলমানরা ধর্মের অনুসরণ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে এগিয়ে আছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এখনও এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন, যাদের খোদাভীতি ও তাকওয়ার তুলনা নেই। যাদের পুরোটা জীবন আয়নার মতো স্বচ্ছ। পুরো জীবনে যারা সন্দেহজনক একটা কাজও করেন নি। বাস্তবতা হলো, আজকের পৃথিবীর কোনো ধর্মই তাদের সাথে তুলনা করার মতো নীতিবান, সৎ ও ধার্মিক মানুষ পেশ করতে পারবে না।

মুসলমান সংখ্যার দিক থেকেও পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি। তারা দরিদ্র নয়। তাদের কাছে আছে কয়লা, পেট্রোল, লোহা এবং স্বর্ণ। পৃথিবীর অনেকগুলো রাষ্ট্র তাদের হাতে।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, এতো কিছুর পরও মুসলমানরা বর্তমানে সবচেয়ে বেশী অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত জাতি। ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের অনেকেই এমন আছেন, যাদের নিয়ে মানুষ গর্ব করে; কিন্তু জাতিগতভাবে দুনিয়াতে তাদের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, ক্ষমতা নেই, দাপটও নেই।

আমরা এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা কি কখনো এই পেরেশানি অনুভব করেছি যে, মুসলিম উম্মাহকে এই লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। মুসালমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে।

কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি, এই অসম্মান ও অপদস্থ অবস্থার কারণ কী? একমাত্র কারণ তো এটাই যে, মুসলিম উম্মত ওই গুরু দায়িত্ব ভুলে গিয়েছে, যে জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম জাতি অন্য সাধারণ জাতির মতো কোনো সাধারণ জাতি নয়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। নবী রসূলদেরকে তাদের নিজেদের যুগে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, মুসলিম জাতিকেও আল্লাহ সেই দায়িত্ব দিয়েছেন। নবুওয়্যতের ধারাবাহিকতার

সমাপ্তি ঘটেছে আমাদের নবী সা.-এর আগমণের মধ্য দিয়ে। তার পর আর কোনো নতুন নবী আসবে না। আল্লাহর দীন আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব এখন এই উম্মতের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তাদেরকেই এটা আঞ্জাম দিতে হবে। এটাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আর এই দায়িত্ব আদায়ের সাথেই তাদের ভাগ্যের চাকা ঝুলে আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবেন।[৯৩]

'খায়র' অর্থ এমন সব কাজ, যেগুলোকে মানুষ সৎকর্ম হিসেবে গণ্য করে। এখানে 'আলখায়র' বলে সমস্ত নেক কাজের সমষ্টি অর্থাৎ দীন বোঝানো উদ্দেশ্য। যে দীন সব যুগে আল্লাহর নবী রসূলগণ তার বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মুসলিম জাতির দায়িত্ব হলো, তারা আল্লাহর সব বান্দাদের কাছে এই দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেবে। আল্লাহর বান্দাদের অনাচার ও বিপথগামীতা সম্পর্কে তাদের অন্তরে দুঃখবোধ থাকবে যেমন দুঃখবোধ নবীদের অন্তরে ছিলো।

এই উম্মতের জন্য দাওয়াত হলো তার হৃৎপিণ্ডের মতো। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য হৃৎপিণ্ড যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, এই উম্মতের জন্য দাওয়াতের গুরুত্ব তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মানুষের শরীরে ততোক্ষণই জীবন থাকে, যতক্ষণ তার ভেতরে সদা কম্পমান হৃৎপিণ্ড থাকে। এই কম্পন বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের শরীর মাটির স্তুপে পরিণত হয়। তাই মানুষের শরীরকে সুস্থ ও জীবিত রাখতে হলে তার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ ও জীবিত রাখা জরুরি।

ঠিক দীনের দাওয়াতের গুরুত্বও এরকমই। যদি এই উম্মত মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে এই কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী উম্মতের মধ্যে নেককারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং বদকারের সংখ্যা কমবে। চারদিকে নেক কাজের জোয়ার বয়ে যাবে আর বদ কাজের সংখ্যা কমতে থাকবে। উম্মত যিন্দা হবে। তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইজ্জত, সম্মান এবং প্রভাব প্রতিপত্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু উম্মত যদি এই দায়িত্বের ব্যাপারে অসচেতন হয়, দীনের দাওয়াতের গুরুত্বের উপলব্ধিই যদি তার ভেতরে না থাকে, তাহলে সে বেঁচে থেকেও মৃত। তার জীবনটাই বৃথা। আর কোনো মৃত জাতি ইজ্জত ও সম্মান লাভ করতে পারে না।

যখন আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবো, তখন

---

[৯৩] সুরা আলে ইমরান (আয়াত: ১০৪)

আল্লাহর কাছেও আমরা পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবো । আর যদি আমাদের দায়িত্ব ভুলে যাই এবং এই দায়িত্বের অনুভূতিই আমাদের ভেতরে না থাকে, তাহলে নিশ্চই আল্লাহ তাআলা আমাদের আনুগত্য ও ইবাদত থেকে অমুখাপেক্ষী।

এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত

আমাদের হাতের মূল্যবান ঘড়ি নিশ্চই আমাদের কাছে একটি বড় নেয়ামত। আমরা সঠিক সময় জানার জন্য এটা হাতে দেই। যেনো আমরা আমাদের সময় পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি এবং প্রত্যেকটি কাজ সঠিক সময়ে করতে পারি। যদি এই ঘড়ি তার কাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয় তাহলে আমরা এটা পরিধান করি। খুব গুরুত্বের সাথে এটাকে হেফাযত করি। এর ওপর পানির ফোটা পড়লে, বা ঘড়ির ওপরের কাঁচে কোনো কিছু লেগে দাগ বসে গেলেও আমাদের খারাপ লাগে।

ঘড়ির প্রতি আমাদের এই যত্ন ও ভালোবাসা ততো দিনই থাকবে, যতো দিন ঘড়ি সঠিক সময় বলবে। যদি ঘড়িটি মাঝে মাঝে বন্ধ হতে শুরু করে, কখনো আধা ঘণ্টা বেড়ে যায়, কখনো এক ঘণ্টা কমে যায়, আমরা বারবার এর দ্বারা প্রতারিত হই, তখন কি আপনি ঘড়িটিকে আগের মতো যত্ন করে পরিধান করবেন? বরং নিশ্চিতভাবেই আপনার মনে হবে, এটা তো এখন শুধু পিতলের কয়েকটি টুকরো। এর জায়গা মানুষের হাত নয় বরং পুরনো আসবাব পত্রের দোকান। ঘড়িটিকে পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে বেচে দিতে আমরা একটা বারের জন্যও ভাববো না, দোকানদার এটাকে কোথায় নিক্ষেপ করছে? কত নির্দয়ভাবে এটাকে ভেঙ্গে ফেলছে। দোকানদার যেখানে খুশি সেখানে ফেলুক, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ভেঙ্গে ফেলুক অথবা কোনো চুলোয় চড়িয়ে এটাকে গলিয়ে ফেলুক, আমাদের আর কিছু যায় আসে না। আমাদের কাছে এর গুরুত্ব ততো দিনই ছিলো যতো দিন এটা সঠিক সময় বলে দিতো। সময় বলার জন্যই একটি কোম্পানি এটা বানিয়েছিলো আর আমরাও অনেক দাম দিয়ে ক্রয় করেছিলাম।

আল্লাহ তাআলাও মুসলিম উম্মাহকে অন্যদের কাছে আল্লাহর দীন পৌছে দেওয়ার জন্য, সমাজে নেককাজের প্রচার ও অসৎ কাজে বাঁধা দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যতো দিন তারা নিজেদের এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকবে, ততো দিন তারা আল্লাহর সাহায্যও লাভ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্মানিত করে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করবেন। আর যদি এই জাতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে গাফলতি করে তাহলে না তাদের সংখ্যার আধিক্য তাদের কোনো কাজে আসবে, না অঢেল ধন-সম্পদ তাদের কোনো

উপকার করতে পারবে। শুধু নিজের নামায রোযা ও অধিক যিকির-আযকার তাদেরকে হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে না, আল্লাহর ক্রোধ থেকেও রক্ষা করতে পারবে না।

পৃথিবীতে নৈরাজ্য, অরাজকতা যদি চলতেই থাকে, আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে ভুলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকে, আর আমরা তাদেরকে সঠিক পথে আনার ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে শুধু নিজেদের আমল নিয়েই ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি অত্যাসন্ন। তার শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেছেন,

أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَم أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدُكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ : "فَقَالَ : اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আ.-কে নির্দেশ দিলেন, অমুক অমুক শহরকে তাদের অধিবাসীসহ উল্টে দাও অর্থাৎ ধ্বংস করে দাও। জিবরাইল আ. বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে তো তোমার এমন একজন বান্দা রয়েছেন, যে কখনো এক পলকের জন্যও তোমার অবাধ্যতা করেনি। পরওয়ারদেগার বললেন, হ্যাঁ জিবরাইল, তাকে এবং অন্যদেরকে সহ শহরটি উল্টিয়ে দাও। আমার নাফরমানি দেখে তার চেহারা কখনো মলিন হয় নি।

এই হাদীস যদি আমাদের মধ্যে সামান্যতম অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এই অস্থিরতাকে গুরুত্ব দিন। আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিত তিনি যেনো এই অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে দেন। আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখনই সাড়া দেয়ার সময়। এখনই সাড়া দিতে হবে। এই অস্থিরতাই আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

سکوں مجھ کو نہیں در کار آقا
بڑھا دیجئے میری بے تابئ دل

হে মালিক! আমার শান্তির প্রয়োজন নেই
তুমি আমার অন্তরের অস্থিরতা বাড়িয়ে দাও।

দাওয়াতের কাজে আল্লাহর নবীর দোয়া

সব মুমিনই নবী করীম সা.-এর মাকবুল দোয়া পেতে চায়। নবী সা.-এর দোয়া পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা বুকে পোষন করে না এমন কোনো মুমিন বান্দা পৃথিবীতে নেই। ভাবুন নবী সা. যদি কারো সুখ শান্তির জন্য দোয়া করেন, সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান! আল্লাহর রসূল সা.-এর দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহ তাআলা তার হাবীব সা.-এর দরখাস্ত কখনোই ফিরিয়ে দেবেন না।

যে ব্যক্তি নবী সা.-এর দোয়া লাভ করবে, সে দুনিয়াতে যেমন সুখে শান্তি তে বসবাস করবে, হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে তখনও সে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করবে। একটু ভাবুন, যে বান্দা সৌভাগ্যবান হবে সে হাশরের ময়দানে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে এবং সে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।[৯৪]

যেদিন অনেকেই হবে হতভাগ্য। যাদের চেহারা চূড়ান্ত ব্যর্থতার আক্ষেপে মলিন হয়ে যাবে। গুনাহের তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। ফলে তাদের চেহারা হবে কুৎসিৎ, বিবর্ণ ও বিপর্যস্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

কোনো কোনো মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ, আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে।[৯৫]

মনে মনে একটু ভাবুন, আপনার অন্তরে কি কখনো এই অস্থিরতা এসেছে যে, আপনিও রসূল সা.-এর এই দোয়া পাবেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এই বান্দাকে সুখে শান্তিতে রাখো!' এবং আপনিও উজ্জ্বল চেহারার সঙ্গে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবেন। তার দীদার লাভ করে নিজের চোখ আলোকিত করবেন!

রসূল সা. এই দোয়া কাদের জন্য করেছেন তা জানার জন্য আপনার নিশ্চই উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। রসূল সা. এই দোয়া সেসব লোকদের জন্য করেছেন, যারা রসূলের বাণী শুনে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে। রসূল সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ ওই বান্দাকে সুখ শান্তি এবং আনন্দিত অবস্থায় রাখুন, যে আমার বাণী আমার থেকে শুনেছে এবং

---

[৯৪] সূরা কিয়ামা (২২, ২৩)
[৯৫] সুরা কিয়ামা (২৪, ২৫)

তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

এটা ঠিক যে, আপনারা নবী সা.-এর বাণী নবীজির মুখ থেকে শোনেন নি। কিন্তু তার বাণী অন্যের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ তো আপনাদের হাতে সব সময়ই রয়েছে। নবীজির দোয়া পেতে আগ্রহের সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করুন। যদি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আপনারা নিয়োজিত থাকেন এবং খুব সুন্দরভাবে এই কাজ করতে থাকেন, তাহলে নবীজির দোয়ার বরকতে আপনাদের জীবন সুন্দর ও আনন্দময় হবে। তাই দাওয়াত ও তাবলীগই হোক আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য। এটাই দিন রাত্রির সফলতার মাধ্যম।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্য আরও অনেক প্রতিদান ও সওয়াবের ঘোষণা এসেছে। হতে পারে আপনারা যাদের কাছে আল্লাহর রসূল সা.-এর বাণী পৌঁছাবেন, তারা আপনাদের তুলনায় ওই বাণীর বেশী হেফাযত করবে। তার মর্ম আপনাদের চেয়ে বেশি অনুধাবন করতে পারবে। তার হকও আপনাদের চেয়ে বেশী করবে। হতে পারে তারা অন্যের কাছে এই বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য আপনাদের চেয়ে বেশী মেহনত ও পরিশ্রম করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ ও দয়া যে, যেহেতু তাদের পর্যন্ত দীনের বাণী পৌঁছানোর মাধ্যম হবেন আপনারাই, তাই আপনাদের মাধ্যমে যত মানুষের কাছে দীনের বাণী পৌঁছবে, তাদের সবার প্রতিদান ও সওয়াবের সমান প্রতিদান ও সওয়াব আপনারাও লাভ করবেন। আর তাদের সওয়াবও কমবে না।

তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, নবী সা.-এর দোয়া লাভ করতে পারবে তারাই যারা যথাযথভাবে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেবে। নবী সা. থেকে শ্রবণকারীরা যেভাবে শুনেছে, যেভাবে বুঝেছে এবং যেভাবে নিজেদের পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছে, যারা ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে ওই দাওয়াত পৌঁছাবে, তাদের দায়িত্ব পালনই 'যথাযথ' হিসেবে গণ্য হবে। নবীজির কথার মধ্যে না কোনো অংশ কমানোর অনুমতি আছে, না বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। আমরা যদি নবীজির দোয়া পাওয়ার আকাঙ্খা ও আশা নিয়ে দাওয়াতের কাজ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা নবীজির দোয়া লাভ করতে পারবো। আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারবো।। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে উজ্জ্বল চেহারায় উপস্থিত হতে পারবো। তাই আমাদের না কোনো ভৎসনাকারীর ভৎসনাকে পরোয়া করা উচিত, না কোনো লোভ করা উচিত, না কোনো অপশক্তিকে ভয় করা উচিত আর না কোনো পরীক্ষার সম্মুখিন হওয়ার কারণে নিরাশ হওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ দাওয়াতের পথে সব বিপদাপদই আমরা সাহসীকতার সাথে মোকাবিলা করবো। আল্লাহর দীন অবিকৃত ও যথাযথভাবে আল্লাহর

বান্দাদের কাছে পৌঁছাবো। এই আশা নিয়ে এসব কাজ করবো যে, নবী সা.-এর দোয়া অবশ্যই আমাদের ব্যাপারে কবুল হবে। তার দোয়ার বরকতে পৃথিবীতেও আমরা সফলতা লাভ করতে পারবো, হাশরের ময়দানেও আমাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। নবী করীম সা. বলেছেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهَا مِنْ سَامِعٍ.

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে সুখে শান্তিতে রাখুন যে আমার থেকে কিছু শোনার পর তা যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। নিশ্চই যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছানো হবে তাদের অনেকে আমার কাছে যারা সরাসরি শুনেছে তাদের চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী হবে।

এক ইংরেজের ইসলাম গ্রহণ

একবার মুম্বাইয়ের একজন স্বচ্ছল মুসলমান তার এলাকার কয়েকজন পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তার বাসায় দাওয়াত করলেন। তাদের মধ্যে এক ইংরেজ খ্রিষ্টানও ছিলেন। দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকারের খাবার দাবার রাখা হলো। বড় পাত্রে পোলাও রাখা হলো। ইংরেজ ভদ্রলোক খুব আগ্রহের সাথে পোলাও খেলেন। খাওয়া শেষে সবাই যখন বিভিন্ন বিষয়ে কথা বার্তা বলছিলো, তখন ওই ইংরেজ বাড়ির মালিককে বললো, আমাকে কালিমায়ে তাওহীদ পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিন।

বাড়ির মালিক খুশি হলেন। পাশাপাশি বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এই সাধারণ দাওয়াতের মধ্যে কোন জিনিসটি ইংরেজের অন্তর এতোটা বদলে দিলো! তিনি ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী কারণে আপনি হঠাৎ ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন?

ইংরেজ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আপনার বাড়ির পোলাও আমাকে মুসলমান হতে উৎসাহিত করেছে। পোলাও খাওয়ার সময় আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, যেই জাতি খাবারের ক্ষেত্রে এত উন্নত রুচিবোধের অধিকারী হতে পারে, ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের রুচি কত উন্নত হবে? তাই আমার অন্তর ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

উপস্থিত মেহমানরা আনন্দের আতিশয্যে সুবাহানাল্লাহ পড়লেন। বাড়ির মালিক বলে উঠলেন, পোলাও যিন্দাবাদ!

ইংরেজ উত্তর দিলেন, বরং ইসলাম যিন্দাবাদ!

আল্লাহর রসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই কালিমা পড়বে সে জান্নাতে যাবে। তিনি আরও বলেন, সৎ কাজ ও কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী ওই সব ব্যক্তিদের সমান প্রতিদান পাবে যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই সৎকর্ম করতে থাকবে। কালিমা পাঠকারী যদি জান্নাতে যায়, তাহলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এই আশা করা যায় যে, যার কারণে কালিমা পাঠ করেছে তাকেও জান্নাত দান করা হবে।

এক দরিদ্র ধোপীর বরকতে ধনী নারীর ইসলাম গ্রহণ

এক অমুসলিম অনেক উঁচু পদে চাকুরী করতেন। ঘরে সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের অভাব ছিলো না। সমাজের সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে ছিলো তার ওঠাবসা। সবাই তাকে সম্মান করতো। একদিন তিনি ঘরে এলে তার স্ত্রী বললেন, আমি কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেছি। আপনিও কালিমা পড়ে নিন এবং আপনার রবের আনুগত্য স্বীকার করুন। তিনি দীর্ঘক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এই পরিবর্তনের কারণ কি?স্ত্রী বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার সব নেয়ামতই দান করেছেন। না অলংকারের অভাব আছে, না দামী পোষাক কম আছে। যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তারাও স্বচ্ছল ও সম্পদশালী। যে অনুষ্ঠানেই যাই, দেখি লোকজন হাসা-হাসি করছে, সবার গায়ে রঙ বেরঙয়ের পোষাক, স্বর্ণ-গহনায় তাদের শরীর প্রায় পুরোটা ঢেকে আছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পুরনো ও ছেড়া কাপড় পরে এক ধোপীর মনে যতোটা শান্তি দেখলাম, আমরা কেউ এতোটা শান্তিতে নেই। আমি তার কাছে তার দুর্দশা ও দুরবস্থার কথা জানতে চাইলে সে মুচকি হেসে উত্তর দিলো, আল্লাহ মালিক। সব প্রশংসা তার। তিনি অনেক মেহেরবান। তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করা যাবে না। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ সবারই মালিক।

তার কথা শুনে আমার মনে হলো, এই দুর্দশাগ্রস্থ ধোপীর মনে যে সুখ ও শান্তি রয়েছে, পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও তার মতো সুখ শান্তি আমার অন্তরে নেই।টা অবশ্যই তার দীনের বরকত। তার ধর্ম বাস্তবেই আল্লাহর সত্য ধর্ম। তাই আমি কালেমা পড়ে আমার প্রকৃত রবের ওপর ঈমান এনেছি। আপনিও কালিমা পাঠ করে তার ওপর ঈমান আনুন।

দেখুন কীভাবে একজন পুরনো নোংরা পোষাক পরিধানকারী ধোপীর কারণে একজন বৃত্তবান নারী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো। ইসলাম আল্লাহর ধর্ম। ইসলামের রয়েছে দুর্দমনীয় আকর্ষণ। একটু চেষ্টা করলেই বিধর্মীরা ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভাবুন আপনি কীভাবে ইসলামের

প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করবেন? কীভাবে নিজের মাধ্যমে অন্যকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন?

রসূল সা. কে স্বপ্নে দেখার একটি পরীক্ষিত আমল

একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গীরি রহ. হযরত ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহ.-কে বললেন, এমন কোনো বিশেষ দুরূদ শরীফের আমল বলে দিন যে আমল করলে রসূল সা.-এর যিয়ারত নসীব হবে।

হযরত বললেন, কোনো বিশেষ দুরুদের কথা তো আমার জানা নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, যে কোনো দুরূদ শরীফ যদি সত্যিকার মহব্বত নিয়ে পড়া যায় তাহলেই রসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। সবচে বেশী প্রয়োজন হলো অন্তরের সত্যিকারের মহব্বত ও একনিষ্ঠতার। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পর বললেন, হযরত সায়্যিদ হাসান রহ. নিম্নের দুরূদটি পড়ার কথা বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعِتْرَتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে থাকা সব জিনিসের সংখ্যার সমপরিমাণ রহমত নাযিল করুন মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর এবং তার পরিবার পরিজনের ওপর ।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

ভারতের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর একজন যোগ্য শাগরেদ হযরত মাওলানা আহমদ আলী রহ.। হাদীস শাস্ত্রে মাওলানা আহমদ আলী রহ.-এর ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি খুব সুদর্শন ছিলেন না। সুস্বাস্থের অধিকারীও ছিলেন না। তার দেহ ছিলো ক্ষীণকায়, খাটো, কালো এবং খুব দুর্বল।

একদিন তিনি দরসে বসে তার এক বিস্ময়কর ঘটনা শোনান। ঘটনাটি আমাকে এতোটাই আলোড়িত করেছিলো যে, আজও খুব ভালোভাবে মনে আছে। মাওলানা বলেছিলেন, আমি আযমঘরে থাকতাম। আছরের নামায সাধারণত শহরের জামে মসজিদে আদায় করতাম। নামায শেষে বের হওয়ার সময় প্রতিদিনই মসজিদের সিড়িতে এক তরুণের সাথে দেখা হতো। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাকে দেখার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং খুব ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকে দেখতাম। তরুণ ছেলেটি ছিলো আল্লাহর কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। লম্বা ও সুগঠিত দেহাবয়ব। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। চেহারাও ছিলো খুব সুন্দর। মোটকথা আল্লাহ তাআলা তাকে সৌন্দর্যের

সবকিছুই দান করেছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে খুব ছোট ও তুচ্ছ মনে হতো। প্রতিদিন তাকে দেখে এবং নিজেকে তার সাথে তুলনা করে খুব বিমর্ষ ও ব্যথিত হয়ে বাড়ির দিকে যেতাম। রাস্তায় যাওয়ার সময় বিভিন্ন ধরণের চিন্তা মাথায় আসতো। মনে হতো আমার অন্তর অসুন্দর দেহাবয়বের জন্য আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আমি অনেক চেষ্টা করে মন থেকে এসব চিন্তা-ভাবনা দূরে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তাকে দেখার সাথে সাথেই এসব চিন্তা-ভাবনা আবার আমার মনকে বিষন্য করে তুলতো।

প্রায় একযুগ পর্যন্ত এভাবেই চললো। আমি মসজিদ থেকে বের হতাম। তরুণ দাঁড়িয়ে থাকতো। আমিও আগ্রহের সাথে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার ব্যক্তিত্বও ছিলো বড়ই মনকাড়া। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তরুণটি কখনোই পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় নি। আমাকে ভালোভাবে লক্ষ্যও করে নি। মনে হতো সে কোনো চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। কখনো এমনভাবে চার দিকে তাকাতো যেনো কাউকে খুঁজছে। কখনো মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যেনো কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছে। কখনো কোনো দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতো। তাকে দেখলে মনে হতো সে গমনাগমনকারীদের প্রতি লক্ষই করছে না। নিজের ভাবনাতেই ডুবে আছে।

দীর্ঘ দিন পর একদিন আমি যখন মসজিদ থেকে বাইরে বের হচ্ছিলাম, সে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার মনের ভেতরটা কাঁপছিলো। সে আমার কাছে আসার পর আমার হীনমন্যতা আরো বেড়ে গেলো। নিজের কাছে নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। তরুণ কোনো ভূমিকা ছাড়াই অনেক অনুনয় করে বললো, মাওলানা সাহেব! আপনি আমার ওপর একটু মেহেরবাণী করুন। আমাকে কোনো দোয়া বলে দিন অথবা কোনো তাবীজ দিন। হয়তো এর উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমার ওপর দয়া করবেন।'

আমি হতবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। আমার মন বললো, তরুণ খুবই দুর্দশায় আছে। আমি তার সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! আপনি কী সমস্যার কারণে দোয়া চাচ্ছেন? তাবিজের কথা বলছেন?

তরুণ উত্তর দিলো, মাওলানা সাহেব! আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে ব্যথা। না আমি বসতে পারি। আর না কোনো কাজকর্ম করতে পারি। অনেক বছর যাবত চিকিৎসা করাচ্ছি। অনেক ডাক্তার ও হাকীমকে দেখিয়েছি; কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। কোনো উপকার পাচ্ছি না। দিনদিন আমার অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। বাড়িতে মন বসে না। অশান্তি অনুভব হয়। তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। হুজুর! আমি বুঝতে পারছি না, আমি কী করবো? আমি কি

আমার জীবন শেষ করে দেবো? নাকি অন্য কিছু করবো। আমার কোনো কিছুই ভালো লাগে না। আমার জীবনে কোনো শান্তি নেই। বলতে বলতে তরুণ ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়লো। কান্নার দমকে সে কথা বলতে পারছিলো না।

আমি বিস্মিত হয়ে তার সব কথা শুনছিলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তাকে কোনো উত্তর না দিয়েই সেখান থেকে এতো দ্রুত পালাতে লাগলাম যেনো আমি বড় কোনো অপরাধ করে ফেলেছি। আমি খুব দ্রুত হাঁটছিলাম। অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমার মুখ থেকে আল্লাহর শোকরের কালিমা বের হচ্ছিলো। নিজের ছোটখাটো শরীরটাকেই আমার কাছে খুব মূল্যবান মনে হচ্ছিলো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আমি এমন স্বাদ পাচ্ছিলাম যা আমি এর আগে কখনো পাইনি।

এই ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সবাইকে সবকিছু দান করেন নি। নিজেদের দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতার কারণে আমাদের ভেতরও আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ ও নালিশ করার চিন্তা জন্মাতে পারে। অন্যকে নিজের চাইতে ভালো দেখে নিজের ভেতরে দুঃখ অনুভূত হতে পারে। সব অবস্থায় আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তার মূল্য বোঝার চেষ্টা করা উচিত। শুকরিয়া আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্ত

আল্লাহ তাআলা নিজের অগাধ জ্ঞান ও হেকমতের মাধ্যমে দুনিয়াতে তার নেয়ামত বণ্টন করেছেন। কাউকে শারীরের গঠনগত দিক থেকে করেছেন সবল আর মেধাশক্তির ক্ষেত্রে করেছেন দুর্বল। কাউকে ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। কাউকে শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ বানিয়েছেন; কিন্তু তাকে প্রখর মেধা এবং গবেষণামূলক কাজ করার যোগ্যতা দান করেছেন। কাউকে জীবনোপকরণের দিক থেকে করেছেন সুখী; কিন্তু পরিবার পরিজনের দিক থেকে করেছেন দুঃখী। কাউকে হত দরিদ্র ও নিঃস্ব বানিয়েছেন কিন্তু অন্তরে এতো প্রশান্তি দান করেছেন যা বড় বড় সম্পদশালীর ভাগ্যেও জোটে না। কাউকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন কিন্তু এতো অভাব দিয়েছেন যে দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও ঠিক মতো তার ভাগ্যে জোটে না। আবার কাউকে কারো সামনে কথা বলার যোগ্যতা দান করেন নি বটে; কিন্তু তাকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এগুলো সবই আল্লাহর হেকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

অন্ধ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

অন্ধ ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে অনেক বড় নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এটাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবাণী যে, তিনি তাদেরকে অনেক গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যে সব গুনাহ শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করতে পারে। আল্লাহ তাআলা অনেক অন্ধ ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহে কুরনআন হিফজ করার তাওফীক দান করেন। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দান করেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, এটা তাদের প্রতি আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। তারা যদিও দেখতে পান না; কিন্তু এমন অনেক নেয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেছেন যা অনেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেন নি।

পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্থদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তাআলা অনেককে জন্মগতভাবেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত বানিয়েছেন। অনেকে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পা হারিয়ে ফেলেছে। যেভাবেই হোক না কেনো, বাস্তবেই এটা খুব কষ্টের বিষয়। মানুষকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখে, দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতে দেখে তাদের কষ্ট হয়। কিন্তু এটা কি বাস্তবতা নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অনেককে তার অনুগ্রহে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। সুস্থ সবল ব্যক্তিদেরকে কর্মচারী বনিয়ে তাকে বিপুল সংখ্যক মানুষের রিযিকের উসিলা বানিয়েছেন। কত মানুষ তাদের সাহায্য সহযোগীতার মুখাপেক্ষী হয়। নিঃসন্দেহে তারা পঙ্গু, সুস্থভাবে হাঁটা চলা করতে অক্ষম, কিন্তু তারপরও তাদের অনেককে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তাদের অনেকে সুস্থ ও সবল ব্যক্তিদের দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে। অনেক শক্তিশালী লোক তাদের সামনে এতো শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে বসে যে, মনে হয় তারাই পঙ্গু এবং পঙ্গু ব্যক্তিটিই সুস্থ সবল একজন মানুষ। এই সবই আল্লাহ তাআলার হেকমত।

আপনি যদি অসহায় ও নিঃস্ব হন

ভাবুন আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীনের জ্ঞান দান করেছেন। হাজারো মানুষের অন্তরে আপনার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়েছেন। কত মানুষ পৃথিবীতে এমন রয়েছে যারা আপনার মাতো হওয়াকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের যাবতীয় ভরণ পোষণ পরিপূর্ণভাবে দিতে পারেন না। সব সময় পেরেশানীতে থাকেন। কিন্তু তারপরও আল্লাহ ও রসূলের কাজ করে যাচ্ছেন। দীনের কাজে সর্বদা সাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার জীবনসঙ্গীনী পূর্ণ আমানতদার। পূত-পবিত্র, সতিসাধ্বী ও অল্পেতুষ্ট। সন্তানদের

দিকে তাকালে আপনার চোখ শীতল হয়। আপনার ঘর যেনো জান্নাতের একটি টুকরা। এমন পারিবারিক সুখের জন্য হাজারো ধনাঢ্য পরিবার নিজেদের ধন সম্পদ অকাতরে ব্যায় করে। তবুও সুখ তাদের অধরাই থেকে যায়।

যদি আপনি অশিক্ষিত কেউ হন

ধরুন আপনি এমন কেউ সমাজে যার আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। আপনি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আপনার কথার কোনো মূল্য নেই। আপনার সুপারিশের কোনো দাম নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজের ইবাদত বন্দেগী করার তাওফিক দান করেছেন। মানুষের অধিকার আদায় করার তওফিক দিয়েছেন। হারাম থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব আপনার অন্তরে আছে। আল্লাহর নাফরমানির কল্পনা করলেই আপনার শরীর শিউরে ওঠে। তাহলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনি তার এমন কোটি কোটি বান্দা থেকে উত্তম, যাদের সুপারিশের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। যাদের কথা মানুষ শোনে। যারা সমাজে মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছে। কিন্তু না তারা আল্লাহর হক আদায় করছে, আর না বান্দাদের হক আদায় করছে।

এটা কারোই ভাবা উচিৎ নয় যে, আমি সমাজের অনেক বড় একজন ব্যক্তি। আমি অনেক সম্মানের পাত্র। আল্লাহ দয়া করে আমাদের অনেককে সম্মান দান করেছেন। এই দুনিয়া উপদেশ গ্রহণের স্থান। পরীক্ষার কেন্দ্র। এখানে আল্লাহ তাআলা একজনকে আরেকজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একজনকে আরেকজনের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমরা অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। অন্যের এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষও রয়েছে, আমাদের যা আছে তার শত ভাগের এক ভাগও তাদের কাছে নেই। আবার এমন অনেকেই আছে যাদের কাছে আমাদের চেয়ে বেশী আছে। আমাদের ভাবনার সঠিক গতিপথ রসূল সা. ঠিক করে দিয়েছেন। রসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে দুনিয়াবী দিক থেকে উচ্চস্তরের লোকদের দিকে তাকিয়ো না; বরং তাদের দিকে তাকাও যারা অনেক দিক থেকেই তোমাদের তুলনায় নীচুস্তরের। এর মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তুচ্ছ নয়। তাকে ছোট ভাবার কোনো সুযোগ নেই।'

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি এমন ব্যক্তির ওপর পড়ে, যার ধন-দৌলত এবং শারীরিক গঠন তার চেয়ে ভালো, তখন যেনো সে ওই ব্যক্তিকে দেখে নেয় যার শারীরিক গঠন, আকার আকৃতি তার চেয়ে অনেক বেশি অসুন্দর এবং ধন-সম্পদ তার চেয়ে কম।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তার নেয়ামতের ওপর সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য নবী সা.-এর শেখানো কৌশল অনেক উপকারী। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ যে নেয়ামতগুলো দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করা মুমিনের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই সৌভাগ্য কেবল পূর্ণ মুমিনই লাভ করতে পারে। যে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান রাখে। বিশ্বাস করে যে, কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয় এবং আল্লাহর কোনো কাজই হেকমতশূন্য নয়। এই বিশ্বাসই একজন মুমিনের সবচে বড় সম্বল। ঈমানের মাধ্যমে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ সৃষ্টি হয়। আর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এমন ভুল না করা উচিত

আমরা একটু অসাবধান হলেই উইপোকা আমাদের দামি কিতাবগুলো নষ্ট করে ফেলে। একটু অসতর্ক থাকলেই ঘুণপোকা আমাদের মূল্যবান আসবাবপত্র নষ্ট করে। স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে উদাসীন হলে আমরা রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ি। নিঃসন্দেহে উইপোকা, ঘুণ এবং অসুস্থতা আমাদের শত্রু। আমরা যথাসম্ভব এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চেষ্টা করি। যেনো আমাদের মূল্যবান কিতাবগুলো, কষ্টের টাকায় কেনা মূল্যবান আসবাবপত্র এবং সুস্থতা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। ওই শত্রুদের শত্রুতার ব্যাপারে আমরা অবগত এবং তাদের আক্রমণ আমরা নিজেদের চোখেই দেখেছি। আমাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা আমাদের বলে, আমরা যেনো ওই শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। অসাবধান থেকে যেনো পরে আমাদের আফসোস করতে না হয়।

জীবনের আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া না হওয়া

এই পৃথিবীতে কখনো বঞ্চনা বা ব্যার্থতার স্বাদ পায় নি এমন মানুষ খুঁজে বের করা কঠিন। আবার প্রত্যেক ব্যার্থ মানুষও কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। হাজারো ব্যার্থতার আক্ষেপ নিয়েও মানুষ স্বীকার করে, তার জীবনের বহু আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। তবুও পৃথিবীতে এমন মানুষ খুঁজে বের করা কঠিন যার কোনো আফসোস নেই। দিন-রাত মানুষ নিজের কোনো না কোনো আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করে যায়।

পৃথিবীতে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি বোধ হয় সে যার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। যে তাকে তার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পথে চলার জন্য বলবে। মানুষ প্রকৃত বন্ধু থেকে বঞ্চিত তখনই থাকে যখন সে ভাবে, সে সবার চেয়ে বড়। কারো সদুপদেশ সে গ্রহণ করতে চায় না। মানুষ তাকে উপদেশ

দিতে ভয় পায় কারণ সে নিজের ভুল কাজে বাঁধা পেলে বিগড়ে যায়। উপদেশ শোনার পরিবর্তে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে। তাকে অপমান করে। উপদেশদাতার ওপর সে অসন্তুষ্ট হয়। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মানুষ সহমর্মিতার কারণে বার বার তাকে বাঁধা দেয়। কিন্তু সে আরোও বিগড়াতে থাকে। তার আত্মম্ভরিতার কারণে সে উপদেশকে বিরোধিতা মনে করে।

সেই লোকটা কত হতভাগা যাকে শুভাকাঙ্খীরা ভালো কথা বলতে ভয় পায়। উপদেশ দিতে ভয় পায়।

হতাশা দূর হয়ে যাক

যে নিজের বঞ্চনা উপলব্ধি করতে পারে, সে অবশ্যই নিজের বঞ্চিত অবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যে নিজের বঞ্চনা উপলব্ধিই করতে পারে না সে কিভাবে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করবে? শুভাকাঙ্খীদের উপদেশ ও পরামর্শ থেকে বঞ্চিত থাকা মানুষের দুর্ভাগ্য হলো, সে নিজের বঞ্চনা ও ব্যর্থতা উপলব্ধিই করতে পারে না। ব্যর্থতার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হলে সে মনে করে তাকে অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিজের আচরণ ও কাজ কর্মের ব্যাপারে চিন্ত ভাবনা করার চেয়ে সে অন্যকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতেই বেশি পছন্দ করে। সে সবাইকেই নিজের চেয়ে নির্বোধ ও নীচু মনে করে। এবং কাউকেই উপদেশগ্রহণের উপযুক্ত মনে করে না।–

مرید باسعادت رو رو کے ہو گیا تائب
خدا کرے یہ توفیق شیخ کو بھی مل جائے

সৌভাগ্যবান মুরিদ কাঁদতে কাঁদতে হয়ে গেলো তাওবাকারী
আল্লাহ যেনো এই তাওফীক শায়েখকেও দান করেন।

প্রকৃত বন্ধু আমাদের জন্য আয়নার মতো

মানুষ খুবই দুর্বল। সে সব সময় নিজের কুপ্রবৃত্তির তাড়না, জৈবিক চাহিদা এবং শয়তানের বিভিন্ন ওয়াসওয়াসার সাথেই বাস করে। শয়তান মানুষকে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য সব সময়ই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মানুষ শয়তানের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে না। তারা বেশিরভাগ সময় উপলব্ধিও করতে পারে না যে, এই কাজ করিয়ে আমাকে আমার স্তর থেকে কতো নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে

যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।[৯৬]

দুনিয়ার এই জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষার সময়কাল। এই জীবনে কোনো মঞ্জিল ও স্তর এমন নয়, যেখানে পৌঁছে আমরা আশ্বস্ত হতে পারবো যে, এখন আমরা সব দিক থেকে নিরাপদ। আমার বিচ্যুত হওয়ার এখন আর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এখন আর আমার কোনো কথা ও কাজে নাক গলানোর অধিকার কারো নেই। আমাকে উপদেশ ও নসীহতের বাণী শোনানোর হকও কেউ রাখে না। আমি নিজের সর্বোৎকৃষ্ট মেহনত, সাধনা এবং উন্নত তরবিয়াতের বদৌলতে হিদায়াত ও উত্তম চরিত্রের এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছি, যে স্তরে পৌঁছে গেলে মানুষ কোনো দিক থেকেই অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এমনকি নসীহত ও উপদেশ বাণী শোনার ক্ষেত্রেও না।

এমন অহমিকার পরিণাম

আপনি আপনার ভ্রান্ত অহমিকা ও ধ্যান-ধারণাগুলো ছুড়ে ফেলে দিন। খাটি অন্তরে আল্লাহর কাছে তাওবা করে শয়তানের চক্রান্তের এই বেড়াজাল থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসুন। নিভৃতে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন। সারাজীবনের উত্তম শিক্ষা ও সাধনার বদৌলতেও এমন কোনো স্তরে পৌঁছা যায় না যে, মানুষ নিজে নিজেকে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ভাবতে পারে। সে অন্যের উপদেশ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। এরকম ভাবনা শুধু ভুলই নয়; বরং এটা মানুষকে হেদায়েত ও উত্তম চরিত্র থেকে অনেক নিচে নামিয়ে দেয় ।

হযরত শাহার ইবনে হাওশাব রা. বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত উম্মে সালামা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! যখন আল্লাহর রসূল সা. আপনার সঙ্গে থাকতেন তখন কোন দোয়া বেশি পড়তেন?

উম্মুল মুমিনীন রা. বললেন, রসূল সা. এই দোয়া বেশি পড়তেন,

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অটল করে দিন।[৯৭]

আল্লাহু আকবার! উভয় জগতের সরদার রসূল সা. অধিকাংশ সময় এই দোয়া পড়তে থাকতেন। আর আমি ও আপনি নিজেদের মূল্যবান সময় অবহেলায় নষ্ট করছি।

আমরা যারা নিজেদের বদমেজাজ ও অহমিকার কারণে শুভাকাঙ্খীদের

---

[৯৬] সূরা আ'রাফ (আয়াত: ২৭)

[৯৭] সুনানে তিরমিযী

উপদেশ থেকে বঞ্চিত, যারা বন্ধুদের সমালোচনায় উত্তেজিত হই, নিজের দোষ ত্রুটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার বদলে অন্যের দোষ চর্চায় সময় ব্যায় করি, এসব করে আমরা আসলে নিজেরই নিকৃষ্ট শত্রুতে পরিণত হচ্ছি।

পৃথিবীতে প্রকৃত শুভাকাঙ্খী বন্ধু আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। ভালো বন্ধুর সংশ্রব মানুষের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। সে অন্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক করে, ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়। প্রকৃত বন্ধুদের কল্যাণকামিতা, সদুপদেশ থেকে আমরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখি, তাহলে এটা হবে আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। উপদেশ গ্রহণ না করা মানে হলো, আমরা যেনো নিজের ধ্বংসের জন্য নিজেই কূপ খনন করছি এবং নিজেদের উভয় কানে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে রাখছি যাতে সতর্ককারীর আওয়াজ আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করুন। আত্মাকে আত্মগর্বে স্ফীত করার পরিবর্তে তাকে কাঁদানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে নিজের নিকৃষ্ট শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করুন। নিজের প্রকৃত বন্ধুদের শ্রদ্ধা করুন। তারা যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে সচেতন করতে চায়, আপনার কোনো ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়, তাহলে তাদের এই অনুগ্রহকে আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন। তাদেরকে উৎসাহ দেবেন। তাদের পরামর্শগুলো ইখলাসের সাথে চিন্তা করবেন। তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাদের উপদেশ, পরামর্শ এবং সমালোচনাকে আল্লাহর পুরস্কার মনে করুন।

মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা দেখতে পায় না। নিজের চেহারার দাগ মানুষ নিজের চোখে কীভাবে দেখবে? আয়না যেমন আমাদের সামনে আমাদের চেহারার দাগ ও কলঙ্ক তুলে ধরে আমাদেরকে এই দাগ ও কলঙ্ক পরিস্কার করার সুযোগ করে দেয়, আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং সাথী-সঙ্গীরাও আমাদের জন্য আয়নার মতো। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আপনি আপনার চারিত্রিক ও আত্মিক দোষ-ত্রুটি দূর করতে পারবেন না।

যদি আপনার অহমিকা, আত্মগর্ব ও দুর্ব্যবহারের কারণে আপনার প্রকৃত বন্ধুরা আপনার দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দিতে ভয় পেতে থাকে, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনি এই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বঞ্চিত মানুষ।

একটি ঘটনা

দুই বন্ধু গ্রামের এক রাস্তা দিয়ে চলছিলো। শায়েখ নাসীরুদ্দীন পৌঢ় বয়সী ছিলেন, সর্বক্ষণ যিকির-আযকারে মগ্ন থাকতেন। শিহাব খান ছিলেন যুবক বয়সী, তিনিও খুব দীনদার ছিলেন। উভয়েই তাদের নিকটবর্তী এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। শিহাব খানের কাছে এই রাস্তাটি ছিলো একেবারেই নতুন। কারণ তিনি প্রথমবারই এ রাস্তায় এসেছিলেন। আর শায়েখ নাসীর নিয়মিতই এই রাস্তায় চলাফেরা করতেন। রাস্তার ভালো-মন্দ সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। শায়েখ নাসীর নিজের অভ্যাস অনুযায়ী যিকির করতে করতে যাচ্ছিলেন। শিহাব খান কিছুটা আগে আগে চলছিলেন।

সামনে একটি নদী পড়লো। নদীটি পার হয়েই তাদের গন্তব্যে যেতে হবে। নদীর পানি যদিও কম ছিলো, তবুও মাঝে কোথাও গর্ত বা বেশি গভীরতা থাকার সম্ভাবনাও ছিলো। শায়েখ নাসীর খুব ভালোভাবে জানতেন, কোথায় গর্ত আছে, কোথায় নেই। রাস্তা কোন দিক দিয়ে ভালো, কোন দিক দিয়ে খারাপ। কারণ নিয়মিতই তিনি এই নদী পার হতেন। কিন্তু শিহাব খান যেহেতু প্রথমবারই এসেছিলেন, তিনি জানতেন না কোন দিক দিয়ে নদী পার হতে হয়, কোন দিকে বিপদ নেই।

কিন্তু পানি কম দেখে শিহাব খান নদীতে নেমে পড়লেন। নদীতে নামামাত্রই তার পা পানিতে তলিয়ে গেলো। তিনি হাবুডুবু খেতে লাগলেন। এ সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে সেখানে উপস্থিত হলো এবং ওই লোকটির সাহায্যে শিহাব খান নদী থেকে উঠলেন।

শায়েখ নাসীর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি সব কিছু দেখছিলেন। শিহাব খান নদী থেকে উঠে আসার কিছুক্ষণ পর শায়েখ তার কাছে গেলেন। শিহাব খানকে শুকনো পোশাক দিলেন। শিহাব খান সেটা পরে ভেজা জামা কাপড় শুকানোর জন্য রৌদ্রে ছড়িয়ে দিলেন।

তারপর শিহাব খান শায়েখকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো সবসময় এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করেন। আপনি কি জানতেন না নদীর এই জায়গায় এতো গভীর গর্ত?

শায়েখ উত্তর দিলেন, আমার খুব ভালোভাবেই জানা ছিলো, এখানে গর্ত আছে। এই গর্ত খুব ভয়ানক। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী যে, তুমি বেঁচে গেছো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো এবং নফল নামায পড়ো।

শিহাব খান অভিযোগের সুরে বললেন, আপনি আগে থেকেই জানতেন এখানে এই গর্ত রয়েছে, অথচ একটু দূরে থেকেও আমাকে বাঁধা দিলেন না!

শায়েখ নাসীর বললেন, হ্যাঁ ভাই! আমি তো দেখছিলাম। বুঝতেও পারছিলাম, এখানে নামলে তোমার বাঁচা কঠিন হবে। তবুও আমি তোমাকে ডাক দিইনি কারণ আমি অযিফা আদায় করছিলাম। অযিফা পূর্ণ করা ছাড়া দুনিয়ার কাজকর্মে কীভাবে মনোযোগ দেই? অযিফা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমার দিকে ছুটে এলাম।

এটা মনগড়া কোনো কাহিনী নয়; সত্যি ঘটনা। শায়েখ নাসীর নিজের সঙ্গীর মৃত্যু মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবুও অযিফা পূর্ণ না করে তার দিকে মনোযোগ দিতে চান নি। দোয়া এবং অযিফার ইবাদত অসম্পূর্ণ রেখে অন্য কোনো কাজ না করাকে তিনি আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ মনে করেছিলেন।

শায়েখ নাসীর এটাকেই দীন ভেবে নিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে এটা ছিলো উচ্চ পর্যায়ের দীনদারি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, মানুষ যখন আল্লাহর কাজে ব্যস্ত থাকে, তার যিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকে, তখন যতো বিপদাপদই সামনে আসুক না কেনো, যিকির ছেড়ে সেদিকে মনোযোগ দেয়া আল্লাহর সাথে বেয়াদবি।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শায়েখের এরকম চিন্তা ভাবনা ছিলো পুরোপুরি ভুল চিন্তা ভাবনা। তিনি দীনের চাহিদা পূরণ করেন নি; বরং মারাত্মক অপরাধ করেছেন। তবে দীনদারি না থাকা, বা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতাবশত বা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে তিনি এই অপরাধ করেন নি। বরং দীনের গভীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকার কারণেই তিনি এমন ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। যদি দীনের জ্ঞান শায়েখের থাকতো, তাহলে তিনি কখনোই এমন কাজ করতেন না।

সঠিক দিক নির্দেশনা ছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠন অসম্ভব

ব্যক্তিত্ব গঠন করার প্রথম ধাপ হলো ব্যক্তিকে চেনা। ব্যক্তির পরিচয় লাভ করা। ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা থাকা। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে যতটুকু জানেন তাদের চেয়ে বেশী কেউ জানে না। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এবং তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কঠোর সাধনা করেন। তাকে অনবরত উৎসাহ দেন। তখন সন্তানও ভাবতে থাকে যে, তার ভবিষ্যত কী হবে, কোথায় গিয়ে ভবিষ্যতে সে সুবিধা করতে পারবে, কোনটা সে বেশি ভালো পারবে ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা সাদা কাগজের টুকরোতে যখন মানুষের ভাগ্য লিখেন, তখন এটাও বলে দিয়েছেন, ভাগ্য দোয়ার মাধ্যমে বদলাতে পারে। মানুষ কষ্ট ও দোয়ার মাধ্যমে নিজের নির্ধারিত অংশ বদলাতে পারে।

পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক রয়েছে। এক ধরনের মানুষ ভাগ্যের ওপর

নির্ভর করে বসে থাকে আর বলে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।
আরেক ধরণের মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাদের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে। সফলতা লাভের জন্য সব সময় প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সব সময়ই তাদের মাথায় কোনো না কোনো পরিকল্পনা ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে একদিন তারা সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। বিজয় তাদের পদচুম্বন করে।

পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকে আর বলতে থাকে, ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে, এর চেয়ে বেশী আর কি করার আছে ইত্যাদি, তাদের ক্ষেত্রেও এই কথাটি শেষ কথা হয় না। প্রতিটি মানুষই জীবনে ভালো কিছু করতে চায়। ভালো কিছু করার আকাঙ্খাও থাকা উচিত। এখন প্রশ্ন হলো, এই আকাঙ্খা ও ইচ্ছা কোত্থেকে আসে?

এর উত্তর খুঁজলে আমরা দেখতে পাই, এই আকাঙ্খা মায়ের কোল ও শিক্ষকের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ লাভ করে। মায়ের কোলেই শিশুর চরিত্র গঠন হয়। মায়ের কোলেই শিশু তার বৈষয়িক অন্যান্য গুণাবলি অর্জন করে। মায়ের কোল থেকেই সত্য কথা বলা, ন্যায়ের পথে চলা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা মানুষ পায়। আবার অনেকেই কুফুরি, জুলুম ও অত্যাচারী হওয়ার শিক্ষাও পায়।

মায়ের কোল থেকে কারো কারো আল্লাহর প্রতি ভয় এবং মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আগ্রহ জন্মাতে থাকে। আবার এখান থেকেই কারো মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করার লিপ্সা তৈরি হয়।

পৃথিবী থেকে জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচারকে নির্মূল করা ও মানবতাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করার সাহস মায়ের কোল থেকেই জন্মায়। আবার এখান থেকেই সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করা ও বড় অফিসার হওয়ার আকাঙ্খা তৈরি হয় মানুষের মনে।

মায়ের কোলেই শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মা দুধ পান করানোর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানির গানও গেয়ে শোনায় এবং নিজের রুচি অনুযায়ী গল্প ও নানা কথা বার্তা বলে বলে বাচ্চাকে বড় করতে থাকে। শিশুর মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে মায়ের এসব গল্প, গান ও কথা বার্তার অনেক বড় প্রভাব থাকে। তাই সন্তান প্রতিপালনের সময়েই তার অন্তরে আল্লাহকে মানা ও ভালো কাজ করার আগ্রহ এমনভাবে ঢেলে দেয়া উচিত যে, যেনো এই আগ্রহ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে যায়। সে নিজের জীবনের উত্তম লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। নিজের জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে পারে।

সব শিশুই কোনো না কোনো যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। এ যোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা ও বিকশিত করার দায়িত্ব মা-বাবার। সন্তানের

মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করার দায়িত্বও মা-বাবারই। মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে কোনো না কোনো যোগ্যতা ও প্রতিভা থাকে। কোনো কাজের ক্ষেত্রে কারো ওপর সবার আস্থাও থাকে যে, হ্যাঁ সে এটা অবশ্যই পারবে। তাকে দিয়েই এ কাজটা হবে। আর সেও একটা সময়ের অপেক্ষায় থাকে। সময়মতো সে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। তবে এক দুইটা কাজ করলেই তার যোগ্যতা সবাই স্বীকার করে নেয় না। বরং দীর্ঘ একটা সময় ধরে মানুষ তার কাজ যাচাইবাছাই করতে থাকে। সে নিজেও ধারবাহিকভাবে পরিশ্রম করতে থাকে। এক সময় সে সবার কাছে সমাদৃত হয়ে ওঠে।

ওই সব সন্তানরাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, উজ্জল ভবিষ্যত গড়তে পারে যারা প্রবল আত্মবিশ্বাসী হয়। যারা সুস্থ ও সঠিক চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হয়। যাদের সংকল্প ও সাহস থাকে উন্নত। সাধারণত সচেতন মা-বাবারা নিজেদের সন্তানদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেন না। তারা ভাবেন এটা তার ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা বাহ্যিকভাবে তার ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর মনে করি এমন কোনো ক্ষেত্রে কাজ করার প্রতিভা ও যোগ্যতাই তার ভেতরে সুপ্ত থাকে। তাই তার প্রতিভা ও যোগ্যতা কোন ক্ষেত্রে বেশি তা ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত।

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনই একটি সাধারণ নিয়ম-নীতির মধ্যে চলে। হঠাৎ যখন সে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তার প্রতিভা ও যোগ্যতার এমন এমন দিক প্রকাশিত হয় যা এর আগে কেউ জানতো না। বাচ্চাদের প্রতিভাগুলো চিনে চিনে এগুলোকে বিকশিত করা খনি খুঁড়ে স্বর্ণ বের করে আনার মতো। বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েরা যখন শৈশবের সীমা পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাদের বিশেষ তদারকির প্রয়োজন পড়ে। এই সময়ে সন্তানের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠন খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বাচ্চারা কঠিন আচরণ সহ্য করতে চায় না। কারো শাসন মানতে চায় না। তাই এই সময়ে বন্ধুসুলভ আচরণ করেই সন্তানকে বোঝাতে হবে। আর বিশেষকরে মায়ের বাচ্চাদের কাছে বিশ্বস্ত হওয়া খুবই জরুরি।

সন্তানের সাথে এমন সম্পর্ক থাকা উচিত যেনো তারা আমাদের সাথে সবসময় সত্য কথা বলে। মিথ্যা বলার কল্পনাও যেনো তাদের মনে না আসে। তারা ভুল করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে আদর করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দ্বিতীয়বার এই ভুল আর করো না। তাদেরকে সমাজের উত্থান পতন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। বাচ্চাদের স্বভাব বোঝা এবং তাদের মাঝে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা হলো তাদের শিক্ষার প্রথম ধাপ। তাদের সামনে সব সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করা এবং নিজের ভালো মন্দ সম্পর্কে

খোঁজখবর রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

শিশুদের ভেতর ভয় পাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। যে জিনিসকে সে ভয় পায়, তা থেকে হেকমতের সঙ্গে তার ভয় দূর করে দেয়া। তার সকল কাজেই সহযোগীতা করতে যাওয়া উচিত নয়। কিছু কাজ তাকে নিজে নিজেই করতে দেয়া উচিত। এমন কাজের ক্ষেত্রেই তাকে সাহায্য করা উচিত যা করা তার একার পক্ষে কঠিন। পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। রাতভর জেগে জেগে পড়াশোনা করতে নিষেধ করতে হবে। দিনের বেলা পরিকল্পনামাফিক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জীবনের একটা লক্ষ্য ঠিক করে দিয়ে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

সঠিক দিকনির্দেশনা ছাড়া মানুষ বড় হতে পারে না। শৈশব থেকেই আমাদের সন্তানদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া উচিত যে, তারা পৃথিবীতে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আসেনি। তাদেরকে দুনিয়াতে কোনো কারণ ছাড়া পাঠানো হয়নি। বরং এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো ভালো গুণ সুপ্ত থাকে। এই ভালো গুণগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ দুনিয়াতে মানুষ এমনিতেই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যায় না, সে তার কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হয়। যে সবার উপকারে এগিয়ে যায়, সবার প্রতি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, সে সবার প্রিয় হয়ে ওঠে। আর যে নিজের দায়িত্ব পালন করে না, নিজের যিম্মাদারির কথা উপলব্ধিও করে না, তাকে মানুষ ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। পক্ষান্তরে অনেকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং একনিষ্ঠতার সাথে ভালো কাজ করে যায়। এক সময় গোটা পৃথিবীর সবাই তাকে ভালোবাসে। তার গুণগান গেয়ে বেড়ায়। তার পক্ষে শ্লোগান দেয়। তারা জীবনকালে যেমন সম্মান পায়, মৃত্যুর পরও মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় জীবিত থাকে।

আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক

অনেক পরিবারেই এখন শাশুড়ি এবং পুত্রবধুর সম্পর্কে ফাটল ধরে যায়। তাদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। খুব সহজেই তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন একটু কৌশলে কাজ করার, একটু ভালোবাসা ও সদিচ্ছার।

আমাদের দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে করা হয়। ছেলের বিয়ে হোক বা মেয়ের বিয়ে হোক, অনুষ্ঠান যেনে ধুমধামের সাথে হয় এ দিকে সবার নজর থাকে। বিশেষ করে ছেলের বিয়েতে উৎসব করে পুত্রবধুকে ঘরে

তোলা হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছেলেরাই তাদের মায়ের পছন্দে বিয়ে করে। তাই ছেলের বিয়ের সময় মা-ই সবচেয়ে বেশি খুশি থাকেন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম বউ যেমন শাশুড়ির দিকে খেয়াল রাখে শশুড়িও বউয়ের দিকে খেয়াল রাখে। বউ শাশুড়ির সব আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যে মেনে নেয়। শাশুড়ির খেদমত করে তার মন জয় করার চেষ্টা করে। তবে অধিকাংশ ঘরেই এই সুখ-শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। বছরখানেক তাদের এই সুসম্পর্ক বজায় থাকে। তারপর তাদের সম্পর্কে আগুন লেগে যায়। বউ শাশুড়ির ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। একজন অপরজনের নামে বদনাম রটাতে থাকে। দুর্নাম করতে থাকে। বউ শাশুড়ির এই ঝগড়া শুধু তাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং পুরো পরিবার জুড়ে অশান্তির ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে। এই বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অশান্তি ও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পারে না। স্ত্রীও স্বামীকে সহ্য করতে পারে না। এই ছোট ছোট ঝগড়া থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরাট কোনো ঝামেলা বেঁধে যায়। এক পর্যায়ে অবস্থা এতো জটিল হয়ে ওঠে যে, স্বামী এবং স্ত্রী আলাদা হওয়ার চিন্তা করতে থাকে। এ জাতীয় সাধারণ ঝগড়াঝাটির কারণে শুধু এক ছেলেই তার মা থেকে আলাদা হয় না, বরং তাদের কারণে সব আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কেই একটা খারাপ প্রভাব পড়ে। সবার মধ্যেই সংকোচ ও লজ্জার বিশাল প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায়।

এটা আবশ্যক নয় যে এই ঘটনা সবার ঘরেই ঘটবে। এর বিপরীত চিত্রও অনেক পরিবারে আছে। আমাদের সমাজে অনেক ঘর এমন আছে, যেখানে বউকে শুধু মুখেই মেয়ে বলা হয় না, বরং অন্তর থেকেই মেয়ে হিসেবে মেনে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে শাশুড়িকে শুধু মুখেই মা ডাকা হয় না, বরং অন্তর থেকেই মায়ের মতো সম্মান করা হয়। তবে বর্তমানে আমাদের সমাজে এরকম সুন্দর সুসম্পর্কের সুখী পরিবার খুব কমই দেখা যায়। কী কারণে যেনো যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যারা উন্নত জীবন যাপন করছে, তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক, হৃদ্যতা, সম্প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আর যে সমাজে আত্মীয়দের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি হ্রাস পেতে থাকে, সেই সমাজ অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। তাদের চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসে। আমরা যদি একটি সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই, তাহলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের অবশ্যই যথাযথ সম্মান দিতে হবে। এই আলোচনা যদি শুধু শাশুড়ি ও বউ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যেতো, তাহলে ভালো হতো। বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক খুব নাজুক একটা সম্পর্ক। এই সম্পর্কের যত্ন নেয়া প্রয়োজন। এই সম্পর্ক যদি ভালো থাকে তাহলে পরিবারের সবাই শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। এ

কারণে আপনি যদি চান স্ত্রীর সাথে শাশুড়ির সুসম্পর্ক থাকুক, তাহলে নীচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন।

১. সবচে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, পরস্পরের অন্তরে পরস্পরের জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হওয়া। যদি আপনি বউ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার শাশুড়িকে মায়ের সম্মান দিন। আপনি শাশুড়ি হয়ে থাকলে বউকে আপন মেয়ের মত দেখুন। বউয়ের সুখ-দুঃখের প্রতি নিজের মেয়ের মতো লক্ষ্য রাখুন। অর্থাৎ শুধু মুখে বললেই চলবে না; বরং কাজেকর্মে তার প্রমাণ দিতে হবে। বাস্তবিক অর্থে আপনার শাশুড়িকে এটা বিশ্বাস করাতে হবে যে, আমি আপনাকে সত্যিকারার্থে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসি। শাশুড়িরও বউকে এটা বিশ্বাস করাতে হবে যে, আমি তোমাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসি। যখন উভয়ে উভয়কে পরিপূর্ণ সম্মান দিতে থাকবে, তখন আপনা আপনিই দু'জন দু'জনের প্রিয় হয়ে যাবে। দু'জনেই দু'জনকে সম্মান দিতে থাকবে।

২. যখন শাশুড়ি অথবা বউ কোনো একজন কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন অপরজনের উচিত তাকে সাহায্য করা। সে যেনো তার কাজে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে শুধু তার কাজের বোঝা-ই হালকা হবে না বরং একজনের প্রতি অপরজনের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর মিলেমিশে কাজ করলে একজনের ওপর কাজের অতিরিক্ত চাপও পড়বে না।

৩. বছরে কয়েকবার আমরা উৎসব পালন করি। যেমন ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি। এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো উচিত। বউয়ের উচিত শাশুড়িকে এ উপলক্ষ্যে কিছু হাদিয়া তোহফা দেওয়া। শাশুড়িরও উচিত বউকে কিছু উপহার দেওয়া। হাদিয়া বিনিময়ের মাধ্যমেও ভালোবাসা বাড়ে। শাশুড়ি ভাববে, এতোদিনে আমাকে দেখার একটা মানুষ পাওয়া গেলো। এতোদিনে আমাকে দেখাশোনা করার একটা ব্যবস্থা হলো। বউয়ের মনেও এই ভাবনা আসবে যে, আমার প্রতি লক্ষ্য রাখারও মানুষ আছে।

৪. একই বাড়িতে যখন বউ এবং শাশুড়ি অবস্থান করবে, তখন একজন অপরজনের সাথে অপরিচিতের মতো ব্যবহার করবে না। একজন অন্যজনের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে থাকবে না। পরস্পর কথাবার্তা বলবে। মনের ভাবনাগুলো শেয়ার করবে। সংসারের ভালো-মন্দগুলো আলোচনা করবে। সংসারটাকে কিভাবে আরো সাজানো যায়, আরো সুন্দর করা যায়, এ নিয়ে মতবিনিময় করবে। এর মাধ্যমে উভয়ের সম্পর্ক আরো গাঢ় ও নিবিড় হবে।

৫. যদি আপনি শাশুড়ি হয়ে থাকেন তাহলে বউয়ের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর যদি আপনি বউ হয়ে থাকেন তাহলে শাশুড়ির আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আপনার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা

ও চলাফেরায় যেনো সে কোনো অভিযোগ করার সুযোগই না পায়। একজন অপরজনের আত্মীয় স্বজনকে এমনভাবে সম্মান করুন, যেমন সম্মান আপনি নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য পেতে চান।

৬. আপনি যদি বউ হয়ে থাকেন তাহলে কখনোই এটা ভুলে যাবেন না যে, আপনিও মা হবেন। তখন আপনিও চাইবেন আপনার ছেলের বউ আপনাকে মায়ের মতো সম্মান করুক।

শাশুড়িরও মনে রাখা উচিত, তার কন্যা সন্তানরাও একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাদের স্বামীর সাথে সংসার করবে। সবাই পর হয়ে যাবে। নিজের ছেলে ও ছেলের বউয়ের সঙ্গেই তাকে দিন কাটাতে হবে। তারাই আপনার আপন হবে। সূতরাং ছেলের বউকে নিজের মেয়ের মতো মানিয়ে নিতে চেষ্টা করুন। ছেলের বউকে নিজের মেয়ে ভাবতে শুরু করুন।

এই আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রাথমিক অবস্থায়ই উভয়ের উচিত উভয়কে আপন করে নেয়া। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা।

৭. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটিকে আমরা গুরুত্ব দেই না। বিষয়টি হলো, শাশুড়ি এবং বউয়ের এই আত্মীয়তার সম্পর্কটি হয় ছেলের মাধ্যমে। তাদের উভয়েরই উচিত তাকে খুশি রাখা।

৮. একইভাবে ছেলের ওপরও একটি গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেটা হলো, বিবাহের পর উভয় দিকের আত্মীয়দের সঙ্গে সমানভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা। নতুন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাও স্মরণে রাখা। ছেলে যদি উভয়দিকের আত্মীয়দের সঙ্গে সমানভাবে সম্পর্ক বজায় রাখে,তাহলে আর তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হবে না।

৯. ছেলের উচিত বিবাহের পর নতুন স্ত্রীর প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেয়, মা-বাবার প্রতিও ঠিক ততটুকু মনোযোগ দেয়া। যেভাবে নতুন স্ত্রীর খোঁজখবর নেয়, মা-বাবারও খোঁজখবর নেয়া।

একটু ভাবুন! এই কথাগুলো কত সহজ সরল ও সাদামাটা। একটু যত্নবান হলে আর একটু চেষ্টা করলে শুধু আত্মীয়তার সম্পর্কই বজায় থাকবে না; বরং সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে যাবেন। আত্মীয়-স্বজনকে এতো বেশি সম্মান করা উচিত যেনো তারাও আপনাকে সম্মান করতে বাধ্য হয়।

দাওয়াতের কাজ বড় পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা তার দীনের খেদমতের জন্য আপনাকে ডাকছেন। আপনি যদি তার ডাকে সাড়া দিয়ে দীন প্রচার-প্রসারের কাজ করার সুযোগ পান, তাহলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ আপনাকে তার কোটি কোটি বান্দার মধ্য থেকে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মনোনীত করেছেন। এটা আপনার ওপর আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে তিনি আপনাকে তার বান্দাদের নিকট নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনিই আপনার অন্তরে দাওয়াতের কাজ করার সংকল্প ও সাহস দান করেছেন। আপনার কারণে অনেক মানুষ পাপাচারের পথ ছেড়ে দীনের পথে আসবে, এটা আপনার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তাআলা তার দয়া ও অনুগ্রহে আপনাকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন।

অন্তরের অন্তর্স্থল থেকে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন যে, তিনি আপনাকে এই বিরাট দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেছেন। এই নির্বাচন আল্লাহর অনেক বড় পুরস্কার আবার অনেক বড় পরীক্ষাও। দীনের জ্ঞান এবং দীনের দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করার তওফিক দান করে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এটা আপনার জন্য অনেক বড় পুরস্কার, একইসাথে অনেক বড় পরীক্ষাও। আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের মাঠে নামিয়ে আসলে দেখতে চাচ্ছেন, আপনি তার সাথে এই দায়িত্ব কতটা সুন্দরভাবে পালন করতে পারেন। আপনাকে মনোনয়নের হক আপনি কতটা আদায় করেন।

নবী সা. এক জায়গায় ইরশাদ করেন,

وَاَنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন যাতে তিনি দেখতে পারেন, তোমরা কেমন কাজ করো

আল্লাহর দেয়া এই দায়িত্বের হক আদায় করার জন্য তিনটি বিষয়ের দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত।

- বান্দার জন্য আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দেওয়া ও আহ্বান করার চেয়ে বড় কোনো মর্যাদা নেই।
- আল্লাহ তাআলাই এই কাজের জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন। তিনি যদি আপনাকে মনোনীত না করতেন তাহলে আপনি কখনোই এ কাজে জড়িত হতে পারতেন না।
- আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারীদের আবেগ, অনুভূতি ও উৎসাহ

উদ্দীপনাকে মূল্যায়ন করা জরুরি।

এই তিনটি কথা সর্বদা আপনার হৃদয়ের মনিকোঠায় স্মরণ রাখুন। শুধু একবার পড়া বা বোঝা যথেষ্ঠ নয়; বরং বারবার এই কথাগুলো পড়ুন। বারবার স্মরণ করুন।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচে মর্যাদাবান হলেন রসূল ও পয়গম্বরগণ। যারা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দীনের দিকে ডেকেছেন। নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে দীনের সরল সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আল্লাহর এই রসূলগণ যুগে যুগে এসেছেন এবং মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে ডেকেছেন। সবশেষে হযরত মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহ তাআলা এই কাজের জন্য রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। রসূল সা. নবুওয়াত লাভ করার পর ২৩ বছর পর্যন্ত আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। ইসলামের শিক্ষায় আলোকিত করে তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তুলেছেন। রসূল সা.ই সর্বশেষ নবী। অর্থাৎ তাকে নবুয়্যত দান করার মাধ্যমেই নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তার পর আর কোনো নতুন নবী বা রসূল আসবেন না।

কিন্তু নবুয়্যতের সিলসিলা যদিও শেষ হয়ে গিয়েছে; নবীদের কাজ শেষ হয়ে যায় নি। অর্থাৎ আল্লাহর গাফেল বান্দাদের আল্লাহর দিকে ডাকার কাজ এখনো রয়ে গেছে। বর্তমানে এই কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মতকে। বাইতুল্লাহ নির্মাণের সময় আল্লাহর সম্মানিত নবী ইবরাহীম আ. দোয়া করেছিলেন,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ.

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদের থেকে তোমার অনুগত উম্মত বানাও।[৯৮]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং নবী সা.-এর উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই উম্মতের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। যতো দিন এই পৃথিবী থাকবে, এই উম্মতই নবী-রসূলগণের স্থলাভিষিক্ত থাকবে। তারাই ওই কাজ করে যাবে যা নবী-রসূলগণ করতেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ

---

[৯৮] সুরা বাকারা (আয়াত: ১২৪)

سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

জিহাদ করো আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সূতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি![৯৯]

আপনার জন্য এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে যে, আপনি সেই কাজ আঞ্জাম দেবেন যার জন্য নবী-রসূলগণ প্রেরিত হতেন। যে কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ রসূল সর্বশ্রেষ্ঠ আদমসন্তান হযরত মুহাম্মাদ সা.-কেও প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দিয়ে আপনি রসূল সা.-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মর্যাদা পাবেন। সত্যিই আমাদের জন্য এর চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কাজ আর নেই। এই কথাগুলো মনে রাখলে নিজের কাজের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে। আপনার হিম্মত, ও সাহস আরও বাড়বে।

আরেকটি বিষয় হলো, এক মুহূর্তের জন্যও যেনো আপনি আত্মমুগ্ধতার ধোঁকায় না পড়েন। সব সময় মনে রাখবেন আপনি দীন প্রচারের কাজে শরীক হতে পেরেছেন কারণ আল্লাহ তাআলা নিজের হেকমত অনুযায়ী এ কাজের জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন। তিনি তওফিক না দিলে আপনি এই বিরাট কাজে জড়ানোর আগ্রহ আপনার কখনো হতো না। তার তওফিক ছাড়া আপনি অন্য কোনো নেক কাজও করতে পারবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাই তার দয়া ও অনুগ্রহে নিজের দীনের খেদমতের জন্য আপনাকে নির্বাচিত করেছেন। তার সব কাজই হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এই বিশ্বাস ও উপলব্ধির

---

[৯৯] সুরা হাজ (আয়াত: ৭৮)

সবচে বড় উপকারীতা হলো, আপনি দু'টি বড় চারিত্রিক দূর্বলতা থেকে রক্ষা পাবেন, নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে হীনমন্যতায় ভুগবেন না। আবার নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করে আত্মমুগ্ধতার শিকারও হবেন না।

এটা খুব মারাত্মক দুর্বলতা যে আপনি ভাবতে শুরু করলেন, আপনি কোনোভাবেই 'ইসলামী দাওয়াতে'র কোনো উপকার করতে পারছেন না। আপনার দাওয়াত মানুষের কোনো উপকারে আসছে না। হীনমন্যতার শিকার ব্যক্তি পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারে না। ইসলামী দাওয়াতের জন্য হীনমন্যতা ক্ষতিকর। যারা এরকম হীনমন্যতার শিকার, তাদের উচিত মাহফিল, সভা-সমাবেশসহ সব জায়গায় সব ধরণের বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে নির্ভয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করা। নিজের বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের প্রতি বিশ্বাস রাখা। ইরানী সিপাহসালার রুস্তমের দরবারে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করলে ভয়ে কাঁপতে থাকতো। হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রা. এবং হযরত রিবঈ ইবনে আমের রা. যে সাহস ও গর্ব নিয়ে তার দরবারে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন, হযরত জা'ফর তায়্যার রা. যে সাহসিকতার সাথে নাজাশীর দরবারে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, হযরত আবু যর গিফারি রা. যেভাবে নির্ভয়ে মক্কার জালিম মূর্খদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন, এসব ঘটনাবলি থেকে হকের পথে আহ্বানকারীরা কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

নবুয়্যত লাভের কিছু দিন পর নবী সা. কুরায়শ-নেতাদের তার বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন। তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে বলেছিলেন, আমি যে বাণী নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, এতে উভয় জগতে তোমাদের জন্য সফলতা রয়েছে। বলো, তোমাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গ দেবে? কে আমার সাথী হবে?

সবাই নিরব রইলো। কিন্তু বালক বয়সী আলী রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আমার চাচাতো ভাই! যদিও আমি বালকবয়সী, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

রসূল সা. যখন মক্কায় প্রায় নিঃসঙ্গ, কুরাইশের শক্তিশালী সরদাররা তাকে সমর্থন করছেন না, তখন একজন দুর্বল, দরিদ্র বালকের এই দুঃসাহসী ঘোষণা এই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ যে, এই সুমহান কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে মনোনীত করেছেন। এই সম্পদশালী, শক্তিশালী ও দাপটের অধিকারী, প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক এবং সুস্থ সম্পন্ন সরদারদের রেখে আল্লাহ তাআলার নেক দৃষ্টি আমার মতো দুর্বল বালকের ওপর পড়েছে, তাই আমি আমার অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও ঘোষণা করছি, আমি আপনার সঙ্গ

দিবো। যে সত্ত্বা আমাকে রসূল সা.-এর সহযোগী হওয়ার এবং তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন তিনিই সকল শক্তির উৎস। সকল ক্ষমতার মালিক। তিনিই আমার পাপ ক্ষমা করবেন। যেহেতু তিনি আমাকে মনোনীত করেছেন, তাই আমার দুর্বল মনে তিনিই দৃঢ়তা ও শক্তি দান করবেন। আমার অসুস্থ চোখে তিনিই আলো সৃষ্টি করে দেবেন। যার সাহায্যে আমি দূর পর্যন্ত দেখতে পাবো এবং সত্যের বাণী দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। এই চিন্তা চেতনা পোষণকারী হকের আহ্বানকারী কখনো হীনমন্যতার শিকার হবে না। ইতিহাস সাক্ষী আছে, এই বালক পরবর্তীকালে কতো বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাকে কতো উঁচু মর্যাদায় আসীন করেছিলেন।

আপনিও কি হযরত আলী রা.-কে অনুসরণ করার সাহস রাখেন? হয়তো আপনি অক্ষম ও দুর্বল, সমাজে আপনার সম্মান কম, প্রভাব বা দাপট নেই, দুনিয়ার হিসেবে আপনি কোনো উঁচু পদেরও মালিক নন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুসলিম পরিবারে পাঠিয়েছেন, দীনদার হওয়ার তওফিক দান করে ধন্য করেছেন, দাওয়াত তাবলীগের কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ ও সুযোগ দিয়েছেন, তাহলে ধরে নিন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকেও মনোনীত করেছেন। সকল হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে আলী রা.-এর কথাগুলো বার বার ভাবুন, 'যদিও আমি বালকবয়সী, কিন্তু আমি আপনার সহযোগী হবো।'

কাজে নেমে পড়ুন। যিনি আপনাকে মনোনীত করেছেন স্বয়ং তিনিই আপনার দুর্বলতাকে শক্তি দিয়ে বদলে দেবেন। আপনাকে এমন সাহস ও দৃঢ়তা দান করবেন যে, আপনি বর্তমান যুগের বড় বড় প্রভাবশালী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সামনে সাহসিকতার সাথে ইসলামের বাণী পেশ করতে পারবেন।

ইতিহাস গড়ে তোলা এই বালকের কথায় আপনার জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হলো, দীন প্রচার প্রসারের এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়। একইভাবে আত্মমুগ্ধ হওয়াও অনুচিত।

হযরত আলী রা. নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা, বিত্তহীনতা এবং কম বয়সের কথা চিন্তা করে যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় নিজের অবস্থান সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তার কথার অর্থ হলো, আমি নিজের ব্যক্তিত্বের দিক থেকে কোনোভাবেই এই গুরুদায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেওয়ার যোগ্যতার অধিকারী নই। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার তওফিক এবং দয়া যে, তিনি আমাকে এই বিরাট খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন। আমি শুধু ওই সত্ত্বার ওপর ভরসা করেই এই সংকটময় অবস্থায় রসূল সা.-এর সঙ্গ দেয়ার সাহস করছি যিনি আমাকে এই সাহস ও দৃঢ়তা দান করেছেন।

আপনি এই মহান মানুষদেরই উত্তরসুরী। নিজের হৃদয়ের কোণে কোণে

খুঁজে দেখুন, দীনের দাওয়াতের এই বিশাল কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে আপনি নিজেকে বড় মনে করে ধোঁকায় পড়ে থাকছেন না তো? শয়তান আপনাকে প্রতারিত করার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে ফেলছে না তো? বিশ্বাস করুন আপনি যদি এই ময়দানে এসে নফসের ধোঁকায় পড়ে যান, তাহলে ইসলামের আহ্বানের ক্ষেত্রে আপনার কোনো মর্যাদা থাকবে না। ভেবে দেখুন, আপনিই নিজেকে ধ্বংস করছেন। দাওয়াতের সওয়াব বরবাদ করে দিচ্ছেন। অহংকারী ও আত্মমুগ্ধ ব্যক্তি দীনের কাজ করতে পারে না। আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যে নিজের প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত, সে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার যত চেষ্টাই করুক না কোনো, এর কোনো প্রতিদান ও পুরস্কার তাকে দেয়া হবে না।

আলী রা.-এর কথা থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারীদের আগ্রহ কেমন হয়। তাদের চিন্তা ভাবনা কেমন হয়। তবে এই চিন্ত ভাবনার পাশাপাশি ধারাবাহিক চেষ্টা ও সাধনা ছাড়া আপনি দাওয়াতের হক আদায় করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে আপনার জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত হলো, সাহাবায়ে কেরামের জীবনযাপন। যারা রসূল সা.-এর দাওয়াত কবুল করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গ দিয়েছেন। আল্লাহর দীন কবুল করার পর তাদের নিজস্ব স্বার্থ বা আকাংখা বলতে কিছু ছিলো না। বরং সবকিছুই তারা দীনের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সম্পদ, প্রভাব, শক্তি, সন্তান, ঘর-বাড়ি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এমনকি নিজের জীবনও দীনের জন্য কুরবান করে দিয়েছেন। তারপরও এই অনুভূতি তাদেরকে অস্থির করে রেখেছে যে, আমরা কিছুই করতে পারলাম না।

আসুন হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারীদের দিকে একটু লক্ষ্য করি! তারাও আল্লাহর দীনের সহযোগী ছিলেন। দাঈ ছিলেন। ইসলামের দাঈদের জন্য তাদের জীবনাদর্শ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল তখন সে বললো, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললো, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা আত্মসমর্পণকারী। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছো, তাতে

আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রসূলের অনুসরণ করেছি।
সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করো।[১০০]

রসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর সহযোগী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প, এর দাবী পূর্ণ করার প্রত্যয় এবং হকের সাক্ষ্যদানকারীদের কাতারে শামিল হওয়ার এই আকাঙ্খা আমাদেরও উদ্দীপ্ত করে।

হাওয়ারী অর্থ হলো, কল্যাণকামী বন্ধু বা সহযোগী। আনসার শব্দটি যেমন মদিনার অধিবাসী প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীদের জন্য ব্যবহৃত হতো; যারা রসূল সা.-এর ওপর ঈমান এনেছে এবং সর্বাবস্থায় রসূল সা.-এর সঙ্গ দিয়েছে, হাওয়ারী ঈসা আ. এর ওই সঙ্গীদের বলা হতো, যারা একনিষ্ঠতার সাথে ঈসা আ.-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছে এবং সর্বাবস্থায় তার সঙ্গ দিয়েছে। হযরত ঈসা আ. হাওয়ারীদের দীন শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর তারা তার দূত হয়ে বনী ইসরাইলের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলো।

দুনিয়ার হিসেবে তারা তেমন কোনো মর্যাদাবান মানুষ ছিলেন না। কিন্তু যখন হযরত ইসা আ. অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তাদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করে বললেন, আল্লাহর পথে চলতে কে আমাকে সঙ্গ দেবে? তখন হাওয়ারীরা সব ধরণের লোভ-লালসা ত্যাগ করে এবং ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে বললেন,

نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ

আমরা আল্লাহর সাহায্য করবো।

এমন সংকটময় মুহূর্তে তারা এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, যখন জ্ঞানী-গুণীজন, সরদার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। আল্লাহ তাআলাই এসব প্রভাবহীন লোকদেরকে নিজের কাজের জন্য নির্বাচন করে রসূলের সহযোগিতা করার তওফিক দান করেন।

'আনসারুল্লাহ' হওয়ার ঘোষণা করার সময় তারা খুব ভালোভাবেই জানতেন, এই ঘোষণার অর্থ কি? আনসারুল্লাহ হওয়ার প্রয়োজন কেনো? এই ঘোষণা দিয়ে তারা কোন দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিচ্ছেন?

তাই نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ বলার পর তারা নিজেরাই এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন,

- আমরা সত্যিকারার্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। এখন থেকে আমাদের জীবনযাপন ঈমানের আলোয় আলোকিত হবে।

---

[১০০] সুরা আলে ইমরান (৫২, ৫৩)

- আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা। আমরা আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি দেখবেন, আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী বান্দা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আর জীবন উৎসর্গ করে দেয়াই আমাদের বৈশিষ্ট।
- আমরা আল্লাহর প্রেরিত অহীর ওপর ঈমান এনেছি। আমরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।
- আমরা রসূলের অনুসরণ করেই আমাদের জীবন কাটাবো। কোনো অবস্থায়ই তার নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হবো না।

পরওয়ারদেগার! আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা হলো, হাশরের ময়দানে আমাদেরকে যেনো হকের পক্ষের সাক্ষী হিসেবে গণনা করা হয়। হকের পক্ষের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। হককে গোপনকারী হিসেবে যেনো গণনা না করা হয়। আপনি যেহেতু আমাদেরকে আপনার দীন বোঝার তওফিক দান করেছেন, আপনার দীনের দাওয়াত কবুল করার তাওফীক দান করেছেন আর আমাদেরকেও দীনের খেদমতের জন্য কবুল করেছেন, তাই আমরাও সর্বাবস্থায় হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেবো। অন্তর দিয়ে যবান দিয়ে এবং আমলের মাধ্যমেও। তাই হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নাম হকের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে লিখে দিন। আর ওই সমস্ত লোকদের সঙ্গে কখনো আমাদের নাম লিখবেন না, যারা হক স্পষ্ট হওয়ার পরও নিজের কথা ও কাজে হকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার পরিবর্তে হককে গোপন করেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনিও তো আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। দীনের দাওয়াত কবুল করেছেন। আনসারুল্লাহ হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তাই নিজের সাহস, আকাঙ্খা ও অনুভূতিকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেখুন। নিজের অন্তরের ভেতরে একটু তাকান। নিজের কথা ও কাজ নিয়ে একটু ভাবুন। আপনি দিন রাত কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন? আপনি সঠিক পথে আছেন তো?

নিজের রবের সঙ্গে আপনি নিজে যে অঙ্গিকার করেছিলেন তা সামনে রেখে ইনসাফের সঙ্গে নিজের হিসাব কষে দেখুন যে, আপনার চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, ধন-দৌলত এবং দেহ ও প্রাণের শক্তি কোথায় ব্যয় হচ্ছে? অথচ আল্লাহ তাআলা বর্তমান সময়ে নিজের কোটি কোটি বান্দা থেকে নিজের দীনের খেদমতের জন্য আপনাকেই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই মনোনয়নকে আপনি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারছেন তো?

তাওবাকারী মুরিদ

আপনি নিজেকে নিজে দীনদার মনে করেন এবং আশা করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার দীনদারির পুরস্কার দান করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনার আশাকে পূর্ণ করুন। কিন্তু কখনো কি আপনি নিজের দীনদারিকে যাচাই করে দেখেছেন? আপনি তো আপনার দৃষ্টিতে ধার্মিক এবং দীন মুতাবিক সঠিকভাবে আমল করছেন, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আপনার ধর্ম পালন শুদ্ধ হচ্ছে কি না ভেবে দেখেছেন? আপনার ধার্মিকতা কি আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে?

হাশরের ময়দানে আপনার সফলতা ও মুক্তির ফায়সালা আপনার ধারণার ভিত্তিতে হবে না। তাই আপনি আপনার দৃষ্টিতে দীনদার হলেই মুক্তি পেয়ে যাবেন এই ধোঁকায় পড়ে থাকা উচিত নয়। আল্লাহর দরবারে আল্লাহর কাছে আপনি কেমন সে হিসেবেই ফায়সালা হবে। হতে পারে দুনিয়াতে আপনি নিজেকে দীনদার মনে করছেন, মানুষও আপনাকে শুধু ধার্মিক নয় বরং ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনার দীনদারি আল্লাহর পছন্দনীয় দীনদারি নয়। কোনো কিছু করার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন আপনার কাজটি দীন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা। কোনো কাজ আপনার কাছে ভালো মনে হলেই তা ভালো হয়ে যায় না। কুরআন হাদিসের আলোকে কাজটিকে যাচাই করে দেখুন।

হাশরের ময়দানে আপনার দীনদারির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে। সারা জীবনের সব চেষ্টা ও সাধনার ফলাফল আপনার সামনে চলে আসবে। এই ফলাফল হতে পারে আপনার খুশির কারণ অথবা অন্তহীন দুঃখ ও ভীতির কারণ। কেয়ামত আমাদের কাছেই। এর জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া বা উদিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেয়ামত আমাদের জীবনে যে কোনো সময়েই শুরু হয়ে যেতে পারে। আপনি চোখ বন্ধ করলেই এই স্বপ্নের জগৎ মিলিয়ে যাবে। আর আপনার চোখ যে কোনো মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কার মৃত্যু কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। যে কোন অবস্থায় আমরা মারা যেতে পারি। মারা যাওয়ার সাথে সাথে দুনিয়াকে ঘিরে এতো চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্মের পরিকল্পনাসহ সব ব্যস্ততার অবসান ঘটবে। এরপর ভালো কাজের কোনো সুযোগ আপনি পাবেন না। ভেবে দেখুন কত মূল্যবাণ সময় হেলায় নষ্ট করছেন।

আপনার ধারণা অনুযায়ী আপনি দীনের ওপর আমল করছেন। সমাজেও একজন দীনদার মুসলমান হিসেবে আপনাকে গণ্য করা হয়। মানুষ আপনার থেকে দীন বোঝার চেষ্টা করে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নিজের দীনদারীর খোঁজখবর নিন। নিঃসন্দেহে এটা আমার দুঃসাহস। আপনি হয়তো

ভাববেন কোনো স্বার্থে বা অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার দীনদারি নিয়ে আমি প্রশ্ন ওঠাচ্ছি। আপনার প্রতি কল্যানকামীতা এবং ভালোবাসা থেকেই আপনাকে এই উপদেশ দিচ্ছি। আমি যদি আপনার আমলের ব্যাপারে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা না করি, তাহলে আপনার ওপর জুলুম করা হবে। কারণ আপনি দীন ভেবে সারা জীবন অনর্থক কাজ করে যাবেন এবং হাশরের মাঠে পৌছে দেখবেন আপনার পুরো জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেনো আমাদেরকে এবং আপনাকে এই সময়ের অবমাননা থেকে রক্ষা করেন, যখন প্রতিকারের কোনো উপায় থাকবে না।

আজই চিন্তা-ভাবনা এবং আমল করার সময়। ভাবুন এবং নিজেকে বদলে ফেলুন। কাল কেয়ামতের দিন আমল করার কোনো সুযোগ থাকবে না। সেদিন শুধু পরিণামই দেখতে হবে।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ

প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য
সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে।[১০১]

নিঃসন্দেহে ইসলামের নাম ধারণকারীদের মধ্যে এমন লোকদের সংখ্যাও খুব কম নয় যারা এই পরকালের চিন্তা-ভাবনা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। তাদের শুধু এই জীবনের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসায় বিভোর হয়ে আছে। তারা কিছুতেই পরজীবনের চিন্তায় এই জীবনের সুখ ছাড়তে চায় না। তারা জীবন উপভোগ করতে পারাকেই সফলতা মনে করে। তাদের কথা ভেবে আমাদের লাভ নেই। আজ আমি শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি নিজেই নিজের আমল ও কাজকর্মগুলো যাচাই করে দেখুন। হাশরের দিনের কথা ভাবুন।

আপনার নেক আমল যদি আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা অনুযায়ী না হয় তাহলে আল্লাহ না করুন এমন যেনো না হয় যে, কাল হাশরের দিন ফায়সালার দিবসে আপনার দীনদারিকে আপনার মুখের ওপরই ছুড়ে মেরে তিনি বললেন, তুমি আমার দীনকে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক পালন করেছো। নিজের প্রবৃত্তিকে আমার দীনের অনুগত বানাওনি। তুমি মুমিন নও। আমার রসূল সা. তোমাদেরকে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার
প্রবৃত্তি ওই ধর্মের অনুগত না হবে যা আমি নিয়ে এসেছি।

---

[১০১] সূরা হাশর (আয়াত: ১৮)

দীনদারির সাথে জীবনযাপন কারীরা সাধারণত তিন ধরণের হন,

১. দুনিয়া ছেড়ে দেয়া।

২. দুনিয়ার সঙ্গে দীন।

৩. দীনের জন্য দুনিয়া।

মুসলমানদের মধ্যে এই তিন ধরণেরই লোক রয়েছে। আর এ তিন ধরণের লোকই নিজের অবলম্বনকৃত পদ্ধতিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দলীলাদি একত্রিত করার চেষ্টা করে বেড়ায়।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি হলো, দুনিয়া মুমিনের জন্য একটি বন্দীশালা। মুমিনের আসল বাড়ি হলো আখেরাত। তার সবচে বড় শত্রু হলো, তার নিজের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির চাহিদার টুটি চেপে ধরতে হবে। তার কামনা পূরণ করা যাবে না। তাকে কষ্ট দেয়া এবং দুনিয়ার প্রতিটি নেয়ামত, স্বাদ-আহ্লাদ, আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখাই তার উন্নতির সোপান।

দীনদার ওই ব্যক্তি যে পার্থিব সব কামনা থেকে দূরে থাকে। দুনিয়াদারদের থেকে আলাদা জীবনযাপন করে। পার্থিব মু'আমালার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। দুনিয়ার যিন্দেগী এবং তার অপরিহার্য বিষয়াবলী থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে; বরং সর্বদাই যিকির-ফিকির, তাছবীহ-তাহলীল ও ইবাদত-সাধনায় নিমগ্ন থাকে।

দুনিয়ার যিন্দেগীতে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই মুসাফিরের মতো, যে ভরদুপুরের রৌদ্রে কিছু সময় বিশ্রামের জন্য কোনো গাছের ছায়ায় বসেছে। ওই ব্যক্তি দীনদার নয় যে মৃত দুনিয়ার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় এবং তা লাভ করার জন্য মনে মনে নানান পরিকল্পনা করে। দীনদার হলো ওই ব্যক্তি, যে শুধু আখেরাত নিয়েই ভাবে। আখেরাত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর চিন্তা ভাবনা থেকে সে তার মস্তিস্ককে মুক্ত রাখে।

যখন মানুষ অক্ষম ও অথর্ব হয়ে যায়, নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না. তখন দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদকে ছেড়ে দেয়া এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে মুখ গুটিয়ে নেয়ার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। পরকালের সফলতা তো সেই সব যুবকদের জন্য যারা অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকার পরও তা ছেড়ে দেয় এবং দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকাংশই সঠিক। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বুযুর্গদের বাণী ও আমলও এই চিন্তাধারাকে সমর্থন করে। এই উম্মতের ওলী, সুফী এবং সালেহীনদের জীবন-চরিতের যে চিত্র আমরা জানতে পারি তা থেকেও এই চিন্তাধারার সমর্থন পাওয়া যায়।

এই মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করার সাহস কারো নেই। তারা দীন

যথাযথভাবে বোঝেন নি এমন অপবাদ তাদেরকে দেয়ার কল্পনাও কেউ করতে পারে না। কিন্তু এই তরিকা গোটা উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। কুরআন ও সুন্নাহর সামগ্রিক শিক্ষা এর সমর্থনও করে না। ইসলাম মানুষের জন্য যেমন জীবন চায় তা বৈরাগ্যের জীবন নয়। এ জন্যই নবী সা. ইরশাদ করেছেন,

لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.

ইসলামে বৈরাগ্য নেই।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীন পালন করা। দুনিয়ার নেয়ামত এবং উন্নতি উপেক্ষা করার মতো কোনো বস্তু নয়। দুনিয়ার অসংখ্য নেয়ামত আল্লাহ তার বান্দাদের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এর সাথে সাথে যতটুকু সম্ভব হয় দীন পালন করতে হবে। দীন কখনো দুনিয়া ছেড়ে দেয়ার শিক্ষা দেয়া না; বরং তা দুনিয়াকে ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। ইসলাম কখনো নিজের প্রয়োজনে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করতে বারণ করে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু দিক সঠিক রয়েছে এবং বাহ্যত এই চিন্তাধারাকে খুব সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণ মনে হয়। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী মানুষ পার্থিব সফলতাও অর্জন করতে পারবে আবার নিজের আখেরাতের জন্যও কাজ করতে পারবে। দুনিয়াও হাত থেকে ফসকে যাবে না আবার পরকালে মুক্তি পেয়ে যাওয়ার আশাও করা যায়।

আপনি আনন্দিত হন এই ভেবে যে, আপনি দুনিয়াকে সাথে রেখেই দীন পালন করতে পারছেন। দুনিয়ার জীবনও সুখে শান্তিতে কাটাচ্ছেন। আপনি হয়তো ইখলাসের সাথেই দীনের ওপর চলার সংকল্প করেছেন; কিন্তু শয়তান তার চতুরতার মাধ্যমে আপনাকে দীন থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু দুনিয়াই আপনার মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়ে গেছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনিই নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখুন। নিজের পরকালীন ও চিরকালীন ভবিষ্যতকে আপনি কতো কম গুরুত্ব দিচ্ছেন সে সম্পর্কে ভাবুন।

একটু ভাবলেই আপনি বুঝতে পারবেন শয়তান কতো বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনাকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ, প্রবৃত্তির ধোঁকা এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র আপনাকে কতো নির্মমভাবে প্রতারিত করছে। ভেতরগত দিক থেকে আপনি দুনিয়া পূজারী। দীন শুধু আপনার খোলস। প্রবৃত্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আপনাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। আপনার কাছে দুনিয়াই সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য। দীনকে আপনি শুধু শান্তনা হিসেবে ব্যবহার করছেন অথবা দীন শুধু আপনার দুনিয়া উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম।

নিঃসন্দেহে আপনি মানুষকে দীনের দিকে ডাকেন। নিজের প্রাজ্ঞ কথাবার্তা এবং মিষ্টি ভাষায় তাদেরকে প্রভাবিত করেন। স্টেজ থেকে আপনি দীনের

ব্যাপারে সুবিন্যস্ত আলোচনা করে থাকেন। দীনি বিষয়ে আপনার বক্তব্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত। এ কারণে দেশে আপনার পরিচিতি আছে। আপনার লেখা ও ভাষণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনাও হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কাছ থেকে আপনাকে দেখি অথবা আপনার কৃত্রিম চেহারার পর্দা উল্টে যায় এবং আপনার প্রকৃত চেহারা প্রকাশিত হয়, তখন মনে হয়, দীনদারি হলো আপনার পেশা। দীনদারিকে একটি কৌশল হিসেবে আপনি আগলে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি একজন দুনিয়া পূজারী। দুনিয়াকে ঘিরেই আপনার সব চিন্তা-ভাবনা। দুনিয়া উপার্জনের ভাবনাই সব সময় আপনার কাছে প্রাধান্য পায় । দূর্ভাগ্যবশত দীনকে আপনি এর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আপনি ইহুদিদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন যে, তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিক্রি করে দিতো। নিঃসন্দেহে আপনি অল্প মূল্যে বিক্রি করছেন না। আপনি অধিক মূল্য উসূল করছেন। আবার আপনি এটা ভেবে আনন্দিত হন এবং গর্ব করে থাকেন যে, আপনার দ্বারা দীনের খেদমত হচ্ছে। দীনের খেদমতই আপনার সারা দিনের ব্যস্ততা।

আপনি কেনো ভাবেন না আপনার কাছের লোকগুলো, সারাদিনের সঙ্গী-সাথীরা আপনার ব্যাপারে কী ধারণা পোষণ করে? এই লোকগুলো আপনাকে কাছ থেকে দেখার পরও দীন থেকে কেনো দূরে সরে যাচ্ছে? দীন কেনো তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে? তারা আপনার মুআ'মালার ব্যাপারে আশ্বস্ত নয় কেনো? তারা আপনাকে দুনিয়াদার এবং সম্পদ পূজারী কেনো বলে? তারা আপনার দীনদারিকে ঢং বলে কেনো আখ্যায়িত করে?

আপনি আপনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে তো ধোঁকা দিচ্ছেনই, নিজের মুখের জোরে আল্লাহর বান্দাদেরও নীরব করে রাখছেন। কিন্তু তাদের অন্তরকে আপনি আশ্বস্ত করতে পারছেন না।

হায় আল্লাহ! নিজের চাল-চলন নিয়ে ভাবুন। আল্লাহ আপনাকে দীনের ইলম দান করে সম্মানিত করেছেন। অথচ আপনি তাকে দুনিয়া দ্বারা বদলে দিয়েছেন। চিরস্থায়ী আখেরাতকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে পড়ে গেছেন। এখন আপনার ব্যক্তিত্বের কোনো আকর্ষণ নেই। দীনের জন্য আপনার কোনো ব্যথা নেই। কোনো ভালোবাসা নেই। দীনের জন্য কিছু করার অস্থিরতাও নেই।

যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা শুধু এই দুনিয়ার জন্যই এবং দুনিয়া উপার্জনের সুযোগ যেনো আপনার হাতছাড়া না হয়ে যায় সেই জন্যই।

নিঃসন্দেহে আপনি দান-খয়রাত করেন। দীনের নামে খরচ করেন। দীনের খেদমতের জন্য কিছু সময়ও ব্যয় করেন। সম্ভবত এসব আপনি এই জন্য করে

থাকেন, যেনো সমাজে আপনার একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়। পরিচিতি সৃষ্টি হয় এবং আপনার সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে। আপনি কি মনে করেন আপনার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা দুনিয়া কামাইয়ের পেছনে ব্যয় করার পাশাপাশি কিছু টাকা দীনের জন্য ব্যয় করলে এবং কিছু সময় দীনি বিষয়ে আলোচনা করলেই দীনের খেদমতের হক আদায় হয়ে যাবে? আল্লাহর কাছে আপনি দীনদার হওয়ার স্বীকৃতি পেয়ে যাবেন? প্রকৃত শুভাকাঙ্খীর কথা শুনে রেগে যাবেন না। রেগে গেলে আপনিই বঞ্চিত হবেন। আজই সুযোগ, ভেবে দেখুন। নিজের ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকুন। হেদায়েত পাওয়ার পর এটাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং দীনের পরিবর্তে দুনিয়াকে নিজের লক্ষ্য বানানো নিকৃষ্টতম দূর্ভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ আপনাকে এর থেকে হেফাজত রাখুন। আমীন।

নিশ্চই আপনার পক্ষেও কিছু মানুষ আছে। তারা আপনার চাল-চলন দেখে প্রভাবিত হয়। সরল হওয়ার কারণে আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে আশ্বস্ত হয়ে যায়। আপনার প্রশংসা করতে থাকে। আপনার সহযোগিতা করতে শুরু করে। কিন্তু আপনার প্রকৃত কল্যাণকামী ওই ব্যক্তি যে কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নির্ভয়ে আপনার সমালোচনা করে। তার তিক্ত সমালোচনা সঠিক। তার অনুমান সঠিক। সে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করছে। আজকের বড় ক্ষতি আগামীকালের সাধারণ থেকে সাধারণ ক্ষতির মোকাবেলায় কিছুই না। আজকের অপমানকে স্বাচ্ছন্দে বরণ করে নিন এবং কাল হাশরের মাঠে যেনো আপনাকে অপমানিত না হতে হয় সেই চেষ্টা করুন।

আপনি মানুষকে বলেন, দীন কখনো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার শিক্ষা দেয় না। তা পার্থিব উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে না। দীন জশ-খ্যাতি ও সম্পদ উপার্জনের প্রতিবন্ধক নয়।

আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কেউ দীনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে, দীনের খোলস পরে দুনিয়া কামাইয়ের পেছনে পড়ে থাকে আর কেউ দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করতে চায় শুধু সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করে পরকালকে সুন্দর করার জন্য। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে অনেক প্রার্থক্য আছে। এর সঠিক ফায়সালা তো কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলাই করবেন। কিন্তু আল্লাহর বান্দারাও কোনো না কোনো পর্যায়ে এটা টের পেয়ে যায় যে, আপনি আপনার দুনিয়াকে দীনের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন নাকি দীনকে দুনিয়া উপার্জনের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। এই উপলব্ধিকে সবচে বড় নেয়ামত ভাবুন এবং এর দ্বারা উপকৃত হন।

আপনি কেনো ভাবেন যে, আপনার ব্যাপারে আপনার ধারাণাই শুধু সঠিক। আপনি যদি আপনার শেষ পরিণাম ভালো করতে চান, তাহলে খোলা মনে মানুষের কথা শুনুন। তাদের মতামতগুলোকে গুরুত্ব দিন। নিজেকে

সংশোধনের ব্যাপারে তাদের সাহায্য গ্রহণ করুন।

তৃতীয় শ্রেণীর দীনদাররা ভাবেন, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা যেমন সঠিক নয়, তাতে ডুবে যাওয়াও সঠিক নয়। দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। এখানে আল্লাহ তাআলা যা কিছু দিয়েছেন, যে অবস্থায় রেখেছেন এবং যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, এর সবই পরীক্ষা। পরীক্ষার সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আপনার ব্যর্থতা। আবার পরীক্ষার উপকরণকে সব কিছু ভেবে এতে ডুবে যাওয়া এবং পরীক্ষার পরবর্তী চিরকালীন পরিণামের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়াও নির্বুদ্ধিতা।

দুনিয়া এবং দুনিয়ার নেয়ামতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শুধু এইটুকু যে, আপনি এর মাধ্যমে আপনার পরকালীন জীবনকে সুন্দর করবেন। দুনিয়ার সব উন্নতি, নেয়ামত এবং শান্তিই আপনি পাবেন। তবে এগুলোর কোনোটা যেনো কখনো আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য না হয়। মুসাফির রাস্তার সব জিনিস থেকেই উপকৃত হয়, কিন্তু সবসময় তার লক্ষ্য থাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা। যদি আপনার জীবন-সফরের উদ্দেশ্য হয় নিজের আখেরাতকে সুন্দর করা তাহলে এই জীবনে প্রতিটি বস্তুর সাথে ততটুকুই সম্পর্ক রাখুন যতোটুকু সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের মূল লক্ষ্য অর্জন করা যায়। সফরের সময়ে প্রাপ্ত নেয়ামতরাজি ও আরাম আয়েশের পেছনে পড়ে যদি নিজের গন্তব্যই ভুলে যান এবং সফরকেই গন্তব্য বানিয়ে ফেলেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি নির্বোধ।

এ চিন্তাধারার মানুষ দীনের প্রতিটি কাজে শরীক হবে। কারণ সে সব সময় আখেরাতের কথা ভাববে। আখেরাত লাভের কোনো সুযোগ সে নষ্ট হতে দেবে না। আখেরাতের প্রতি সে আগ্রহী হবে। আল্লাহর রসূল সা. এক হাদীসে এ বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের অনেক আয়াত এবং অন্য অনেক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا.

> নিশ্চই এই দুনিয়া খুবই সুমিষ্ট, সবুজ-শ্যামল ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা তাতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। যাতে যাচাই করতে পারেন তোমরা কেমন আমল করো। তাই দুনিয়া থেকে বেঁচে থেকো।[১০২]

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চিন্তাধারার মধ্যে বাহ্যত অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু

---

[১০২] সহীহ মুসলিম

উভয়টির মধ্যে সূক্ষ্ম হলেও বড় পার্থক্যও রয়েছে। দ্বিতীয় চিন্তাধারার মানুষ সব কিছুতে দুনিয়াবি ফায়দা খুঁজবে। দুনিয়ার ফায়দা হিসেবেই কোনো কাজ তার কাছে বেশি বা কম গুরুত্ব পাবে। আর তৃতীয় চিন্তাধারার মানুষ প্রতিটি বস্তুকে আখেরাতের ফায়দা হিসেবে মাপবে। আখেরাতের ফায়দা হিসেবেই তার মূল্য নির্ধারন করবে। একজন দুনিয়ার সাথে সাথে দীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করবে। আর অপরজন দীনের খাতিরে দুনিয়াকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, উভয়ের পরিণতি এক হবে?

হাশরের মাঠের এক প্রশ্ন

আল্লাহর রসূল সা. ইরশাদ করেন, হাশরের ময়দানে সবাইকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। এই পাঁচ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ এক কদমও নড়তে পারবে না।

১. সে তার নিজের জীবনকে কী কাজে ব্যয় করেছে?

২. নিজের যৌবনকালকে কোথায় খরচ করেছে?

৩. ধন-সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে?

৪. উপার্জিত সম্পদ কী কাজে খরচ করেছে?

৫. যে জ্ঞান সে অর্জন করেছিলো তার ওপর কতটুকু আমল করেছে?

সেই দিনটি খুবই নিকটবর্তী যে দিন আমি এবং আপনি হাশরের ময়দানে দাঁড়াবো এবং এই প্রশ্নগুলো আমাদের করা হবে। সেই কঠিন সময়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে যে তার দুনিয়ার জীবনে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তৈরি করেছে, এই প্রশ্নগুলোর কথা আগে থেকেই ভেবেছে এবং সে অনুযায়ী খুব সর্তকতার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছে।

আপনাকেও জীবন দান করা হয়েছে। যৌবনের নেয়ামত দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে। আপনিও ধন-সম্পদের মালিক। আপনিও সম্পদ খরচ করেন। আপনারও অনেক জ্ঞান রয়েছে। একটু ভাবুন! আপনি কি উত্তর তৈরি করেছেন? কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহকে খুশি ও সন্তুষ্ট করার মতো উত্তর কি আছে আপনার কাছে?

আসল জীবন তো পরকালের জীবন। দুনিয়ার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অস্থায়ী। আর পরকালের জীবন হলো চিরস্থায়ী। সেখানের সুখ-দুঃখ সবই চিরস্থায়ী। দুনিয়ার এই অল্প কয়েকদিনের জীবনে আপনার প্রতিপালক আপনাকে সুযোগ এবং অবকাশ দিয়ে রেখেছেন যে, আপনি আপনার ইচ্ছা মতো পরকালকে যেমন খুশি তেমন জীবন সাজিয়ে নিন।

এ জীবনে আপনি চিরকালীন সুখ ও শান্তিময় জীবনও তৈরি করতে পারেন

আবার চিরকালীন দুঃখ-কষ্টও তৈরি করতে পারেন। প্রতি মুহূর্তেই আপনি দুনিয়ার জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং আখেরাতের পরিণামের নিকটবর্তী হচ্ছেন। আপনি এ ব্যাপারে সচেতন হোন আর নাই হোন, এ জীবনে আপনাকে এই পাঁচ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতেই হবে। এর যথাযথ উত্তর দিয়ে আপনি আল্লাহর অনুগ্রহে উত্তম পরিণামের দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে পারেন, আবার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামেও যেতে পারেন।

কথা হচ্ছে আপনার জীবন নিয়ে। এর সম্পর্ক শুধু আপনার সঙ্গেই। আপনিই পারেন এই জীবনটাকে সুন্দর করতে। অন্য কেউ যদি আপনাকে সংশোধন করার জন্য নিজের সবকিছু বিলীন করে দেয়, তবুও আপনার কোনো লাভ হবে না। আর যদি আপনি নিজে নিজের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে চান, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই আপনার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এটা নিজের সমস্যা। আপনি এখন চিন্তা ভাবনা করুন আর নাই করুন, প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে ভেবে পেরেশান হন আর নাই হন, এক দিন আপনাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেই হবে।

এ কথাও জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের মু'আমালা হলো ওই মহান সত্ত্বার সাথে যিনি সব জানেন। যার কাছ থেকে কেউ অণু পরিমাণ কিছুও গোপন করতে পারবে না। আসমানের বিশালতায় হোক, যমিনের নীচে হোক, পাহাড়ের গুহার ভেতরে হোক আর সমুদ্রের অতল গহ্বরেই হোক, যেখানে যা কিছু হয়, সবই তার ইলমের আওতাধীন। তিনি আদিল বা ন্যায়পরায়ণ। হাকীম বা প্রজ্ঞাবান। তার দরবারে কারো ব্যাপারে কোনো বেইনসাফী হয় না। আপনি যদি অণু পরিমাণ নেক আমল করে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবে এর প্রতিদান পাবেন। যদি অণু পরিমাণ বদ আমলও করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এর শাস্তিআপনাকে ভোগ করতে হবে। আপনি তার থেকে পালাতে পারবেন না। তাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না। মিথ্যা বয়ান অথবা চাপার জোরে তাকে আশ্বস্তও করতে পারবেন না। আপনি আর দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগও পাবেন না। আল্লাহ ফয়সালা করলে সেই ফায়সালাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতাও আপনার নেই।

হাশরের ফায়সালা চূড়ান্ত। ভেবে দেখুন, আপনি কেমন ফায়সালা কামনা করেন। এখনই আপনার ভাবার সুযোগ। এখন আপনি আমল করার স্থানে রয়েছেন। কাল আপনাকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে আর আমল করার সুযোগও চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে।

আপনাকে কি কখনো এই প্রশ্ন ভাবিত করেছে যে, আপনি সম্পদ কোথায় খরচ করেছেন? বাহ্যত এটা খুব সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু বাস্তবে এটা কোনো সাধারণ প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর ভিত্তি করেই আপনার আখেরাত

ভাল হবে অথবা মন্দ হবে। আজ আমরা শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ভেবে দেখি। দীনদার এবং অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অনেক সময় এই প্রশ্নের গুরুত্ব অনুভব করে না। ভেবে দেখুন আমরা যেভাবে এবং যে সকল কাজে আমাদের সম্পদ খরচ করছি এ ব্যাপারে কাল আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে।

আপনি নিয়মিতই যাকাত প্রদান করে থাকেন। দান-সদকাতেও খরচ করেন। কখনো সংকীর্ণ মনোভাব এবং কৃপণতা করেন না। কিন্তু এ ব্যাপারেও একটু আশ্বস্ত হয়ে নিন যে, আপনি যেসব খাতে এবং যেভাবে খরচ করছেন তা পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হচ্ছে কী না। এমন তো নয় যে, দীনের প্রয়োজন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি একটা আর আপনার কর্মপন্থা ভিন্ন কিছু।

আপনি হজ আদায় করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত সম্পদ দান করেছেন যে, বারবার আপনি নফল হজ করছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাইতুল্লাহতে উপস্থিত হওয়া একজন মুমিনের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আপনি বারবার এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমণ্ডিত হচ্ছেন। কিন্তু আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন বিধবা রয়েছে, যার কাছে খাবারের বাসি রুটি পর্যন্ত নেই। বাসি রুটিটাই তার অনেক বেশি প্রয়োজন। আপনার এলাকাতেই একজন মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তি রয়েছে। যার কয়েকটি ছেলেমেয়ে। খুবই দূরাবস্থা। অভাব-অনটনে মারা যাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্মীয় জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত। আপনার এলাকাতেই অসহায় তরুণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। না তাদের রুজি-রোজগারের কোনো ব্যবস্থা আছে না শিক্ষা-দীক্ষা আছে। জীবন ধারণের জন্য তারা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আপনার দারস্থ হয়েছে, বিধবা নারীও তার দূরাবস্থার কথা আপনাকে জানিয়েছে এবং নওজোয়ানদের এই দিশেহারা অবস্থার ব্যাপারেও আপনি অবহিত আছেন, কিন্তু আপনি তাদের জন্য কিছুই করেন নি। অথচ আপনি বাইতুল্লার নফল যিয়ারতের কথা ভাবছেন।

বর্ষার রাতে আমজাদ শাহকে আপনি আপনার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। তার স্ত্রী আপনার কাছে কাকুতি মিনতি করে বলেছিলেন, আমাদের দু' মাসের সুযোগ দিন। আমরা দু' মাসের মধ্যেই আপনার বাড়ি খালি করে দেবো। কিন্তু আপনি জোর করে ধাক্কা দিয়ে তাদের বের করে দিয়েছেন। তার সঙ্গে তার নিষ্পাপ শিশুরাও কাঁদছিলো। কিন্তু আপনার মনে দয়া হয় নি। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে তারা গাছের নীচে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে। তাদেরকে ক্এভাবে তাড়িয়ে আপনি পরের দিনই ওই বাড়িটি মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। আপনার ধারণায় আপনি একটি উত্তম কাজ করেছেন। এই

কাজটি আপনার দ্রুত করা দরকার ভেবেই আপনি উপরোক্ত নির্মম কাজগুলো করেছেন।

আপনার এলাকায় বন্যা হলো। মানুষের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেলো। মানুষ খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়লো। আপনি তাদের সাহায্য করতে পারতেন। দরিদ্র অভাবী ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেন। যাদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেছে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন। বন্যায় অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতেন। আপনার কাছে আবেদনও করা হয়েছিলো। কিন্তু আপনি কাউকে একটি কানা কড়িও দেননি। সবাইকে বলেছেন, এসব ছোটো খাটো কাজে আপনি টাকা নষ্ট করতে চান না। আপনার সামনে অনেক বড় বড় কাজ আছে। আপনি ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটানোর মহতী লক্ষ্যে কয়েক লক্ষ দীনি কিতাব ছাপানোর পরিকল্পনা করছেন।

আপনার অফিসের, ফ্যাক্টরির কত কর্মচারী অভাবে বিপর্যস্ত। কতো জন অভাবের তাড়নায় অপরাধমূলক কাজে জাড়িয়ে পড়ছে। তারা আপনাকে নিজেদের দূরাবস্থা এবং পেরেশানীর কথা শোনাতে চেয়েছে। আপনি তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, আপনি মুসাফিরদের কষ্ট লাঘবের জন্য মুসাফির খানা নির্মাণ করছেন।

আপনাদের নিজেদের জীবনেরই কয়েকটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি একটু ভাবুন, কাল হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি সম্পদ কোথায় খরচ করেছো? তখন কি আপনি আপনার এসব কাজের কথা বলে আল্লাহকে খুশি করতে পারবেন? আপনার সম্পদ কি আসলেই সঠিক খাতে ব্যয় করেছেন? আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি দীনের চাহিদা অনুযায়ী খরচ করছেন? আপনার এই দান-সদকা কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে?

আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো ভাবে খরচ করলেই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। বরং এটাও আপনার দায়িত্ব যে, আপনি আপনার সম্পদ সঠিক ও সময়োপযোগী খাতে ব্যয় করবেন। যথোপযুক্ত স্থানে খরচ করবেন। যখন যে ক্ষেত্রে আপনার সম্পদের সবচেয়ে বেশি দরকার তখন সে ক্ষেত্রটিকেই প্রাধান্য দেবেন। নিঃসন্দেহে সম্পদ আপনার। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করতে চান, তাহলে এটাও জেনে নিন যে, আপনি কোথায় ব্যয় করবেন এবং কীভাবে ব্যয় করবেন। যদি নিজের আত্মার প্রশান্তি এবং মনোতৃপ্তির জন্য খরচ করেন তাহলে আল্লাহর প্রতিদানের আশা না করাই ভালো। আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান তো ওই ব্যক্তিই পাবে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী খরচ করে। দীনের দেখানো

পথে খরচ করে। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো তারা যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে এই চিন্তার ভীত থাকে যে, তারা যেখানে খরচ করলো এবং যেভাবে খরচ করলো, তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়েছে কী না। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ

যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে।[১০৩]

হযরত আয়েশা রা. রসূলে কারীম সা.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি তারা, যারা চুরি, যিনা এবং মদ পানে লিপ্ত হবে আবার আল্লাহকেও ভয় করবে? রসূল সা. বললেন, হে সিদ্দীকের মেয়ে! না, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহকে ভয়ও করে।

আপনি এবং আপনার প্রতিবেশী

হযরত সাহাল তাসতরী র. তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তার আলোকোজ্জ্বল জীবনের প্রতিটি ঝলক আজও মানুষকে পথ দেখাচ্ছে। হযরতের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিলেন অগ্নিপূজক। হযরতের বাড়ি ঘেঁসেই ছিলো তার বাড়ি। হযরত নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই প্রতিবেশী কেনো যেনো হযরতের প্রতি বিদ্বেষী ছিলো। প্রতিদিন রাতে সে তার ঘরের আবর্জনা দেয়ালের ওপর দিয়ে সাহাল তাসতরী র. এর বাড়িতে ফেলতো।

হযরত তাসতরী র. তো একজন মানুষই ছিলেন। এই ব্যবহারে স্বভাবতই তিনি কষ্ট পেতেন। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এবং নীরবে সেই আবর্জনা নিজের হাতে বাইরে ফেলে আসতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এভাবেই চলতে লাগলো। অগ্নিপূজক আবর্জনা ফেলতো আর হযরত নিজে তা পরিষ্কার করতেন। হযরত অগ্নিপূজকের এই খারাপ মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সে তার এই কাজ বন্ধ করে নি। বাড়ির লোকজন খুব বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে হেস্তনেস্ত কিছু একটা করতে চাইতো, কিন্তু হযরত সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়ে থামিয়ে দিতেন। তিনি নিজে রাতের বেলায় অগ্নিপূজকের ফেলা আবর্জনা পরিস্কার করতেন যেনো বাড়ির অন্যদের কষ্ট না হয়।

একবার হযরত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থা এতোটা খারাপ হলো যে তিনি বেঁচে থাকার আশা প্রায় ছেড়েই দিলেন। তখন একদিন তিনি প্রতিবেশী

---

[১০৩] সুরা মুমিনুন (আয়াত: ৬০)

অগ্নিপূজককে ডেকে আনলেন এবং তাকে বললেন, ভাই! আমি এতদিন সুস্থ ছিলাম, তুমি রাতেরবেলা যে আবর্জনা ফেলতে তা আমি রাতের বেলাই পরিস্কার করে ফেলতাম। এখন আমার অবস্থা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো। আল্লাহর ওয়াস্তে এখন থেকে আর তুমি এমনটি করো না। কারণ আমার মৃত্যুর পর আমার বাড়ির লোকেরা তোমার এই কাজ আর সহ্য করবে না। সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা তোমাকে অনেক কষ্ট দেবে। আমি সারাজীবন তোমার এ কষ্ট সহ্য করেছি। এখন অন্তত তুমি এ কাজ থেকে বিরত থাকো।

হযরতের এই কথা শুনে অগ্নিপূজক বুঝতে পারলো এতো দিন কতো উন্নত চরিত্রের একজন ব্যক্তির ওপর সে জুলুম করে এসেছে। লজ্জায় সে মাথা নীচু করে বললো, হযরত! আাপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। বাস্তবেই আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আপনি যে ধৈর্যের সাথে আমার এ আচরণ সহ্য করেছেন তার তুলনা নেই। আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ধৈর্যের এই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত একমাত্র ইসলাম ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। হযরত আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং কালিমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিন।

হযরত তার হাত অগ্নিপূজকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অগ্নিপূজকের হাত নিজের হাতে নিয়ে তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পড়ালেন,

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রসূল।

এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়ও হযরতের উত্তম আচরণে এক কঠিন হৃদয়ের অধিকারী অগ্নিপূজক ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলো। হযরতের ধৈর্য এবং উত্তম ব্যবহার অগ্নিপূজকের অন্তর পাল্টে দিয়েছিলো। আর একজন আদর্শ মুসলমানের উত্তম চরিত্র দেখে সে ইসলামের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয়েছে।

আমাদের মধ্যে আরও কতো মানুষ এমন আছে, বছরের পর বছর যার প্রতিবেশী হিসেবে কোনো অমুসলিম বসবাস করছে। তাদের ব্যাপারে একটু ভাবুন। ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের বাড়ির আশে পাশে অমুসলিমরা বসবাস করে। আপনারা যা কিছু করছেন তার সবকিছু তারা দেখছে। আপনার কোনো কাজ, কোনো ব্যবহার, কোনো মু'আমালা, কোনো কথা, কোনো স্বভাব যেনো আপনার ধর্মের ব্যাপারে খারাপ ধারণা তৈরি না করে। আপনার প্রতিটি আচরণ যেনো আপনার সাথী ও প্রতিবেশীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তারা যেনো আপনার ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

আপনার কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে হয়তো মানুষের অন্তর ইসলামের প্রতি

আকৃষ্ট হবে অথবা তারা ইসলাম থেকে আরও দূরে সরে যাবে। প্রতিবেশীকে উত্তম আচরণে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা তার একটি হক। সে যেনো আপনার ঘর থেকে, ব্যবহার থেকে, মু'আমালা এবং কথাবার্তা থেকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারে। আপনার চরিত্র দেখে সে যেনো ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।

হযরত সাহাল তাসতরী র. তো দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের আলোচনা ও লেখায় তিনি আজও জীবিত। তার ঘটনাগুলো আমাদের মধ্যে ভালো কাজ করার উদ্যম তৈরি করে। তাদের ঘটনাগুলো বই পত্রে পড়ে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের জন্য এটা কত বড় দুঃখজনক বিষয় যে, আমরা জীবিত মানুষ হওয়ার পরও নিজেদের আচরণের মাধ্যমে লোকজনকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারি না। কারো মনে ভালো কাজ করার আকাঙ্খা জাগাতে পারি না।

আপনি আল্লাহর দীনের একজন আমানতদার। এ দেশে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। যেনো আপনার উত্তম আচরণ দেখে আল্লাহর বান্দারা ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হয়। জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর পথে আসে। ইসলাম গ্রহণ করে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ করে।

আপনারা আপনাদের এই দায়িত্ব কতোটুকু পালন করছেন? আপনারাই আল্লাহর দীনের রক্ষক এবং দাঈ। আপনারা তা উপলব্ধি করুন আর নাই করুন। যদি আপনাদের জীবনাচরণ আলো না ছড়ায়, আপনাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে আল্লাহর অবাধ্য বান্দারা সঠিক দিশা না পায় তাহলে কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে আপনারা কী উত্তর দেবেন?

ইবাদত ও আনুগত্যের হকদার কে?

ইবাদত ও আনুগত্যের হকদার কে? আপনি বলবেন, এটাও কি কোনো প্রশ্ন হলো? ইবাদতের হকদার তো একমাত্র তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আমাদের প্রতিপালক।

নিঃসন্দেহে আপনার উত্তর সঠিক। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহই। আপনাকে এই প্রশ্ন করাটা সঠিক মনে হচ্ছে না কারণ আপনাকে আমি বারবার কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে দেখেছি। কুরআনে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে এই কথাটি বলা হয়েছে।

আমি আপনাকে সবসময় নামায পড়তেও দেখেছি। যার প্রত্যেক রাকাতে আপনি উচ্চারণ করেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি। শুধু তা-ই নয়; বরং আপনার সম্পর্কে আমার সুধারণাতো এটাও যে,

আপনার তাহাজ্জুদের জন্যও ওঠার তওফিক হয়। রাতের নির্জনতায়ও আপনি বারবার আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ হে আল্লাহ! আমরা তোমার ইবাদত করি।

এটা তো আল্লাহ তাআলা ভালোভাবেই জানেন যে, আপনি এই সকল শব্দাবলী না বুঝেই উচ্চারণ করছেন, নাকি বুঝেই তার রুবুবিয়তের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে নবী করীম সা. এর সুন্নাহের বিপরীত জীবন যাপন করতে দেখার পর আপনাকে এই প্রশ্ন করাটা বাস্তবিক অর্থে কি অসঙ্গত হবে যে, আপনি আসলে কার উপাসনা করছেন?

ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি। তাই কিছু পেরেশানী আমাকে অনবরত খুঁচিয়ে যাচ্ছে। আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। আপনার কিছু কাজকর্ম সন্দেহজনক। আপনার ব্যাপারে হাজারো সুধারণার পরও আমার অন্তর বলছে, আপনি আল্লাহর বন্দেগী নয়, বরং নফসের বন্দেগী করছেন।

ক্ষমা করুন! আমি অনেক সাংঘাতিক কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু বাস্তবেই আমি এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তাই নিজের অন্তরের ব্যাথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই নফসের বন্দেগী করতে পারে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেনো বাস্তবতা তাই হয়। কিন্তু আপনার এই অজ্ঞতার সাথে আমার ভালো সাথীরা পর্যন্ত জড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার সাদা পোশাকের সাথে এই ত্রুটিটি কোনোভাবেই যাচ্ছে না। আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ তোমার পোশাক-পরিচ্ছদকে পাক পবিত্র করো।

এক সাথীর সাথে তোমার দ্বন্দ্ব হলো। তার ওপর তোমার খুব রাগ উঠে গেলো। রাগের বশে তোমার মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয়ে গেলো যা একজন মুমিনের মুখ থেকে কোনোভাবেই বের হওয়া উচিত নয়। তবে অনেক সময় মানুষ যখন খুব রেগে যায়, তখন এরকম কথা বলে ফেলতে পারে। এরপর আমি দেখেছি যে, আপনি সপ্তাখানেক পর্যন্ত নিজের সেই সাথীকে সালাম দিচ্ছেন না, কথাবার্তাও বলছেন না। আমি এমন ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি হয়তো আমার কথা শুনে বিরক্তবোধ করবেন। তারপরও আমি আপনাকে আপনার প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর বাণী শোনাচ্ছি, রসূল সা. বলেছেন, কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশী নিজের কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক বিছিন্ন করে রাখবে।

আপনি হাদীসটি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনার অন্তরই আপনাকে ভৎসনা করতে থাকবে। তিরস্কার করতে থাকবে। আপনার চেহারা দেখে মনে

হচ্ছে, আপনার মধ্যে আনুগত্যের অদম্য ইচ্ছা ও আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে উসাকানি দিয়েছে আর আপনিও তার কাছে পরাজিত হয়ে গেছেন। তারপরও আপনি আপনার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, এটা সঠিক না ভুল এই ফায়সালা আপনি করবেন। আমার অস্থিরতা হলো এই যে, আপনি নফসের আনুগত্য করছেন।

আপনার ঘনিষ্ঠ এক লোক অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। সে আপনাকে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়েছে। আপনি ভাবলেন, তার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আপনার অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে। তাই আপনি কোনো ধরণের দয়া ও সহমর্মিতা প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং তাকে পরামর্শ দেয়া থেকেও বিরত রইলেন। যেনো আপনি তার থেকে আপনার অর্থনৈতিক ফায়দা লুটতে পারেন। কারণ আপনার দৃষ্টিতে তার অর্থনৈতিক সংকটই আপনার অর্থনৈকি উন্নতির হাতিয়ার। আমি এমন ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবং আপনাদেরকে আপনাদের সরদার মুহাম্মাদ সা. এর বাণী শোনাচ্ছি। নবী সা. বলেছেন, প্রকৃত মুমিন ওই ব্যক্তি যে অন্যদের সাথে সেই আচরণই করে যে আচরণ সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'

তবে আমি দেখেছি যে, আপনি আপনার সেই কর্মপন্থার ওপরই অটল আছেন। আপনার উজ্জ্বল কপালে সামান্য অনুশোচনা বা লজ্জারও কোনো ছাপ পড়ে নি। আমার মন পেরেশান হয়ে গিয়েছে। কারণ এটা তো স্পষ্ট নফসের ইবাদত।

আপনি আপনার এক আত্মীয়ের বাড়িতে খাবার খেলেন না। কারণ তার বাড়িতে গান-বাজনা চলছিলো এবং ভিডিও ধারণ করা হচ্ছিলো। আমার অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি জন্মালো। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় আমি দেখলাম, আপনি শহরের এক ধনকুবেরের দাওয়াতে শরীক হয়েছেন। আপনি সেই অনুষ্ঠানে খুব ধৈর্যের সাথেই বসে আছেন। যদিও ওই অনুষ্ঠানেও প্রতি মুহূর্তে ছবি ওঠানো হচ্ছিলো।

আমি নিভৃতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আপনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন। আপনার বুদ্ধি ও সৃজনীশক্তির ওপর আমার ঈর্ষা হলো। কিন্তু অন্তরে আমি বড়ই ব্যথিত হলাম। অন্য অনুষ্ঠানে বসাটাই শুধু আপনার নফসের বন্দেগী ছিলো না, বরং আপনার আত্মীয়ের বাড়িতে খাবার না খাওয়াটাও আল্লাহর বন্দেগী ছিলো না, নফসের বন্দেগীই ছিলো। আপনি অন্য কোনো সময়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে সময় তার দীনদার না হওয়াকে অজুহাত বানিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক নেয়ামত দান করে রেখেছেন। আগেই

আপনার কাছ থেকে মানুষ জেনেছে যে, নতুন স্ত্রীর ছেলে-মেয়ের নামে আপনি অনেক কিছু ক্রয় করেছেন। তাদের সুখ-শান্তির জন্য আপনি অনেক ধন সম্পদ রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানের নামে আপনি কোনো কিছুই কেনেন নি। তাকে অভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে মানুষের কাছে হাত পাততে দেখা যায়। আপনার বক্তব্য হলো, সে তার মায়ের কথায় চলে। আপনার কাজকর্ম নিয়ে তার বিভিন্ন অভিযোগ আছে। তার মাকে তালাক দেয়াটাকেও সে জুলুম বলে আখ্যায়িত করে। তাই সে আপনার কাছ থেকে কিছু পাবে না।

আমি এমন ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবং সুরায়ে নিসার দ্বিতীয় রুকু পড়ে শোনাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা কীভাবে ওয়ারিসদের মধ্যে ওরাসাতের সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মুমিনের কাজ হলো সেই নির্দেশের ওপর আমল করা। কিন্তু আল্লাহর বিধান নিজের মতো করে পরিবর্তন করতে আপনার অন্তর একটুও কাঁপলো না। আমি আপনাকে বহুবার মসজিদে আল্লাহর দরবারে ঝুঁকতে দেখেছি। তবে এক্ষেত্রে আমি আপনাকে আল্লাহর বিধানের সামনে ঝোঁকানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। আমি বুঝেছি, আপনি আসলে নফসের পূজারী একজন মানুষ।

আমি জানি যে, আপনি আপনার বোনের বিয়েতে কয়েক হাজার রুপি খরচ করেছেন। এটাও জানি যে, আপনি সময়ে সময়ে আপনার বোনের জন্য অনেক হাদিয়া তোহফা নিয়ে যান। কিন্তু আগে যখন আপনি আপনার মৃত বাবার বিশাল সম্পত্তি বিক্রি করেছেন, তখন বোনকে তার থেকে কিছুই দেননি। আপনার বাবার সব অর্থ আপনি ব্যাংকে নিজের নামে জমা করে রেখেছেন। অন্য জায়গা জমিও আপনিই দখল করে রেখেছেন। তবে সামান্য হাদিয়া তোহফা দিয়ে বোনকে সবসময় খুশি রেখেছেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মৃত বাবার সম্পত্তিতে আপনি যতটুকু পেয়েছেন তার অর্ধেক আপনার বোন পাবেন। আল্লাহর শোকর, আপনার বাবা তো এতো সম্পত্তি রেখে গেছেন যে, আপনি আপনার বোনের অংশ তাকে দেয়ার পর যা কিছু থাকবে, তাও আপনার সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর কিতাবে এই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করেছেন,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

একজন পুরুষের জন্য দুই কন্যার সমান অংশ।[১০৪]

---

[১০৪] সুরা নিসা (আয়াত: ১১)

তবুও আপনি আল্লাহর বিধান অমান্য করে দুর্বল বোনের সম্পদ দখল করে রেখেছেন। এটা কি আল্লাহর আনুগত্য? কখনোই না। এটা নফসের আনুগত্য। আপনি মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে আছেন। অনেক কথা আমি এড়িয়ে যাচ্ছি কারণ আমি আপনাকে লজ্জিত করতে চাচ্ছি না। আমার প্রিয় বন্ধু! আরো কতো ত্রুটি আছে যেগুলো আরও গুরুতর। এই কদাকৃতির ত্রুটিগুলো আপনার সাথে লেগে থাকবে আমার অন্তর কখনোই এটা মেনে নিতে পারে না। আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমি ভুল কথা বলছি। আপনি এই ধরণের প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত নন।

আপনি চোখে অহমিকার ঠুলি লাগিয়ে রেখেছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেনো আপনার চোখ খুলে দেন এবং আপনি প্রবৃত্তিপূজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আপনি নিশ্চই তা ধরিয়ে দেবেন। আপনার দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া যেমন আমার কর্তব্য, আমার দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দেয়াও আপনার কর্তব্য। রসূল সা. আমাদেরকে পরস্পরের জন্য আয়না বলেছেন। আপনি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করার চিন্তা করবেন, আমিও আপনার কালিমাগুলো পরিস্কার করার চেষ্টা করবো।

আসুন! আমাদের মনিবের কথার পুনরাবৃত্তি করে রবের কাছে আমল করার তওফিক প্রার্থনা করে আমরা একে অন্যের থেকে আলাদা হই। রসূল সা. ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের ভায়ের জন্য আয়না স্বরূপ। সূতরাং যদি তার মধ্যে কোনো দোষ দেখো তাহলে তা দূর করে দেবে।

মুমিনের সব অবস্থাই কল্যাণকর

অসুস্থতা, দুঃখ, মসিবতে সবাই পড়ে। কেউ এই দাবি করতে পারবে না যে সে কখনো বিপদাপদ বা দুঃখ-দুর্দশায় পড়বে না। নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না যে সে সারা জীবন নিরাপদ থাকবে আর কালের দুর্বিপাকে শুধু অন্যরাই পড়বেন। আজ যদি আপনার ব্যবসায় লোকসান হয়, তাহলে কাল অন্য কারো পালা। আজ যদি আপনি আঘাত পান, তাহলে আপনি কেনো ভুলে যাচ্ছেন যে, কাল অন্য কেউ আঘাত পেয়েছিলো। আগামীকালও কেউ না কেউ বিপদে পড়বে। বিপদ, দুঃখ, পেরেশানি মুখোমুখী দরিদ্রও হয়, ধনীও হয়। বাদশাহরও নানান দুশ্চিন্তা আছে, ফকিরেরও আছে। মুমিন এবং নেককার ব্যক্তিও বিপদে পড়ে, কাফের এবং ফাসেকও পড়ে। কালের দুর্বিপাকে আজ একজন ঘুরপাক খাচ্ছে, তাহলে কাল আরেকজনের পালা।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

এ দিবসসমূহকে আমি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন করি।[১০৫]

---

[১০৫] সুরা আলে ইমরান (আয়াত: ১৪০)

একজন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জীবন ধারণ নিয়েই তাকে মুশকিলে পড়তে হচ্ছে। একজন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সুস্থতার আশা ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে সে পেরেশান। কেউ আকস্মিক কোনো মসিবতে পড়েছে। এগুলো দুনিয়ার জীবনের খুব পরিচিত চিত্র। বিপদাপদ ও মসিবত আল্লাহর বিরোধীদের ওপর আসে, আল্লাহর অনুগতদের ওপরও আসে।

আল্লাহর অনুগতরাও বিপদ দেখে পেরেশান হয়, কাফেররাও হয়। দুঃখের অনুভূতি সবারই হয়। ব্যাথার যন্ত্রনা সবার শরীরেই অনুভূত হয়। তীব্র যন্ত্রণায় সব মানুষই আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে।

আপনি মসিবতে পড়লে পেরেশান হন। সদাহাস্যোজ্জল চেহারা বিষণ্ন হয়ে যায়। আপনার দিন রাতের উদ্যম ও আনন্দ হারিয়ে যায়। এটা হওয়া স্বাভাবিক। আপনাকে এজন্য ভৎসনা করা চলে না। আপনাকে যিনি ভৎসনা করেন বা শান্তনা দিতে চান তিনিও আপনার অবস্থায় পড়লে বিচলিত হয়ে পড়বেন।

তবে দুটি দিকে লক্ষ্য করলে আপনি অন্তরে কিছুটা প্রশান্তির শীতলতা অনুভব করবেন। নিজের মসিবত ও পেরেশানীকে কিছুটা হালকা মনে হবে। প্রথম কথা হলো, মসিবত, কষ্ট, অস্থিরতা এবং পেরেশানীর স্থায়ীত্ব খুবই কম। আপনিই ভাবুন! আজ যদিও আপনার ওপর কোনো মসিবত এসেছে, কিন্তু আপনি আপনার জীবনের কতগুলো বছর আরামে ও শান্তিতে কাটিয়েছেন। কয়েক বছরের শান্তি ও আরাম আয়েশের বিপরীতে কয়েক ঘণ্টার মসিবত বা কষ্টকে কি গুরুত্ব দেয়া উচিত? আল্লাহ তো মাসের পর মাস বছরের পর বছর আপনাকে ভালো রেখেছেন। আপনি অতিতে আরও কত বড় বড় বিপদেও পড়েছেন এবং আল্লাহ আপনাকে সেসব বিপদ থেকে মুক্তিও দিয়েছেন। আল্লাহ নিজেই কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন মানুষের দুঃখ ও কষ্টের পরেই সুখ থাকে। কথাটিকে জোর দেয়ার জন্য তিনি কুরআনে পরপর দুইবার কথাটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।[১০৬]

আরও শান্তনার কথা হলো, মানুষের জীবনে আল্লাহ তাআলা সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্ধারণ পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। মসিবত তার সময়কাল পূর্ণ করে দূর হয়ে যাবে। অবশ্যই দূর হবে। কবি কত সুন্দর করে বলেছেন,

---

[১০৬] সূরা আলাম নাশরাহ (আয়াত: ৫, ৬)

طولِ غمِ حیات سے گھبرا نہ اے جگر
ایسی ھبی کوئی رات ھے جس کی سحر نہ ھو

হে প্রিয়, জীবনের দুঃখ দুর্দশার দৈর্ঘের কারণে ঘাবড়ে যেয়ো না
কোনো কোনো রাত এমনও আছে, যা কখনো শেষ হয় না।

দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ঈমান দান করেছেন। আপনি মুমিন। আপনি মুমিন এ বিষয়টি নিশ্চই আপনার উপলব্ধিতে থাকে। মুমিনের দুঃখ কষ্ট বৃথা যায় না। মুমিনের জন্য দুঃখ কষ্টও কল্যাণকর, সুখ শান্তি ও কল্যাণকর। রসূল সা.-এর যবানে শুনুন। হযরত সোহাইব রা.-থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সা. বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার সব অবস্থায়ই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে, আর যদি দুঃখ আসে তবে সে ধৈর্য ধারণ করে। অতএব প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়।[১০৭]

আল্লাহু আকবার, ঈমানের কারণে কত বড় সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি। এই সৌভাগ্য শুধু আমরাদেরই।

আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট আল্লাহই দেন। তাই আপনি যদি কোনো দুঃখ ও কষ্টে পড়েন, তাহলে ধৈর্যই আপনার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। মুমিন হায়-হুতাশ এবং বিলাপ করে না। সে শত বিপদের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করে ও দৃঢ় থাকে। দৃঢ়তার সাথে সব দুঃখ কষ্ট মোকাবেলা করে। মুমিনের জন্য সর্বাবস্থাই কল্যাণকর এই বিশ্বাস তাকে ধৈর্যশীল হওয়ার শক্তি যোগায়। সে ভাবে দুঃখ ও বিপদ যা কিছু এসেছে, তার মাওলার ইশারায়ই এসেছে। তিনিই তা দূর করে দেবেন। তিনি এর জন্য যতটুকু সময় নির্ধারণ করেছেন, ততটুকু সময় অতিক্রান্ত হলেই তা দূর হয়ে যাবে।

---

[১০৭] সহীহ মুসলিম (হাদীস: ২৯৯৯)

নিজের মন থেকে উত্তর নিন

আক্ষেপের বিষয় হলো, আজ আমরা নিজেরাই নিজেদের মর্যাদা বুঝি না। নিজেদের বড়ত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি না। আজ আমাদের মর্যাদার কথা শুধু ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। নিজেদের ঐতিহ্য ও অবদানের কথা আমাদের মন থেকেও হারিয়ে গেছে। আপনি ঈমানের দৌলত অর্জন করেছেন। এটা এমন এক সৌভাগ্য যার বিপরীতে সবকিছুই তুচ্ছ। দুনিয়ার বড় থেকে বড় মূল্যবান বস্তুও এর বিপরীতে কিছুই না। আপনি কেনো ভুলে যান যে, আপনার কাছে রসূল সা.-এর ইশক ও মহব্বতের মহাদৌলতও রয়েছে। আপনার অন্তরে রসূলের ভালোবাসার আলো ঝলমল করছে। রসূলের প্রতি ভালোবাসা ঈমানেরই একটি অংশ। ঈমানের নেয়ামত দুনিয়া ও আখেরাতের সবচে বড় নেয়ামত।

পৃথিবীতে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং আল্লাহ ও তার রসূলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার একটা মাধ্যম হলো ঈমান। রসূলের সাথে সম্পর্ক আসলে আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক। তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আসলে আল্লাহর সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ। আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে হলে রসূলের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পথ একটিই, তা হলো, আপনি মুহাম্মাদ সা. এর ওপর ঈমান আনুন। আপনার ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন রসূল সা.-এর ভালোবাসায় আপনার হৃদয় পূর্ণ হবে। রসূলের মহব্বত আপনার কাছে সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য পাবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবো।[১০৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ"

---

[১০৮] সহীহ মুসলিম (হাদিস: ১৭৮)

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْآنَ يَا عُمَرُ".

আমরা এক দিন নবী সা.-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর হাত ধরে রেখেছিলেন। ওমর রা. তাকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার প্রাণ ছাড়া আপনি আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তখন নবী সা. বললেন, না, যার হাতে আমার প্রাণ ওই সত্ত্বার কসম; তোমার কাছে আমি যেনো তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হই। তখন ওমর রা. তাকে বললেন, আল্লাহর কসম, এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী সা. বললেন, হে ওমর, এখন তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে।[১০৯]

সুতরাং যে মুসলমানের অন্তরে রসূলের ভালোবাসার আগুন নেই, তার আল্লাহর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সে ঈমান থেকে বঞ্চিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ হলো, অন্তরে রসূলের ভালোবাসার আগুন জ্বালানো।

আপনি দাবি করেন, রসূলের সাথে আপনার ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। তাহলে এটা নিয়ে গর্ব করুন। নিঃসন্দেহে এটা গর্বের বিষয়। এটা আপনার অনেক বড় সৌভাগ্য। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি এই ভালোবাসার বড়ত্ব ও মহত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার কাছে যদি এতো মূল্যবাণ একটি সম্পদ থেকে থাকে যা পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই নেই, তাহলে আপনি এতো নিরাশ কেনো? জীবনে কিছুই না পাওয়ার হতাশা আপনার মনে কেনো বাসা বাঁধে? আপনি যদি বুঝতে পারেন, আপনার কাছে অনেক সম্পদ আছে, আল্লাহ আপনাকে অনেক বড় নেয়ামত দান করেছেন, তাহলে আপনি কখনো নিরাশ হবেন না। কখনো ভাববেন না যে, আপনার কিছু নেই। এই মহা দৌলত ও নেয়মতের বড়ত্ব আপনি যতো বেশি অনুধাবন করতে পারবেন, আপনার জীবনে এর প্রভাব ততো বেশি পড়বে। এটা আপনাকে আপনার মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আপনাকে ভেতর থেকে বার বার বলতে থাকবে, আপনি যে দাবি করেছেন, তার প্রমাণ দিন। যে দৌলতের কারণে আপনি গর্বিত, যাকে আপনি দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে দামি মনে করেন, এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও দামি মনে করেন, আপনি যে আসলেই তার মলিক এর কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে? এই অনুভূতি যার মধ্যে জাগ্রত হবে

---

[১০৯] বুখারি শরীফ (হাদিস ৬২৫৭)

তার দাবি ও আমলের মাঝে দূরত্ব কমতে থাকবে। সমাজের মানুষের চোখেও আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে। মানুষ আপনার মধ্যে রসূল সা.-এর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাবে। ফলে সমাজে আপনার মর্যাদার স্তর অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। লোকেরা আপনার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাবে।

আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি যারা করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তার রসূলকে অনুসরণ করতে। এটাই আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসার দাবি সত্য হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রসূল সা.-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[১১০]

আমি আপনাদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরছি, আপনারা এই প্রশ্নগুলো আপনাদের অন্তরকে করুন। এই প্রশ্নগুলোর আলোকে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি আপনার দাবিতে কতোটুকু সত্যবাদী। রসূলকে আপনি ভালোবাসেন এটা ভেবে গর্ব করার কতোটুকু অধিকার আপনার আছে।

১. আল্লাহর রসূল সা. আপনার জন্য যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তা স্মরণ করে আপনার চোখ থেকে কতোবার অশ্রু গড়িয়ে পরেছে?

২. রসূল সা.-কে স্মরণ করে তার ভালোবাসায় স্বতস্ফুর্তভাবে কখনো কি আপনার মুখ থেকে দরূদ ও সালাম বের হয়ে এসেছে?

৩. রসূল সা.-এর জীবন ও তার ঘটনাবলি জানার জন্য আপনি কি পরিমাণ অস্থিরতা অনুভব করেন? তার জীবনী অধ্যয়নকে আপনি কতোটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেজন্য কী পরিমাণ সময় ব্যয় করেছেন?

৪. রসূল সা.-এর কথা স্মরণ করে জীবনে কতোবার আপনার মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে এবং কতোবার আপনার অন্তরে তার রওযা যিয়ারত করার আগ্রহ জেগেছে।

৫. আপনার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, চলাফেরা ও কথাবার্তার মাঝে রসূল সা. এর সীরাত কতটা প্রভাব ফেলেছে?

৬. রসূল সা.-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আপনি যতোটা জানেন, সে অনুযায়ী আপনার পারিবারীক জীবনে আমল করেছেন?

৭. যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, সৃজনশীলতা এবং সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি দান করে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার এই শক্তি ও যোগ্যতাকে দীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছেন তো?

---

[১১০] সূরা আহযাব (আয়াত: ২১)

৮. আপনি আপনার সমাজকে রসূল সা. এর শিক্ষা ও আদর্শে আলোকিত করে তোলার জন্য কিছু করেছেন?

৯. যদি আপনি যুবক হন, তাহলে আপনার যৌবন কি ওই গাছে পানি সিঞ্চনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা রসূল সা. লাগিয়েছিলেন?

১০. যদি আপনি নারী হন, তাহলে আপনার ঘরে ও গণ্ডির মধ্যে দীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী?

১১. আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সন্তান দান করেছেন, তাদেরকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এবং ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী হিসেবে তৈরি করতে আপনি কী করেছেন?

১২. দুনিয়ার জীবনে পদে পদে আপনার সামনে এমন ক্ষেত্র আসে, যেখানে রসূল সা. এর উদ্দেশ্য হয় একটা আর দুনিয়ার উদ্দেশ্য অন্য কিছু। এমন পরিস্থিতিতে আপনার সিদ্ধান্ত কি হয়?

১৩. জীবনে কতো বার আপনি বিচলিত হয়েছেন এই কথা ভেবে যে, কাল হাশরের ময়দানে আমাকে রসূল সা. এর মুখোমুখি হতে হবে, তখন রসূল সা. আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে চেহারা ফিরিয়ে নেবেন না তো?

১৪. জীবনে কতোবার পরকালে রসূল সা.-এর সঙ্গ ও ভালোবাসা না পাওয়ার আশংকায় আপনি অস্থির হয়েছেন?

এই প্রশ্নগুলো নিভৃতে বসে নিজেকে করুন। নিজের কাছ থেকে এগুলোর উত্তর নিন। অন্যকে আশ্বস্ত করার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করুন। অন্যকে আশ্বস্ত করার চিন্তায় সময় নষ্ট করা বোকামি।

যুগে যুগে মুমিনরা রসূল সা.-এর প্রতি তাদের ভালোবাসার অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমি এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আপনাদের মতো তারাও রসূল সা.-এর ভালোবাসার দাবিদার ছিলেন। তাদের জীবনচরিতের সাথে নিজেদের জীবন মিলিয়ে দেখুন।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আজ বৃহস্পতিবার। কত কঠিন ছিলো সেই বৃহস্পতিবার দিনটা! এ কথা বলে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এতো কাঁদলেন যে, মেঝের পাথর চোখের পানিতে ভিজে গেলো। হযরত সাইদ ইবনে যুবাইর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, বৃহস্পতিবার কী হয়েছিলো? তিনি বললেন, এই দিনই রসূল সা. এর অসুস্থতা বেড়ে গিয়েছিলো।

একবার ওমর রা. নবীজির ঘরে গেলেন। তিনি দেখলেন, রসূল সা. খালি গায়ে শুধু একটি ইযার পরে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তার বাহুতে খেজুরের চাটাইয়ের দাগ লেগে গেছে। এটা দেখে হযরত ওমর রা. কেঁদে

ফেললেন। রসূল সা. বললেন, ওমর, কেনো কাঁদছো? তিনি উত্তর দিলেন, কেনো কাঁদবো না, আপনার এই অবস্থা, আর কায়সার ও কিসরা কত শান শওকতে জীবন কাটাচ্ছে। রসূল সা. বললেন, ওমর, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত।

হযরত জাবের রা.-এর বাবা ওহুদ যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য রওয়ানা হওয়ার সময় নিজের ছেলেকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধেই আমি শাহাদাত বরণ করবো। মনে রাখবে, আমার কাছে রসূল সা.-এর চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। তুমি আমার দায়িত্ব পালন করবে এবং নিজের ভাই-বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।

হযরত আলী রা.-কে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করলো, আপনার সাথে রসূল সা.-এর ভালোবাসা কেমন ছিলো? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, রসূল সা. আমাদের কাছে আমাদের জীবন, সম্পদ, সন্তান, মা-বাবা এবং পিপাসায় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে এ অবস্থায় ঠাণ্ডা পানির চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন।

এক সাহাবী অসুস্থ। শরীর হলুদ হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। রসূল সা. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। সাহাবী বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, অসুস্থতা নিয়ে আমি এখন ভাবছি না। শুধু একটি চিন্তা আমাকে অস্থির করে রেখেছে। রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কী এমন চিন্তা তোমার? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ভাবছি জান্নাতে আপনি এতো উঁচু স্তরে থাকবেন যেখানে অন্য কোনো নবীও পৌঁছতে পারবে না। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষজন সেখানে কীভাবে যাবে? জান্নাতে গিয়ে যদি আপনার দেখা না পাই, তাহলে সেই জান্নাত দিয়ে আমি কী করবো? রসূল সা.-এর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, জান্নাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্খা

বুকে হাত দিয়ে একটু ভাবুন, আপনার অন্তরে আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার এবং তার কাছে প্রিয় হওয়ার আকাঙ্খা আছে? কত সুন্দর এই আকাঙ্খা এবং কত সম্মানিত ওই ব্যক্তি যার অন্তরে এই আকাঙ্খা আছে। আল্লাহরর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। জীবনের অন্য সব প্রাপ্তিই এর সামনে তুচ্ছ। যে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলো, তার আর কী চাই? এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে?

যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, সমস্ত শক্তির মূল উৎস, পৃথিবীর সব কিছু যার ক্ষমতাধীন, এমন স্রষ্টার প্রিয় হবার কল্পনাই অন্তরকে আনন্দ ও পুলকে ভরে দেয়। যে অন্তরে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আকাঙ্খা নেই, সেই অন্তরে প্রাণ

নেই। জীবিত অন্তরে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার অধির আকাঙ্খা থাকে।

সত্যিকারের আকাঙ্খা হলো, যা মানুষকে সবসময় ব্যাকুল ও অস্থির করে রাখে। সে তা পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যায় এবং কখনোই সেই ব্যাপারে উদাসীন হয় না।

যে আকাঙ্খা মানুষের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে অস্থির করে তোলে না, বুঝতে হবে তা আকাঙ্খা নয়। আপনি ধারণা করছেন বা দাবি করছেন আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আকাঙ্খা আছে, বাস্তবে তা নেই। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আকাঙ্খা যদি প্রকৃতই আপনার অন্তরে থেকে থাকে, তাহলে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, এ আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য আপনি কী করেছেন? কোন প্রিয় কাজটি ছেড়েছেন? কোন ত্যাগটি স্বীকার করেছেন?

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমি আপনাদের সামনে একটি দু'টি আমলের কথা উল্লেখ করছি, যদি আপনি এই দুটি আমল শুরু করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ এবং রসূলের পক্ষ থেকে আপনার জন্য সুসংবাদ এই যে, আপনি আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। এ দু'টি আমলের মাধ্যমে নিজের জীবনকে সুন্দর করুন।

রসূল সা.-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করার দ্বারা, আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে এবং আল্লাহরই জন্য মহব্বতের দ্বারা।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, যে রসূল সা. এর অনুসরণ করে সে আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।[১১১]

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম হলো আল্লাহর রসূল সা.-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণে জীবন কাটানো। আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। মুমিন তারাই যারা আল্লাহকে ভালোবাসে। আর মানুষ কাউকে ভালোবাসলে সে চায়, সেও যেনো তাকে ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন। আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যাচাইয়ের কষ্টিপাথর হলো, রসূল সা. এর অনুসরণ। রসূলের অনুসরণ অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা থাকার সাক্ষ্য প্রদান করে।

যার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে, সে নিশ্চিই আকাঙ্খা করবে যে,

---

[১১১] সুরা আলে ইমরান (আয়াত: ৩১)

আল্লাহও তাকে ভালোবাসুক। আর আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম হলো রসূল সা. এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। অর্থাৎ রসূলের অনুসরণ একইসাথে আল্লাহর মহব্বতের দাবি এবং আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম।

আসুন! এবার দেখি রসূল সা.-এর সুন্নাহ কী বলছে?

হযরত আবু ইদরিস খাওলানি রহ. বলেন, একবার আমি দামেশকের জামে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, সেখানে এক বুযুর্গ বসে আছেন। তার সাদা দাঁতগুলো মুক্তার মতো ঝলমল করছে। তাকে ঘিরে অনেক মানুষ বসে আছে। তারা পরস্পরে কিছু মাসআলা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। যখন তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হচ্ছে, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা সবাই ওই ব্যক্তির কাছে সমাধান জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি যা বলছেন তাই সবাই মেনে নিচ্ছেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই বুযুর্গ কে? তারা বললো, ইনি মুআয ইবনে জাবাল রা.।

দ্বিতীয় দিন আমি যোহরের নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, হযরত মুআয রা. আমার আগেই মসজিদে এসেছেন এবং নামায পড়ছেন।। আমি তার নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। নামায শেষ করার পর আমি এগিয়ে তাকে সালাম দিলাম এবং বললাম– হযরত, আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করি। তিনি বললেন, কী বললে? আল্লাহর জন্য মহব্বত করো? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, সত্যিই কি তুমি আল্লাহর জন্য আমাকে মহব্বত করো? আমি আরয করলাম, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর জন্যই আপনাকে মহব্বত করি।

এরপর হযরত মুআয রা. আমার চাদর ধরে আমাকে তার দিকে টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ। আমি নবী করিম সা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি অবশ্যই ওই সব লোককে মহব্বত করি, যারা শুধু আমার জন্য একজন অপরকে মহব্বত করে। শুধু আমার জন্য একে অন্যের সাথে ওঠাবসা করে এবং শুধু আমার জন্যই একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাত করে।

আল্লাহর এই কথা তার সত্য রসূলের মাধ্যমে এবং ওই বুযুর্গ সাহাবার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যার কাঁধে হাত রেখে দুনিয়া ও আখেরাতের সরদার রসূল সা. ইরশাদ করেছেন, মুআয! আমি তোমাকে মহব্বত করি।

হযরত মুআয রা. আবার হযরত আবু ইদরিস খাওলানি রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহর জন্যই আমাকে মহব্বত করো? যখন হযরত খাওলানি রহ. আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আবার বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর

জন্যই আপনাকে মহব্বত করি। তখন হযরত মুআয রা. তাকে সুসংবাদ দিলেন, তুমি আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করেন।

যদি আপনার রবের প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকে এবং তাকে পাওয়ার আকাঙ্খা আপনার অন্তরে থাকে, তাহলে আপনি আল্লাহওয়ালাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসুন। আর বারবার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন এই ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্যই কি না। যদি বারবার আপনার কাছে এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে এ মহব্বত শুধু আল্লাহর জন্যই, তাহলে আপনি আনন্দিত হতে পারেন। কারণ খাওলানী রহ.-এর মতো আপনিও আল্লাহর একজন প্রিয় ব্যক্তি, আল্লাহ আপনাকে মহব্বত করেন।

আল্লাহর রসূল সা. এর অনুসরণ এবং আল্লাহ ওয়ালাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই আল্লাহর প্রিয় হওয়ার নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত মাধ্যম। যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং রসূল সা. বলেছেন। এটা কোনো মানুষের চিন্তা নয় যে এ ব্যাপারে কারো সংশয় বা সন্দেহ হতে পারে। এই দু'টি মাধ্যম বাদ দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার অন্য কোনো মাধ্যম খোঁজার দরকার নেই। অন্য মাধ্যমগুলো মানুষ বানিয়েছে। সেগুলো আল্লাহ ও রসূল থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং সেই মাধ্যম ধরে আল্লাহকে পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ তার বান্দাদের যা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, সবকিছুই তার সত্য রসূলের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। আর রসূলও সঠিকভাবে এই উম্মতের কাছে আল্লাহর সব বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কিছুই গোপন রাখেননি।

যদি আপনার মধ্যে নিজের আকাঙ্খা পূর্ণ করার সত্যিকার ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে আর অন্য কোনো দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। ধৈর্যের সাথে আল্লাহ এবং রসূলের বলে যাওয়া তরিকা অনুযায়ী কাজ করুন। আপনার আকাঙ্খা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

মালিককেই ডাকো

এক বুযুর্গ নিজের শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তোমার চির শত্রু তোমাকে লোভ দেখায় এবং গুনাহকে সুস্বাদু ও সুন্দর বানিয়ে তোমার সামনে পেশ করে, তাহলে তুমি কী করবে?

শিষ্য উত্তর দিলো, আমি সর্বশক্তি দিয়ে ওই শত্রুর মোকাবেলা করবো।

বুযুর্গ প্রশ্ন করলো? যদি তোমাকে আবার লোভ দেখিয়ে ফাসানোর চেষ্টা করে, তাহলে কি করবে?

সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য জবাব দিলো, আমি আবার তার মোকাবিলা করবো এবং তাকে দুর্বল করে ছাড়বো।

দূরদর্শী উস্তাদ উত্তর দিলেন, তুমি সাহস করেছো দেখে খুশি হলাম। কিন্তু গুনাহের আকর্ষণ তো বড় কঠিন জিনিস।

এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি কোনো বকরীর পালের পাশ দিয়ে তুমি যাও, আর বকরীর পাহাদার কুকুর তোমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে এবং তোমার রাস্তা আটকে দেয়, তাহলে তুমি কী করবে?

সাহসী শিষ্য উত্তর দিলো, আমি বীরত্বের সাথে কুকুরের মোকাবিলা করবো। আমার রাস্তা থেকে তাকে সরানোর জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করবো।

বুযুর্গ উস্তাদ বললেন, কিন্তু ভাই, এই মোকাবিলা বড় কঠিন এবং কষ্টদায়ক। কতো ভালো হতো যদি তুমি কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে না জড়াতে। তাকে এভাবেই ঘেউ ঘেউ করতে দাও। আর তুমি বকরীর মালিককে সাহায্যের জন্য ডাকো। মালিককে ডাকলেই কুকুর নীরব হয়ে যাবে। মালিকই কুকুর থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।

এই বুযুর্গ কে ছিলেন জানি না। তার নাম আল্লামা ইবনে জাওযীও জানতেন না। জানলে তিনি অবশ্যই লিখতেন। নাম জানা জরুরিও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তার এই নসীহত-উপদেশ। কতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও হেকমতপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন! বকরীর মালিককে সাহায্যের জন্য ডাকো। মালিককে ডাকলেই কুকুর নীরব হয়ে যাবে। মালিকই কুকুর থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। কথাটার মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, এই উপদেশের হেকমত ও সত্যতা আপনাকে মুগ্ধ করবে।

শয়তান তার অনুচরদের সাথে নিয়ে প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে মুমিনের রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ায়। আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং চিৎকার করে। তার আক্রমণাত্মক হামলা সব সময়ই চলতে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না। হযরত হাসান বসরি রহ. কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলো, হযরত, শয়তান কি ঘুমায়? হযরত বললেন, শয়তান যদি ঘুমাতো, তাহলে তো আমরা অনেক শান্তিতে থাকতাম। এই শত্রু কখনো ঘুমায় না।

এই ধোঁকাবাজ, সচেতন, ধূর্ত শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি এটা নয় যে, আপনি তার এবং তার অনুচরদের সঙ্গে শক্তি দেখিয়ে নিজের উত্তম সময়, শক্তি ও যোগ্যতা নষ্ট করতে থাকবেন। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গেলে আপনি তাদের ধোঁকায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই তাদের থেকে আত্মরক্ষা করার একমাত্র সঠিক কৌশল হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সাহায্যের জন্য ডাকা। শয়তান যতো কৌশলই করুক, আল্লাহ রক্ষা করলে শয়তানের সাধ্য নেই আমাদের ধোঁকা দেয়ার। আল্লাহ আমাদের তার আশ্রয়ে নিয়ে তার সেইসব বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন, যাদের ব্যাপারে তিনি

শয়তানকে বলেছিলেন, 'তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না।'

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.

তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। নিশ্চই শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার দাসদের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই। কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোর প্রতিপালকই যথেষ্ট।[১১২]

শয়তানের সভাতে আপনিও গিয়েছেন। আমাদের অনেকেই যাতায়াত করে। তার ষড়যন্ত্র দেখে কান্নাকাটি করা নিস্ফল। তার চক্রান্ত ঠেকানোর পরিকল্পনা করা অনর্থক। তাকে লানত ও অভিশাপ দিলেও কোনো ফায়দা নেই। তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার সাথে লাগতে গেলে আপনার মূল্যবান সময়, শক্তি ও যোগ্যতা নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই শত্রুকে পরাজিত ও অপদস্ত করার সঠিক কৌশল হলো, আপনি আল্লাহকে আপনার সাহায্যের জন্য ডাকুন। সবকিছু তার ক্ষমতাধীন। তার কাছে যদি আপনি প্রিয় হতে পারেন, তার আশ্রয়ে যদি থাকেন, তাহলে শয়তানের সব বাহিনী মিলে আপনার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবে না।

শয়তানের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া অহেতুক। সে অবশ্যই অভিশাপ ও লানতের যোগ্য। কিন্তু তাকে লানত ও অভিশাপ দিয়ে তো আপনি তার চক্রান্ত থেকে বাঁচতে পারবেন না। যদি আপনি তাকে পরাজিত করতে চান? তাহলে তার জীবন থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করুন। তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে তার লক্ষ্যে অটল ও অবিচল। নিজের মিশনের ব্যাপারে কখনোই সে গাফেল হয় না। সে সদা সর্বদা সজাগ, উদ্যমী ও প্রস্তুত। তার শত্রুতা সাময়িক বা কিছু সময়ের জন্য নয়। আল্লাহর এই শত্রু জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় বলেছিলো,

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

---

[১১২] সুরা বনী ইসরাইল (আয়াত: ৬৪, ৬৫)

আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের
সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো।[১১৩]

এরপর থেকে সে নিজের কাজে অক্লান্ত ও অবিচল। তার কুচক্রী মেধা সারাক্ষণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত। কোনো এক মুহূর্তের জন্যও তার মাথায় ভালো কোনো চিন্তা আসে না। মানুষের ওপর হিংসায় সে অহর্নিশ জ্বলতে থাকে। মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ও অপদস্ত করার এমন সব চক্রান্ত সে আঁটে যে, অনেক বড় বড় মানুষও ঘায়েল হয়ে যায়। শয়তান কখনো কখনো মানুষকে কল্পনাতীত দিক থেকে হামলা করে। মানুষ বুঝতেই পারে না এই কৌশলেও তাকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে। এই অভিশপ্ত সবসময়ই মানুষের সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে জাল বিছিয়ে যায়। যে কোনো ভাবে তাকে ধোঁকায় ফেলাই হয় তার মূল উদ্দেশ্য।[১১৪]

সে এতো চতুর যে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সে মানুষের মধ্যেই নিজের দল গঠন করে ফেলেছে। যারা বাহ্যত শয়তানকে তাদের শত্রু বলে ও মনে করে, কিন্তু তারা নিজেরাই মানুষকে দীন থেকে দূরে সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এমন সব কাজ করে যা কোনো দিক থেকেই শয়তানের চেয়ে কম ধ্বংসাত্মক নয়।

এই চতুর শত্রু থেকে বাঁচতে একটি পন্থাই সঠিক ও কার্যকর। আপনি প্রকৃত মালিককে ডাকুন। তার আশ্রয়ে যান এবং তার সাথে এমন সম্পর্ক গড়ুন, তিনি যেনো আপনাকে তার অনুগত বান্দা হিসেবে গণ্য করেন। তারপর এই শত্রু যেদিক থেকেই আপনার ওপর হামলা করুক না কেনো, তার কোনো কৌশলই কাজে আসবে না। ভেবে দেখুন আপনি প্রকৃত মালিকের প্রিয় হওয়া, তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টায় কতোটা একনিষ্ঠ ও একাগ্র।

আপনাকে পথভ্রষ্ট করা যে শত্রুর মূল লক্ষ্য, তার উদ্যম, একাগ্রতা তো আপনার সামনে স্পষ্ট। তার থেকে শিখুন। তার মতো শত্রুর ধ্বংসাত্মক থাবা থেকে বাঁচতে এবং তাকে দুর্বল করতে আপনিও আপনার মালিকের সাহায্য লাভের জন্য এমন উদ্যম ও একাগ্রতার সাথে কাজ করুন। ইনশাআল্লাহ বিজয় আপনারই।

---

[১১৩] সূরা সাদ (আয়াত: ৮২)

[১১৪] তালবীসে ইবলিস, আল্লামা ইবনে জাওযী রহ

ভাগ্যের দোষ দেবেন না

আপনি এ হতাশায় কেনো ভোগেন যে আপনি কখনো একজন সফল মানুষ হতে পারবেন না। হতে পারে আপনার জ্ঞানগত এবং চিন্তাগত যোগ্যতা অসাধারণ নয়। শারীরিকভাবেও আপনি সাধারণ ধরনের সুস্থতার অধিকারী। হয়তো আপনি এখনও সব দিক মিলিয়ে সফল মানুষ নন। কিন্তু তাই বলে এমন হতাশায় ভোগা ঠিক নয় যে আপনি কখনো সফল মানুষ হতেই পারবেন না। ভাগ্যের দোষ দেয়ার আগে ভাগ্যকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। ব্যর্থতার জন্য আফসোসের আগে সফলতার জন্য আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু করে দেখান। গন্তব্য বহুদূর ভেবে ভয় পেয়ে যাওয়া, চেষ্টা না করেই ভগ্ন হৃদয় বসে থাকা, দু একবার ব্যর্থ হয়েই নিরাশ হয়ে যাওয়ার পেছনে দায়ী আপনার জ্ঞানের দৈন্যতা, ভীরুতা এবং আল্লাহর ওপর খারাপ ধারণা।

নিঃসন্দেহে আপনার মন আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। সবকিছু আল্লাহর হাতে। সফল সেই হতে পারবে, যাকে আল্লাহ সফল করবেন। আর ওই ব্যক্তি কখনো সফল হতে পারবে না, যার জন্য আল্লাহ ব্যর্থতার ফায়সালা করে রেখেছেন। কিন্তু এর সাথে সাথে আপনি এটাও স্মরণ রাখুন যে, কুরআনে কারিমে আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

মানুষ তাই পায় যা সে করে।[১১৫]

এটাই আল্লাহর ফয়সালা। আপনি যা চাইবেন, যা পাওয়ার চেষ্টা করবেন আপনাকে তা দেয়া হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সব মানুষই নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফল পাবে। চেষ্টা ছাড়া সে কিছুই পাবে না।

দুনিয়া চেষ্টা ও মেহনতের স্থান। আপনার জীবনকে চেষ্টা ও মেহনতের মাধ্যমে ফলপ্রসু বানানো উচিত। আপনার জীবনকে ফলপ্রসু বানানো আপনার ইচ্ছাধীন। চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনার জীবন কাজে লাগবে এটা নিশ্চই বাস্তবে সম্ভব নয়। নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা ও মেহনতের পর আপনি নিশ্চই সফল হবেন। আপনি যদি ব্যর্থ হন, তাহলে বিশ্বাস করুন আপনার কোনো ত্রুটির কারণেই এটা হয়েছে। আপনার উচিত সেই ত্রুটিটি খুঁজে বের করা। আপনি তো শুধু আশা-আকাঙ্খার স্বপ্নজাল বুনে যান। চেষ্টা-প্রচেষ্টার পথে যাওয়ার পরিবর্তে আপনার শরীর, মন ও ভাগ্য আপনাকে স্বপ্নের মধ্যেই খুশি রাখতে চায়। আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ চেষ্টা করেন না। তারপর ব্যর্থ হলে হতাশ হয়ে ভাগ্যের দোষ দেন।

---

[১১৫] সুরা নাজম (আয়াত: ৩৯)

ইতিহাসের পাতায় আপনি যেসব সফল মানুষকে দেখছেন এবং যাদের নিয়ে ইতিহাস গর্ব করে, তারা সবাই অসাধারণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন না। তবে সবাই পরিশ্রমী ছিলেন। বসে বসেই তারা সব কিছু পেয়ে যাননি। এসব যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই আছেন যার জ্ঞান ও বুদ্ধি ছিলো সাধারণ মানের। অনেকের পরিবার ও বংশও ছিলো সাধারণ। কিন্তু চেষ্টা তাদের ওপরে উঠিয়েছে। আজ পৃথিবী তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে এরকম মানুষের সংখ্যা অগণিত। আপনি নিজে একটু চিন্তা করলেও দশ বিশ জনের নাম মনে করতে পারবেন।

আপনি জীবনে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না এবং ভবিষ্যতেও মানুষ আপনাকে একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে স্মরণ করবে না -এরকম সিদ্ধান্ত নিজে নিজেই খুব দ্রুত নিয়ে নেবেন না। একটা কথা মনে রাখবেন, জীবন আপনাকে যে আশ্বাস দেয় অথবা জীবনের কাছে আপনি যে আশা রাখেন, তা পূর্ণ করা আপনারই কাজ।

জীবনে সফল হওয়ার জন্য দুটি বিষয় খুব জরুরি। এক. লক্ষ্য ঠিক করা। দুই. হতাশ না হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য ঠিক করে চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ আপনি সফল হতে পারবেন। ইতিহাসে স্মরণীয় মহান ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলে এ দু'টি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়।

ইতিহাস বিখ্যাত এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি কখনো বিলাসী, আরামপ্রিয়, অকর্মণ্য ও উদাসীন কাউকে পাবেন না। যার জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই এমন ব্যক্তিও জীবনে কিছু করতে পারে না। অনেকে আছে যারা জীবনের লক্ষ্য আছে বলে দাবি করে কিন্তু এর সাথে তার কাজকর্মের মিল পাওয়া যায় না। যারা অন্যের দয়া ও অনুগ্রহে জীবন কাটানো এবং অন্যের বাগান থেকে ফল খাওয়ার ধান্দায় থাকে, তারা না কখনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে আর না হতে পারবে।

যাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই অথবা লক্ষ্য আছে কিন্তু লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা নেই, তাদের মধ্যে আপনি কখনো উদ্যম, আশা, সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা এবং চেষ্টা দেখতে পাবেন না। যারা চেষ্টা ও মেহনতের কথা কল্পনা করলেই কেঁপে ওঠে, তারা কখনো সফল হতে পারে না।

সফলতা শুধু সেই পাবে, যে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকে এবং এর জন্য লাগাতার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যায়।

কুরআন তিলাওয়াত

একবার এক দল চীনা ও এক দল রোমানের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। চীনাদের দাবি ছিলো, আমরা ভাস্কর্য ও অঙ্কনশিল্পের ক্ষেত্রে সেরা। এই বিষয়ে আমাদের সমপর্যায়ে কেউ নেই। রোমানরাও একই দাবি করেছিলো। এই ঝগড়ার কথা এক কান দু' কান করতে করতে তৎকালীন সময়ের বাদশাহের কানে পৌঁছলো। বাদশাহ দুই দলকেই ডাকলেন। বললেন, দুই দলের পরীক্ষা নিলে কেমন হয়? পরীক্ষায়ই প্রমাণিত হবে, কোন দলের দাবি সত্য। দুই দলই বাদশার প্রস্তাবে রাজি হলো। দুই দলই সিদ্ধান্ত নিলো, তারা এই দুই বিষয়ে তাদের পরঙ্গমতা দেখিয়ে বিপক্ষ দলকে হতবাক করে দেবে।

উভয়ে দল মিলে সামনা সামনি দু'টি জায়গা ঠিক করলো। তারপর দুই দলই নিজেদের প্রদর্শনীর জায়গা সাজিয়ে তুলতে লাগলো। চীনারা বাদশাহের কাছে বিভিন্ন রঙ ও সুগন্ধি চাইলো। বাদশাহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী রঙ ও সুগন্ধি সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন। রোমানরা কিছুই চাইলো না। চীনারা বিভিন্ন রঙ মিশিয়ে আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য আঁকতে লাগলো। অন্য দিকে রোমানরা তাদের জায়গা ঘষা-মাজার কাজেই ব্যস্ত রইলো। পরীক্ষার সময় শেষ হলে বাদশাহ তাদের কাজ দেখার জন্য এলেন। প্রথম তিনি চীনাদের জায়গায় গেলেন। তাদের কারুকার্য বাদশাহকে বিস্মিত করলো। এরপর বাদশাহ রোমানদের জায়গায় গেলেন। রোমানরা নিজেদের দেয়াল থেকে পর্দা ওঠালে দেখা গেলো ঘষা মাজা করে তাদের দেয়ালকে তারা আয়না বানিয়ে ফেলেছে। তাদের আয়নায় চীনদের কারুকার্যের ছায়া পড়েছে। চারপাশের দৃশ্য ও কারুকার্য সব মিলিয়ে রোমানদের দেয়ালটাই বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছিলো। বাদশাহ দীর্ঘক্ষণ আয়নার দৃশ্য দেখলেন। তারপর বাদশাহ ফায়সালা ঘোষণা করলেন, রোমানরাই বিজয়ী।

এই সুন্দর গল্পটি লিখেছেন মাওলানা রূমী রহ.। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের উচিত সব সময় নিজের অন্তর পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, কৃপণতা ও লোভ-লালসার মতো কদার্যতা মুছে অন্তরকে আয়নার মতো স্বচ্ছ ও ঝকঝকে করে তুললে অন্তরে আল্লাহর তাজাল্লী এবং সৌন্দর্য প্রতিফলিত হবে। তখন তার ব্যক্তিত্ব এতো সুন্দর হয়ে যাবে যে, সবাই তার প্রতি আকর্ষিত হবে। যে তাকে দেখবে, সেই শ্রদ্ধা করবে। সবাই তাকে পছন্দ করবে।

রমযান মাস বিশেষভাবে অন্তরের স্বচ্ছতা, আত্মিক উন্নতি এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস। এমনিতেই তো এ মাসের সব ইবাদত রোযা, সদকা, তারাবীহ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইতেকাফ এ জন্য যে, যেনো সর্বপ্রকার গুনাহের ময়লা

থেকে পরিস্কার হয়ে অন্তর আয়নার মতো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। তবে বিশেষভাবে কুরআন শরীফের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তর স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়। নবী সা. বলেন,

إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ وَمَا جِلاَؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ

মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে। যেমন লোহা পানিতে ভিজলে মচিরা পড়ে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল সা., অন্তরের মচিরা দূর হয়ে কীভাবে আবার তা উজ্জ্বল হবে? রসূল সা. বললেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করলে এবং কুরআন তেলাওয়াত করলে অন্তরের মরিচা দূর হয়।

রমযান মাসে মুসলমানরা বিশেষভাবে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তারাবীর নামাযে কুরআন পড়ে ও শোনে। মুসলমানদের প্রায় সব এলাকাতেই গুরুত্বের সাথে তারাবীতে কুরআন পড়া ও শোনার ব্যাবস্থা হয়। তারাবী ছাড়াও এই মোবারক মাসে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত বেশি হয়। অন্তত এক খতম কুরআন পড়াকে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমান অন্তরকে সর্বপ্রকার চারিত্রিক কদর্যতা এবং গুনাহের মরিচা থেকে পরিস্কার করার জন্য সঠিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে।

কিন্তু বড় আক্ষেপ হয় যখন দেখি, এ আমলের প্রতি মুসলমানের সীমাহিন ভালোবাসা আছে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে করছেও, কিন্তু তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হচ্ছে না। গুনাহের মরিচা দূর হচ্ছে না। কুরআন শরীফ পড়া এবং শোনার এতো গুরুত্ব থাকার পরও অন্তরে লোভ-লালসা, বিদ্বেষ, হিংসা, নিফাকি এবং কদার্যতা রয়েই যাচ্ছে। বংশীয় কলহ-বিবাদ, একে অন্যের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা, অপরের অধিকারের ব্যাপারে উদাসীন থাকা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, সন্তানের হকের ব্যাপারে অমনযোগিতা ইত্যাদি স্বভাব থেকেই যাচ্ছে। অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির উপায় বর্ণনাকারীদের সংখ্যাও তো কম না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মানুষের অন্তর পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না। এর কারণ হলো, কুরআন তেলাওয়াতের হক আদায় হচ্ছে না। কুরআন তেলাওয়াতের অর্থ কখনোই এটা নয় যে, আপনি শুধু কুরআনে কারিমের শব্দগুলো মুখে আওড়ে গেলেন। আল্লাহ কী বললেন কিছুই বুঝলেন না। কুরআনে আল্লাহ কী বলছেন তারা না বুঝে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ না করে শুধু শব্দগুলো আওড়ানোর ফলেই তেলাওয়াতের ফায়দা মানুষ পাচ্ছে না।

কুরআন তেলাওয়াতের অর্থ হলো, বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা। এর বক্তব্য ও শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কুরআনের বিধি-বিধান, শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা বুঝে তার ওপর আমল করা। কুরআন তেলাওয়াতের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো এর প্রচার-প্রসার করা। কুরআনের শিক্ষা ও বার্তা অন্যদের কাছেও পৌঁছে দেয়া। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রসূল সা.-এর বিভিন্ন কথা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ

আমি তাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দিয়েছি তা যারা সত্যভাবে বুঝবার মতো পাঠ করে, তারাই এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।[১১৬]

এ আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো এক. আল্লাহ তাআয়ালা বলেছেন, 'তিনি যাদেরকে কিতাব দিয়েছেন' পুরো কুরআনে যেখানে যেখানে আহলে কিতাবদের কিতাব দেয়ার আলোচনা এসেছে, ওই সব আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায়, আহলে কিতাবদের মধ্যে দুটি দল ছিলো। এই উভয় দলের আলোচনা আল্লাহ তাআলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে করেছেন। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কিতাবের সংরক্ষক ছিলো এবং এর ওপর আমল করতো, তাদের আলোচনার সময় আল্লাহ তাআলা কিতাব দেয়ার নিসবত নিজের দিকে করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ 'ওই সমস্ত লোক যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি। এ দিকে খেয়াল রেখে ওপরের আয়াতটি আবার পড়ুন। আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, আল্লাহ এখানে বলছেন, কুরআন তেলাওয়াতের হক তারাই আদায় করে যারা বাস্তবে এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ওই সব লোকের তেলাওয়াতের কোনো গুরুত্ব নেই যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করে না।

দুই. 'কিতাবের তেলাওয়াতের হক আদায়কারীরাই কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখে' এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। গভীরভাবে ভেবে দেখুন। কুরআন বলে, যারা কিতাবের সংরক্ষণ করে, এর তেলাওয়াতের হক আদায় করে, তারাই এর প্রতি ঈমানের দাবিতে সত্য। এ কথাটাই আল্লাহর রসূল সা. এভাবে বলেছেন। রসূল সা. বলেছেন,

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

ওই ব্যক্তি কুরআনের ওপর বিশ্বাস রাখে না, যে তার হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে।

---

[১১৬] সুরা বাকারা (আয়াত: ১২১)

অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবিতে ওই ব্যক্তিই সত্যবাদী, যে কুরআনের বিধান হালাল ও হারামকে মেনে নেয় এবং বাস্তব জীবনে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। য কুরআনের হালাল ও হারামের পরোয়া করে না, তার কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাবির কোনো মূল্য নেই। এই ব্যক্তি যদি কুরআনের আয়াত বারবার পড়ে, রমযানে মোবারক সময়ে বিশেষ গুরুত্বের সাথে তা পড়ে ও শোনে, তার এ তেলাওয়াত তার কোনো কাজে আসে না। কারণ সে কুরআন তেলাওয়াতের হক আদায় করছে না। তার তেলাওয়াত ওই তেলাওয়াত নয়, কুরআনে আল্লাহ যে তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী করিম সা. যে তেলাওয়াতের গুরুত্ব বয়ান করেছেন।

কুরআন শরীফের আরেকটি আয়াত নিয়ে একটু চিন্তা করুন। হযরত ইবরাহীম আ. মুহাম্মাদ সা.-কে প্রেরণের জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তাতে তার চারটি কাজের কথা বলেছেন।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

হে আমাদের রব! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করুন, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের সামনে তেলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১১৭]

আয়াতে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে,

এক. কুরআন তেলাওয়াত।

দুই. কুরআন শিক্ষা।

তিন. হিকমত শিক্ষা।

চার. পরিশুদ্ধি।

এই আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের আয়াতের প্রচার-প্রসার এবং এর শিক্ষা ও বার্তা মানুষকে শেখানো। অন্য আয়াতে নবী সা.-কে বলা হয়েছে,

وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ

তোমার ওপর অবতীর্ণ তোমার রবের কিতাব থেকে পাঠ করে শোনাও।[১১৮]

---

[১১৭] সুরা বাকারা (আয়াত: ১২৯)

[১১৮] সুরা কাহফ (আয়াত: ২৭)

কুরআন ও সুন্নাহর এসব বক্তব্য থেকে কুরআন তেলাওয়াতের যে অর্থ স্পষ্ট হয়, সে অর্থে তেলাওয়াতই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তেলাওয়াত। এই তেলাওয়াত তারাই করে এবং তাদেরই কাজে আসে, যাদের জীবন কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যারা নিজের জীবনে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে কুরআনের আহকামের ওপর আমল করে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, কুরআনের বিধি বিধান ও শিক্ষাই তার জন্য দুনিয়া-আখেরাতে সফলতা ও শান্তি অর্জনের একমাত্র পথ। এ বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত এবং কুরআনের বিধি বিধানের ওপর আমল থেকে বিচ্যুত ব্যক্তি যদি কুরআন পড়ে অথবা শোনে, তাহলে এটা বলা যায় না যে সে কুরআন তেলাওয়াতের হাদিসে বর্ণিত ফায়দা লাভ করতে পারছে।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর সাথে যদি নবী সা. কিছু হাদীসও সামনে রাখা হয়, তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। হযরত উবায়দা মুলায়কি রা.-থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

> يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوْا الْقُرْآنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوْهُ وَتَغَنُّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تَعَجَّلُوْا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا.
>
> হে কুরআনের বাহকগণ! কুরআনকে বালিশ বানাবে না। বরং তা তোমরা রাত-দিন তেলাওয়াত করার মতো তেলাওয়াত করবে। কুরআনের শিক্ষা প্রচার করো, এর শব্দগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করো এবং কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো। তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করবে। দুনিয়ায় তড়িঘড়ি এর প্রতিফল পাওয়ার চেষ্টা করো না। কারণ আখিরাতে এর উত্তম প্রতিফল রয়েছে।[১১৯]

'কুরআনকে বালিশ বানানো'র অর্থ হলো, কুরআনের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া। রসূল সা. হক আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর রসূল সা. হক আদায় করে তেলাওয়াত করার ব্যাখ্যায় চারটি কথা বলেছেন।

এক. কুরআনের প্রচার প্রসার করা।

দুই. কুরআনের শব্দাবলিকে বিশুদ্ধভাবে আদায় করা।

---

[১১৯] মিশকাতুল মাসাবীহ

তিন. কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

চার. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা। দুনিয়ায় কোনো প্রতিফল পাওয়ার উদ্দেশ্য থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখা।

একবার হযরত আবু যর রা. রসূল সা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ : أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ أَزين لِأَمْرِكَ كُلَّهُ قُلْتُ : زِدْنِيْ قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِيْ السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِيْ الْأَرْضِ

ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অসিয়ত করুন। তখন রসূল সা. বললেন, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আল্লাহর ভয় তোমার দীন ও দুনিয়ার সবকিছুকে সুন্দর করে দেবে। হযরত আবু জর রা. আবার আবেদন করলেন, হুযুর! আরো কিছু অসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেন, কুরআনের তেলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকির নিয়মিত করতে থাকো। এই আমল আসমানে তোমাকে স্মরণ করার কারণ হবে এবং জীবনের অন্ধকারে তোমার জন্য আলো স্বরূপ হবে।

কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিতে ওই সব মানুষ কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়, যারা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কুরআনের শব্দাবলি পড়ে এবং এর হেদায়েত ও শিক্ষা থেকে গাফেল থাকে। তারা আল্লাহর বিধি বিধান জেনে তার ওপর আমল করার লক্ষ্য ছাড়াই কুরআন পড়া, শোনা, খতম করা এবং করানোকে কৃতিত্বের বিষয় মনে করে। কিন্তু কুরআন হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর কাছে কুরআন ওয়ালা তারাই, যারা নিজের জীবনে কুরআন অনুযায়ী আমল করে। কুরআনকে নিজের জীবনের সংবিধান হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। রসূল সা. বলেন,

يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِيْ الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

> কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআনের বাহক যারা কুরআন অনুযায়ী দুনিয়াতে আমল করতো তাদেরকে আনা হবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান সামনে থাকবে। আমার মনে আছে, রসূল সা. সূরা দুটি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ সূরা দুটি দু' খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের মতো অথবা দুটি কালো চাদরের মতো ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে, যার মাঝখানে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু' ঝাঁক পাখি থাকবে; তারা এই দুই সূরার পাঠকদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দেবে।[১২০]

এই হাদিসে 'কুরআনের বাহক' বলে রসূল সা. নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِيْ الدُّنْيَا (দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করতো) অর্থাৎ কুরআনের বাহক প্রকৃতার্থে তারাই যারা দুনিয়ার জীবনে কুরআনের হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমল করে। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে আজও রমযানের রাতে পবিত্র কুরআন পড়া, পড়ানো এবং শোনা ও শোনানোর বিশেষ প্রচলন রয়েছে। মুসলমানদের অনেক এলাকাতেই এই চলে আসা রীতি গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। কিন্তু যখন আমরা জরিপ করলাম, নবী সা. কুরআন তেলাওয়াতের যেসব ফায়দা বর্ণনা করেছেন, কুরআনের পাঠক ও শ্রোতারা তা লাভ করছে কি না, তখন আমরা হতাশ হলাম। মুসলমানদের জীবনে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব রয়েছে এমন সুধারণা ভুল মনে হতে লাগলো। মুসলমানরা কুরআন পড়ে ও শোনে; কিন্তু তারা কুরআন তেলাওয়াতের ওই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অনবহিত, যা কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণনা করেছে এবং তাদের তেলাওয়াত ওই কুরআন তেলাওয়াত নয়, যার গুরুত্ব আল্লাহ ও রসূল দিয়েছেন।

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو
کتاب خواں ھے مگر صاحبِ کتاب نہیں

কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়
কারণ তুমি কিতাবের পাঠক, কিন্তু কিতাবের বাহক নও তুমি

---

[১২০] মুসলিম শরিফ (হাদীস: ১৯১২)

মৃত্যুর দুয়ারে

চিকন সুতোয় বাঁধা মৃত্যুর তরবারি আপনার মাথার ওপর ঝুলছে। কেউ জানে না, এই সুতো কবে ছিড়ে যাবে এবং মৃত্যুর তরবারি আপনাকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে। এই জীবন আপনাকে কাটাতে হচ্ছে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে। কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলতে পারছেন না আপনার জীবনের আর কতোটা সময় বাকি আছে। যে কোনো মুহূর্তেই আপনাকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। আপনার ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে যেতে হবে, ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হবে। পরকালের ওপর আপনার বিশ্বাস থাকলেও যেতে হবে। বিশ্বাস না থাকলেও যেতে হবে। মোটকথা, একদিন না একদিন আপনাকে এই দুনিয়া ছাড়তে হবেই॥ প্রতিটি প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।[১২১]

মৃত্যু থেকে বাঁচার মতো কোনো আশ্রয়স্থল মানুষের নেই। মানুষ যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, সে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না। মৃত্যু থেকে বাঁচা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ

তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।[১২২]

মৃত্যুর নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু হবে। কোনো শক্তি আপনাকে নির্ধারিত সময়ের বেশি পৃথিবীতে রাখতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য একটি সময়কাল নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ হওয়ার পর কাউকে কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

কিন্তু যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১২৩]

মৃত্যু এমন একটি সুনিশ্চিত বাস্তবতা, যার জন্য অকাট্য কোনো প্রমাণাদির প্রয়োজন নেই। অসংখ্য অগণিত মানুষ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। যারা

---

[১২১] সূরা আলে ইমরান (আয়াত: ১৮৫)

[১২২] সূরা নিসা (আয়াত: ৭৮

[১২৩] সুরা মুনাফিকুন (আয়াত: ১১)

জীবিত আছে, অবশ্যই তাদেরকেও একদিন এর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। যারা ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আসবে তাদেরকেও নিশ্চিতভাবেই একদিন মৃত্যু বরণ করতে হবে।

ভাবনার বিষয় হলো, মৃত্যুকে আপনি কীভাবে এবং কী অবস্থায় আমন্ত্রণ জানাবেন। জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আপনার অবস্থা আপনার আসল ঠিকানা নির্ধারণ করবে। আপনি হয়তো সম্মানিত হবেন অথবা অপমানিত হবেন। প্রাচ্যের এক কবি কত সুন্দর বলেছেন, যদি তুমি কোনো মানুষকে তার প্রকৃত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেখতে চাও, তাহলে অপেক্ষা করো। তার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করো। মানুষ নিজের আসল চেহারার ওপর অনেক পর্দা টেনে রাখে। মৃত্যুর সময় তার সব কৃত্রিম পর্দা দূর হয়ে যায়। তার রূহ মৃত্যুর আওয়াজ শোনা মাত্র সব পর্দা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। সে অনাবৃত অবস্থায় পৃথিবীর সামনে হাজির হয়।

আসলে এমনই হয়। মানুষের অনাবৃত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র জীবনের শেষ মুহূর্তেই সামনে আসে। শেষ মুহূর্তে বলে দেয়া যায়, মানুষ দুনিয়া থেকে সফল হয়ে যাচ্ছে না ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে মুমিনরা জীবনভর এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। এটাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় আকঙ্খা। ইসলাম তাকে এ শিক্ষাই দিয়েছে। কেউ মারা গেলে তার জানাযায়ও মুমিনরা বলে

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

পরওয়ারদেগার! আমাদের মধ্যে যাকে আপনি মৃত্যু দেবেন, তাকে ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু দিন।

জানাযার নামাযে পঠিত দোয়ার এই শব্দাবলি আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় আমাদেরও একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এটা মেনে নিয়ে আমরা বলি, পৃথিবী ছেড়ে আমরা তো একদিন বিদায় নেবোই, হে পরওয়ারদেগার! যখন আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবে, তখন যেনো আমাদের হৃদয় ঈমানের নুরে আলোকিত থাকে।

জীবনের সুতো কখন ছিড়ে যাবে, মৃত্যুর দরজা কখন খুলবে, কোথায় খুলবে এটা কারোরই জানা নেই। এটা শুধু অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী সর্ব শক্তিমান আল্লাহই জানেন। যেমন কুরআন বলছে,

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং

> কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।[১২৪]

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আপনি এ সম্ভাবনার মধ্যে থাকেন যে, এটাই আপনার জীবনের শেষ মুহূর্ত হতে পারে। পরের মুহূর্তটিই হতে পারে আপনার মৃত্যুর মুহূর্ত। আপনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অন্য জগতের দিকে যে কোনো মুহূর্তে রওয়ানা হতে পারেন।

কেউ কি দাবি করতে পারবে সে নিশ্চিতভাবে আরও এক ঘণ্টা বেঁচে থাকবে? তাহলে নিজে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন, এই মহূর্তে আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? আল্লাহর কাছে ঈমানের সাথে মৃত্যু দেয়ার দোয়া আপনি কতটুকু একনিষ্ঠতার সাথে করছেন? ভবিষ্যতের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আপনি হঠাৎ পরপারে পাড়ি জমানোর আশংকার মধ্যে থাকবেন। এই আশংকার অনুভূতি কি আপনার আছে? আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন? ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তই এমন অবস্থায় কাটান, যে অবস্থায় আপনি মৃত্যু বরণ করতে চান।

এটা আপনার সারা জীবনের সফলতা আর ব্যর্থতার ব্যাপার। আপনার সুন্দর সমাপ্তি বা খাতেমা বিল খাইর শুধু আপনিই নিশ্চিত করতে পারেন। অন্য কেউ এ ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা করতে পারবে না। অন্যকে আশ্বস্ত করে কোনো লাভ নাই। আপনি নিজেকে নিজে আশ্বস্ত করুন। নিজের অন্তরকে নিজে শান্ত করুন। আখেরাতের পরিণামফল শুধু আপনাকেই ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয় কেউ আপনার সাথে শরিক হবে না। ওই ব্যক্তি কতো ভাগ্যবান যে ঈমানের মহাদৌলত নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। মৃত্যুর ওপারে মানুষ কেমন থাকে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তবে মানুষের মৃত্যুর সময় দেখে মানুষ বলে দিতে পারে, বিদায়ী ব্যক্তি কেমন এবং তার কেমন পরিণতি আশা করা যায়।

ইতিহাসের পাতায় কতো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে! নীচে আমরা তিনজন বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্তের অবস্থা উল্লেখ করবো। তাদের ঘটনা পড়ে নিজের ঈমান তাজা করুন এবং দোয়া করুন, মহামহিম রব যেনো আমাদের মৃত্যুও এরকম সুন্দর অবস্থায় দান করেন।

উম্মুল মুমিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমার সম্মানিত পিতা মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি একবার বেহুশ হয়ে পড়েন। আমি বললাম, আফসোস! আমার বাবার অসুস্থতা সম্ভবত বেড়ে গেছে। আমার কথা শুনে তার

---

[১২৪] সুরা লুকমান (আয়াত: ৩৪)

চোখ খুলে গেলো। তিনি বললেন, আয়েশা! এটা অসুস্থতা নয়। এটা ওই জিনিস যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

মৃত্যুযন্ত্রনা সত্যই আসবে। যা হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছো।[১২৫]

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রসূল সা.-কে কয়টি কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিলো?

আমি বললাম, তিন কাপড়ে।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সপ্তাহের কোন বারে তার মৃত্যু হয়েছিলো?

আমি বললাম, সোমবার।

আবু বকর রা. বললেন, আমি আমার রবের কাছে দোয়া করছি, আজ রাত ও দিনের মাঝে যেনো আমার মৃত্যু হয়। তারপর তিনি নিজের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরো দুটি অতিরিক্ত কাপড় মিলিয়ে এ কাপড়েই আমাকে দাফন করবে।

আমি বললাম, এটা তো পুরাতন কাপড়।

তিনি বললেন,

اَلْحَيُّ اَحْرَجُ اِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ اِنَّمَا لِلرِّيْمِ

মৃত মানুষের চেয়ে জীবিত মানুষের নতুন কাপড় বেশি দরকার। আর এ পোশাক তো পুঁজ এবং রক্তের জন্য।

তিনি যখন শেষ নিশ্বাসগুলো ফেলছিলেন, তখন হযরত ইউসুফ আ. এর দোয়া তার যবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো–

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অনুগত বান্দা হিসেবে মৃত্যু দিও এবং আমাকে নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

হযরত আমর ইবনুল আস রা. যখন শেষ সময়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি নিজের দুই হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে বললেন,

হে মাওলা! তুমি হুকুম দিয়েছো, আমি তোমার হুকুম অস্বীকার করেছি।

পরওয়ারদেগার! তুমি নিষেধ করেছো, আমি অমান্য করেছি।

ইয়া আল্লাহ! আমি নিরপরাধ নই যে নিজেকে নির্দোষ দাবি করবো।

---

[১২৫] সুরা কাফ (আয়াত: ১৯)

শক্তিশালী নই যে বিজয়ী হবো।

মালিক! যদি তোমার রহমত না থাকে, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

তারপর তিনবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যায়।

কারবালায় রসূল সা.-এর দৌহিত্রের ওপর শত্রুরা চতুর্দিক থেকে আক্রমন করেছিলো। তিনিও তরবারি চালাচ্ছিলেন। অনেক সৈন্যের সাথে তিনি একা লড়ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার বলেন, আমি বর্শা দিয়ে হযরত হুসাইন রা. এর ওপর আক্রমণ করি। তার একদম কাছাকাছি চলে যাই। আমি ইচ্ছা করলে তাকে মেরেও ফেলতে পারতাম। কিন্তু আমি ভাবলাম, আমি এ গুনাহ্ নিজের কাঁধে কেনো নেবো? ডান, বাম সবদিক থেকেই তো তার ওপর হামলা হচ্ছে। তিনি শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন। তার পরনে ছিলো লম্বা জামা। মাথায় পাগড়ি। আল্লাহর কসম! আমি কখনো কোনো ভগ্ন হৃদয়কে এতো বীরত্বের সাথে লড়তে দেখিনি। তার গোটা পরিবারকে তার চোখের সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। তবুও তার বাহাদুরি, বীরত্ব ও সাহসিকতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি যে দিকে ফিরতেন, সে দিক থেকে শত্রু এমনভাবে পালাচ্ছিলো, যেভাবে বাঘকে দেখে বকরি পালায়। দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থা চলছিলো। ইতোমধ্যে তার বোন হযরত যয়নব বিনতে ফাতেমা রা. তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তার কানে বালু ঢুকেছিলো। যন্ত্রণায় তিনি জোরে চিৎকার করছিলেন।

হযরত হোসাইন রা. তৃষ্ণার্ত ছিলেন। পানি পান করার জন্য তিনি ফোরাতের দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ শত্রুদের দিক থেকে একটি তীর এসে তার গলায় ঢুকে গেলো। তিনি তীরটি টেনে বের করলেন। তারপর হাত উঠিয়ে দেখলেন, উভয় হাত রক্তে ভরে গেছে। তিনি তার রক্তমাখা হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, হে মাওলা! আমার সব অভিযোগ আমি তোমার কাছেই পেশ করছি। দেখো! তোমার রসূলের দৌহিত্রের সাথে কী আচরণ করা হচ্ছে। যুরআ ইবনে শারীক এগিয়ে এসে প্রথমে তার বাম হাতে আঘাত করলো। তারপর ঘাড়ে আঘাত করলো। তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়লেন। সিনান ইবনে আনাস এগিয়ে এসে বর্শা দিয়ে আঘাত হানলো। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপর ওই জালিম রসূলের দৌহিত্রের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেললো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহর রহমত লাভের আশা

আপনি আল্লাহর রহমত লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। এটাই হওয়া উচিত। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া তো কুফরি। কাফের আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। মুমিন কখনো নিরাশ হয় না। সে সব সময় আশায় থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

> আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ, আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউ নিরাশ হয় না।[১২৬]

আল্লাহর রহমতের আশা আপনি করতে পারেন কারণ আপনার অন্তরে ঈমান আছে। ঈমানের বদৌলতে মানুষ উভয় জগতে সফলতা ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। তবে ভাববার বিষয় হলো আপনি সত্যিকারের রহমতের আশাবাদী নাকি ধোঁকায় পড়ে আছেন। আপনি শুধু আপনার দৃষ্টিতেই আল্লাহর রহমতের আশাবাদী নাকি আল্লাহর কাছেও রহমতের আশাবাদী। প্রকৃত রহমতের আশাবাদী তো সে, যাকে আল্লাহও নিজের রহমতের আশাবাদী হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

আসুন, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, কুরআন ও সুন্নার আলোকে এটা বোঝার চেষ্টা করি যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী বলার যোগ্য কে? রহমতের আশাবাদী ব্যক্তির মর্যাদা কী এবং এই আশাবাদ তার আমলী যিন্দেগীতে কী প্রভাব ফেলে? আল্লাহর রহমতের আশা করার দাবি তো সবাই করে। কিন্তু সবার দাবি কি সত্য হয়? কেউ কেউ এ ব্যাপারে শুধুই ধোঁকায় নিমজ্জিত।

আপনি আপনার ফসলি জমির ব্যাপারে আশাবাদী থাকেন যেনো এর থেকে আপনি ভালো ফসল লাভ করতে পারবেন। তবে আপনার এই আশাবাদ তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, যখন আপনি ভালো ফসল লাভের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে জমিকে বীজ ও চারা রোপনের উপযোগী করে তোলেন। তারপর তাতে উন্নত প্রকারের বীজ রোপন করেন। ফসল ঘরে তোলার আগ পর্যন্ত আপনি বিরামহীন কাজ করে যান। ফসল যেনো ভালো হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক ও মনোযোগী থাকেন। কারণ আপনি আশাবাদী যে এই জমি ভালো ফসল দেবে। আশাবাদী হওয়ার কারণেই আপনি এতো পরিশ্রম করেন। যদি কেউ ফসলি যমিতে হালচাষ না করে। উন্নত চারা

---

[১২৬] সুরা ইউসুফ (আয়াত: ৮৭)

রোপন না করে। পানি দিতে কষ্ট হয় বলে পানি দিতেও অবহেলা করে। এরপর বলে সে ভালো ফসলের ব্যাপারে আশাবাদী, যদি বলে আশাবাদ বেশি থাকার কারণেই সে বেশি কষ্ট করতে চায় না, তাহলে মানুষ তাকে নির্বোধ এবং মূর্খ ছাড়া আর কিছুই বলবে না।

আপনি ব্যাবসা-বাণিজ্য করেন। নিজের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান থেকে লাভবান হওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ব্যাবসার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজির ব্যাবস্থা করেন। সময় দেন। কায়িক শ্রম দেন। অক্লান্তভাবে এর জন্য দৌড়-ঝাঁপ করেন। ব্যাবসার সব চাহিদা পূরণ করে আপনি যখন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হন যে, ব্যাবসা লাভজনক করার জন্য যা কিছু করা দরকার, সবই আপনি করেছেন, চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি, তখন আশা করেন, আল্লাহর অনুগ্রহ হলে লাভের মুখ দেখবেন। কোনো ব্যাবসায়ী যদি নিজের ব্যাবসার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই না করে বসে বসে আশা করতে থাকে যে, এমনিতেই তার ব্যাবসা লাভজনক হয়ে যাবে, তাহলে আপনি কি তাকে আশাবাদী মানুষ বলবেন? নিঃসন্দেহে আপনি তাকে বোকা এবং নির্বোধই মনে করবেন।

আপনি পড়াশোনা করেন। পরীক্ষায় শরিক হয়েছেন। ভালো নম্বর পেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জনের ব্যাপারে আশাবাদী হয়েছেন। নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় ভালো নম্বরে পাশ করার আশা আপনার মনে আছে। কিন্তু আপনি পরিশ্রম করেন, ঘাম ঝরান, দিন রাত আল্লাহ আল্লাহ করেন। দিন রাত এক করে ঘুম, আরাম, শান্তি সব বিসর্জন দিয়ে আপনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। দুনিয়ার সবকিছুর ব্যাপারে আপনি বেখবর থাকেন। আপনার চিন্তা শুধু একটাই থাকে যে, পরীক্ষায় ভালো করতে হবে।

আপনিই বলুন, আপনি যদি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নেন, পরিশ্রম না করেন, অলস সময় কাটাতে থাকেন, এরপর আবার ঈর্ষনীয় সফলতার আশাও করেন, তাহলে এটা কি আশা করা হবে না মূর্খতা হবে? নিশ্চিই আপনার দৃষ্টিতেও এটা আশাবাদ নয়, বরং সীমাতিরিক্ত বোকামি। দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে যখন কেউ আশাবাদী হয়, তখন সে আশাবাদের অর্থ পরিশ্রম করাই বোঝে। যা সে পেতে চায় তা পাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে তারপর আশাবাদী হয়। যুক্তির দাবি হলো, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারেও আশাবাদ এমনই হওয়া উচিত। কারো কাজকর্ম দেখে যখন মনে হবে সে আল্লাহর রহমত পেতে চায়, আল্লাহর রহমত লাভ করার আশা করে, তখনই তাকে আশাবাদী হিসেবে গণ্য করা হবে।

কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর রহমত লাভের ব্যাপারে সত্যিকারের আশাবাদী ওই ব্যক্তি, যে একজন আশাবাদী কৃষকের মতো ঈমানের বীজ নিজের

অন্তরের যমীনে রোপন করে তারপর অন্তরকে গুনাহ থেকে থেকে মুক্ত রাখে এবং তাতে ইবাদতের পানি সিঞ্চন করে, এমন ব্যক্তি প্রতিদিন দীনের পথে আরও অগ্রসর হয়। নিজের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি যত্নবান হয়। আল্লাহর রহমত লাভের আশা ও শাস্তির ভয় তার মধ্যে বাড়তে থাকে। সে ঈমানের হেফাযতের ব্যাপারে সজাগ থাকে। দীনি দায়িত্ব পালনে কখনো উদাসীন হয় না।

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার আশা করে, সে নিশ্চই সব সময় এই চিন্তা করবে কীভাবে রবের কাছে ক্ষমাযোগ্য, প্রিয় এবং জান্নাতের তুলনাহীন নেয়ামত লাভের উপযুক্ত হওয়া যায়। এটা কীর্ভাবে সম্ভব যে সে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের আশাও রাখবে আবার তার আনুগত্য ও ইবাদতে অলসতাও করবে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে চলবে আবার রহমতের আশাও করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا.

অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।[১২৭]

এটা আল্লাহর রহমতের আশা নয়; বরং মূর্খতা ও নির্লজ্জতা। আল্লাহর রহমত তো ওই সব বান্দাদের জন্য, যারা নিজের জীবনকে নেক আমল দিয়ে সাজায় এবং উত্তম চরিত্র ও কীর্তির মালিক হয়। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

নিশ্চই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।[১২৮]

আল্লাহর রসূল সা. ওই ব্যক্তিকে জ্ঞানশূন্য এবং দুর্বল বান্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন, যে প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে পড়ে থাকে আর আল্লাহর কাছে বিভিন্ন ধরণের আশা করে। রসূল সা. বলেন,

وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

দুর্বল ও নিঃস্ব ওই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির পেছনে পরে থাকে, আর আল্লাহর কাছে বিভিন্ন ধরনের আশা করে।[১২৯]

---

[১২৭] সুরা আরাফ (আয়াত: ১৬৯)

[১২৮] সূরা আরাফ (আয়াত: ৫৬)

[১২৯] তিরমিযী শরীফ (হাদীস: ২৪৫৯)

মোটকথা আল্লাহর রহমত লাভের আকাঙ্খার অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। খুব কঠিন অবস্থায় পড়লেও আল্লাহর রহমত লাভের আশা করা। ইয়াকুব আ. নিজের প্রিয় ছেলেকে হারালেন। তারপর যাকে দেখে ইউসুফের কথা ভুলে থাকতেন, উপায়ান্তর না দেখে তাকেও ভাইদের সঙ্গে মিশরের দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। এরপর যখন শুনলেন মিসরের বাদশা তাকে আটকে রেখেছে, তখন তার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিলো তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সেই অবস্থায়ও তিনি ছেলেদের বলেছিলেন,

وَلَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। কারণ, আল্লাহর থেকে কাফের সম্প্রদায় ছাড়া কেউ নিরাশ হয় না।[১৩০]

একজন সত্যিকার মুমিন সব সময় আল্লাহর রহমত লাভের আশা করে। কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই তার রহমত থেকে নিরাশ হয় না। পাশাপাশি সে নিজেকে আল্লাহর কাছে তার রহমতের আশাবাদী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর থেকে রহমতের আশা রাখে, আল্লাহ তাকে কখনো নিরাশ করেন না। তবে আশাবাদী কাকে বলে বা তাদের কাজকর্ম কেমন হয় তা কুরআনের আলোকে আমাদের বুঝতে হবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।[১৩১]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে রহমতের আশাবাদী হলো, যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য ব্যাবসা-বাণিজ্য, পরিবার এবং মাতৃভূমি ছাড়তে এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ বলতেন, এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে যে মানুষ দোযখের বীজ বপন করে জান্নাত পাওয়ার আশা

---

[১৩০] সূরা ইউসুফ (আয়াত: ৮৭)

[১৩১] সূরা বাকারা (আয়াত: ২১৮)

করে। নেককারদের মর্যাদা পেতে চায়, কিন্তু বদকারদের কাজ করে বেড়ায়। ভালো কাজ না করেই সওয়াব ও প্রতিদান প্রত্যাশা করে।

কৃতজ্ঞতা ও কল্যাণকামী

ঘটনাটি বিস্ময়কর। যুগ যুগ ধরে বর্ণিত হয়ে আসছে। আল্লাহই জানেন ঘটনাটি সত্যি নাকি মনগড়া। তবে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য ঘটনাটি শিক্ষণীয়।

অতীত কালের কথা। এক বাদশা তার গোলামের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। সব সময় তিনি তার ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করতেন। গোলাম তার অধীনে সুখে সাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলো। একদিন বাদশাহ গোলামের কোনো কাজে তার ওপর রেগে গেলেন এবং খুব কঠিন ভাষায় তাকে গালমন্দ করলেন। গোলাম কখনো এরকম গালমন্দ শোনেনি। দয়া আর অনুগ্রহেই সে অভ্যস্ত ছিলো। সে খুব দুঃখ পেলো। দুঃখ মনে চেপে সে আরও কিছু দিন রাজপ্রাসাদে রইলো। তারপর একদিন কাউকে কোনো কিছু না বলেই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেলো। বাদশাহ গোলামের খোজে চতুর্দিকে লোক পাঠালেন। লোকজন সবদিকে খোজাখুজি করলো; কিন্তু গোলামের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। বাদশা গোলামের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতেন। বাদশাহ খুব কষ্ট পেলেন। তিনি নিজের গোলামের সঙ্গে সব সময় ভালো আচরণ করেছেন, তাকে স্নেহ করেছেন, নানা উপহার দিয়েছেন, এতো ভালোবেসেছেন আর একদিন রাগের মাথায় কিছু একটা বলতেই সে পালিয়ে গেলো! এতো দিনের সব অনুগ্রহের কথা ভুলে গেলো! বাদশাহ ঠিক করলেন, কোনো দিন গোলামটিকে ধরতে পারলে তিনি তার মাথা উড়িয়ে দেবেন।

এদিকে গোলাম যদিও বাদশাহকে ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু বাদশার উত্তম আখলাক ও তার অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারেনি। যখনই বাদশাহের ভালো ব্যবহারের কথা তার মনে পড়তো, বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তার মন অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু বাদশার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সাহস হতো না। এ অবস্থায় বেশ কিছু দিন কেটে গেলো। অবশেষে একদিন গোলাম সাহস করে অনুগ্রহকারী বাদশাহের প্রাসাদে উপস্থিত হলো। প্রহরীরা গোলামকে ধরে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করলো। গোলামকে আনা হচ্ছে শুনে বাদশাহ আগেই জল্লাদকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জল্লাদ কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে প্রস্তুত ছিলো। গোলাম উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে বাদশার কাছে আরয করলো, হুজুর! আমার গর্দান উপস্থিত। আপনার অনুগ্রহের বোঝা রয়েছে এর ওপর। আমার মাথা উড়িয়ে দিতে চাইলে নিশ্চই আমি বাঁধা দিতে পারবো না। কিন্তু এর আগে

আমাকে কয়েক মিনিটের সময় দিন, যেনো আমি আমার রবের কাছে একটু দোয়া করে নিতে পারি। বাদশাহ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, যা চাওয়ার চেয়ে নাও। তবে জেনে রেখো, তোমার মাথা উড়িয়ে দেয়ার ফায়সালা আমি আগেই করে ফেলেছি। বাদশাহ দোয়ার অনুমতি দিলে জল্লাদ পেছনে সরে গেলো। গোলাম দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বলতে লাগলো,

হে আমার রব! যে মনিব আজ আমার মাথা উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, তিনি জীবনভর আমার ওপর অনেক দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাকে আদর স্নেহও দিয়েছেন। পরওয়ারদেগার! আমার ওপর ওই মনিবের সীমাহিন ইহসান রয়েছে। পরওয়ারদেগার! তিনি আজ আমাকে হত্যা করছেন। আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার কাছে আবেদন করছি, কাল হাশরের মাঠে তুমি তাকে পাকড়াও করো না। আমি আমার ওপর অনুগ্রহকারীকে কাল হাশরের মাঠে লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখতে চাই না। পরওয়ারদেগার! আমার হত্যাকারীকে আমি নিজেই মাফ করে দিচ্ছি। তুমিও হাশরের মাঠে তাকে মাফ করে দিও। এই অনুগ্রহকারীর কাছে আমার জীবনের বহু সকাল ও সন্ধ্যা কেটেছে। তুমি তাকে এর চেয়েও বেশি ইজ্জত সম্মান দান করো।

গোলাম অন্তরের অন্তর্স্থল থেকে এই দোয়া করছিলো। আর বাদশাহের অন্তরের অবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছিলো। তিনি ভাবছিলেন, এ কেমন মানুষ! আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি আর সে আমার পরিণতির কথা ভাবছে! সে আমার পরকাল এবং শুভ পরিণামের চিন্তা করছে! পরকালীন শাস্তি থেকে আমার নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করছে। তার রাগ পানি হয়ে গেলো। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আগের চেয়ে আরো বেশি ইজ্জত-সম্মান দান করলেন। গোলাম পুনরায় সুখে স্বাচ্ছন্দে ও আনন্দে দিনাতিপাত করতে লাগলো।

বাদশার এরূপ আচরণে সভাসদরা বিস্মিত হলেন। একদিন বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর! আপনি তো ইচ্ছা করলে গোলামকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তার ওপর পূর্বের চেয়ে বেশি দয়া, অনুগ্রহ করতে শুরু করলেন কেনো। বাদশাহ সভাসদদের লক্ষ্য করে বললেন– আমি গোলামের মাঝে এমন দুটি ভালো গুণ দেখেছি যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি হলো, সে সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বান্দা। দীর্ঘ সময় তার ওপর জুলুম হয়েছে, তারপরও সে আমার অনুগ্রহের কথা ভোলেনি। সে আমার অনুগ্রহের হক আদায় করেছে। দ্বিতীয়টি হলো, সে আমার কল্যাণকামী। যদিও আমি আগে বুঝতে পারিনি। নিজের হত্যার ফরমান শুনে জল্লাদের হাতে উন্মুক্ত তরবারি

দেখার পরও আমার প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধা বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায়নি। সে পরকালে আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে। আমি তাকে হত্যা করছিলাম কিন্তু সে আমাকে লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্থ দেখতে চায় নি। তার থেকে বড় কোনো কল্যাণকামী হতে পারে না।

মানুষের দু'টি ভালো গুণ কৃতজ্ঞতা আর অপরের কল্যাণ কামনা। এই গুণ দু'টি মানুষকে অন্য মানুষের দৃষ্টিতে প্রিয় ও সম্মানিত বানায়, আল্লাহর দৃষ্টিতেও ওই বান্দা সম্মানিত ও প্রিয় হয়ে যায়।

ঈমানদার ব্যক্তি কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার হয়। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে বান্দা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করে বলে– الحمد لله رب العالمين। অর্থাৎ সকল প্রশংসা জগতসমূহের রবের। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতাই মানুষের ঈমান গ্রহণের পথ খুলে দেয়। বান্দা নিজের রবের কাছে প্রার্থনা করে– হে পরওয়ারদেগার, আমার সামনে এমন রাস্তা খুলে দিন, যে রাস্তায় আমি আপনার কৃতজ্ঞ ও অনুগত বান্দা হয়ে চলতে পারি। আমাকে যেনো আপনার অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা না হয়। আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুল করেন এবং তার জন্য ঈমান ও হেদায়েতের রাস্তা খুলে দেন।

রসূল সা. বলেছেন– ঈমানের স্বাদ ওই ব্যক্তি পায় যে অপরের কল্যাণকামী হয় এবং অন্যের জন্য তাই কামনা করে যা সে নিজের জন্য কামনা করে। সে যেমন চায়, কাল হাশরের মাঠে যেনো তাকে লজ্জিত না হতে হয় এবং তার স্রষ্টাও যেনো তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে, সে নিজের ভায়ের জন্যও এটাই চায় ও আকাঙ্খা করে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সা. ওই ব্যক্তির ঈমানের স্বাদ আছে বলে স্বীকৃতি দেন না, যে নিজের ভায়ের সত্যিকার কল্যাণকামী নয় এবং তার জন্য তাই কামনা করে না যা সে নিজের জন্য কামনা করে। আল্লাহর রসূল সা.-এর ইরশাদ–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের ভায়ের জন্য তাই কামনা করবে যা সে নিজের জন্য কামনা করে।

কৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে সর্বদা স্মরণ রাখে। সর্বদা তার শোকর আদায় করে এবং শোকরগুজার বান্দার মতো জীবনযাপন করে। কখনো যদি কোনো পাপ করে ফেলে, তাহলে দ্রুত ফিরে আসে এবং নিজের রবের কাছে ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বান্দা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ গুনে শেষ করতে পারবে না। সে তার একটি নেয়ামতের বরকতও গুনে শেষ

করতে পারবে না। যে বান্দা শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন।

لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হও তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবো।

আল্লাহ তাআলা অন্যের কল্যাণকামী বান্দাকে মাকবুল ও প্রিয় বানান এবং এই পরিমাণ আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করেন যা সে কোনো মূল্যের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে না।

কৃতজ্ঞতা ও কল্যাণকামীতার বরকতের পরিমাণ কল্পনা করাও মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আমলে খায়রের বন্ধন

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বেহেশত লাভ করাই মুমিন বান্দার সর্বোচ্চ আকাঙ্খা। সে চায় সে যেনো যে কোনো ভাবে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের আকাঙ্খা এটাই ছিলো। আল্লাহর রসূল সা.-এর কাছে এই আকাঙ্খাই ব্যক্ত করেছিলেন তারা।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে আল্লাহর রসূল সা. একদিন বললেন– মুআয! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সা. যাঁকে ভালোবেসে বলেন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', তার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান কে হতে পারে! এ সৌভাগ্যে কে না ঈর্ষা করবে!

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. একবার রসূল সা.-এর কাছে জানতে চান–

يَارَسُوْلَ اللهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ.

হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কোনো আমল বলেদিন যা আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে আর দোযখ থেকে দূরে রাখবে।

উত্তরে রসূল সা. বলেন–

يَامُعَاذُ! لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ

মুআয! তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চেয়েছ!

মুমিনের জন্য এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কি হতে পারে? মুমিন বান্দার সারা জীবনের আকাঙ্খা ও দিন রাতের সব কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য তো মাবুদের কাছে পুরস্কার হিসেবে বেহেশত লাভ করা এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া।

সেই আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার পথ আল্লাহর রসূল সা. ছাড়া আর কে দেখাতে পারে? যাকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন মানুষকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে

বেহেশতে প্রবেশের পথ দেখাতে।

হযরত মুআয রা. এর প্রশ্নের জবাবে রসূল সা. বললেন, প্রথম আমল হলো, তুমি কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে। তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।

দ্বিতীয় আমল হলো, তুমি নামায আদায় করবে।

তৃতীয় আমল হলো, তুমি (সক্ষম হলে) যাকাত আদায় করবে।

চতুর্থ আমল হলো, তুমি রমযানের রোযা রাখবে।

পঞ্চম আমল হলো, তুমি (সামর্থ্য থাকলে) বায়তুল্লাহর হজ করবে।

দান সদকা ও গভীর রাতের নামায গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। ।

এরপর রসূল সা. এ আয়াত পাঠ করেন–

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউ জানে তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃত কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।[১৩২]

রসূল সা. বললেন, আমি কি তোমাকে দীনের মৌলিক বিষয়গুলো বলবো?

মুআয রা. বলেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই, অবশ্যই বলুন!

তিনি বললেন, দীনের গোড়া হলো, ইসলাম তথা আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া। তার খুঁটি নামায আর সর্বোচ্চ চূড়া হলো জিহাদ।

তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস সম্পর্কে বলবো না?

মুআয বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন।

রসূল সা. নিজের জিভ ধরে বললেন: এটাকে সংযত করো।

মুআয জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যা বলি তারও কি হিসাব হবে?

---

[১৩২] সুরা সাজদা, আয়াত: ১৭-১৮

রসূল সা. বললেন, যবানের পাপের কারণে মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১৩৩]

এই আমলগুলোর মাধ্যমেই মানুষ দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সবশেষে রসূল সা. যে বিষয়ে সতর্ক করলেন, মানুষ সাধারণত সেটাকে একেবারে তুচ্ছ মনে করে থাকে। অথচ রসূল সা. এটাকেই সকল আমলের বন্ধন সাব্যস্ত করেছেন।

রসূল সা.-এর এই উক্তির মানুষ যদি জিহবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে তাহলে তার সকল আমল উপকারি এবং আল্লাহর কাছেও প্রিয় হয়। আর যদি জিহ্বা লাগামহীন হয়ে যায়, তাহলে এটাই সব আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এ জন্যেই রসূল সা. জিহ্বার পাপের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, জিহ্বার মন্দ ফল মানুষকে দোযখে নিয়ে যেতে পারে।

মন্দের সঙ্গে সমঝোতার ভয়ানক পরিণতি

কোনো গোত্রে বা জাতির মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা ফাসাদ প্রথমেই বড় আকারে প্রকাশ পায় না, বরং তা গোপনে একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় বড় আকার ধারণ করে। এরপর আর বেশি সময় লাগে না সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে। বিশৃঙ্খলা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা মানুষের কাছে একরকম গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এর পর ধীরে ধীরে তা সমাজের স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

মানব সমাজে মন্দে অভ্যস্ত অপরাধীরা পরাজিত থাকে। প্রথম প্রথম তাদের সংকোচবোধ হয়। স্বাভাবিক নৈতিকতা তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে নিন্দিত হওয়ার ভয় থাকে। ফলে মন্দ লোকেরাও খারাপ কাজে লিপ্ত হতে ভয় পায়। শুধু তাই নয় বরং ধনবান ও প্রভাবশালীরাও সামাজে নিন্দিত হওয়াকে ভয় পায়। এর কারণ হলো সমাজের কল্যাণকামী, সৎ ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিগুলো সমাজে কোনো ধরণের মন্দ কাজ সহ্য করতে পারে না। মন্দের বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই সোচ্চার থাকে। মন্দ কাজে অভ্যস্ত অপরাধীদের সঙ্গে কোনো মূল্যেই তারা সমঝোতা করতে রাজি হয় না। কিন্তু এই প্রাচীর তখনই ভেঙে পড়ে যখন সেই কল্যাণকামী ও বিবেকবানদের মাঝে শিথিলতা চলে আসে। তাদের মাঝে সাহস, হিম্মত এবং মন্দ কাজের প্রতি যে ঘৃণা ছিলো হ্রাস পেতে থাকে। তখন তাদের দুর্বলতা আঁচ করতে পেরে ধনবান ও ক্ষমতাবান অপরাধীরা অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার দু:সাহস দেখায়। ভালো লোকগুলো নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা করতে

---

[১৩৩] তিরমিযি, হাদীস: ২৬১৬

থাকে। তাদের মাঝে অপরাধ মেনে নেয়ার এবং অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রবনতা দেখা দেয়। অসৎ কর্মে বাধাপ্রদানের সৎসাহস ও চারিত্রিক শক্তি লোপ পায়। নিজের সেই দুর্বলতাকে নীতি ও আদর্শের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। এরপর আর কাউকে ভালো কাজের আদেশ করার সাহস তার হয় না। সমাজে ভালো কাজের গুরুত্ব বয়ান করার জন্যে সে আর মুখ খুলতে পারে না। তখন সমাজে অপরাধ ব্যাপকতা লাভ করে। সমাজের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে মন্দ লোকেরা সমাজে প্রবল হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে তাদেরই জয় জয়কার দেখা যায়।

সঠিক ভিত্তির ওপর নির্মিত সমাজের সূচনাকাল সুন্দর হয়। সমাজে সৎ লোকদের প্রভাব থাকে। তাদের চারিত্রিক বিশ্বস্ততায় পুরো সমাজ প্রভাবিত হয়। কেবল জনসাধারণই নয়, বরং প্রভাবশালীরাও প্রকাশ্যে কোনো অপরাধ করার সাহস পায় না। সমাজে সবাই সৎ লোকদের গুরুত্ব দেয়। তাদের সততা খোদাভিরুতা নৈতিকতার কারণে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করে। কিছু অপরাধ তো সমাজে থাকে, কিন্তু এমনভাবে পরাজিত হয়ে থাকে যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। যদি কখনো মাথাচাড়া দিতে চায়, তাহলে পুরো সমাজের ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও বল প্রয়োগের মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু যখন মন্দে অভ্যস্তদের এই অনুভূতি হয়– কল্যানকামীদের মাঝে অপরাধ মেনে নেয়ার দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তাদের দুঃসাহস বেড়ে যেতে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের কল্যাণকামী বিবেকবান ও সৎ ব্যক্তিরা নিজেদের কর্তব্যের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকে, নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সজাগ থাকে, সাহসিকতার সঙ্গে অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, ততো দিন সমাজে তাদের প্রভাব থাকে। কোথাও অপরাধ বিদ্যমান থাকলেও মাথাচাড়া দিতে পারে না। তখন সমাজে কোনো অপরাধ নেই বলেই মনে হয়। কারণ, সমাজে অপরাধের কোনো সুযোগই থাকে না। সমাজের সাধারণ লোকদের মাঝে তখন ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়।

এই সময়ে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। চারিদিকে সুখ ও নিরাপত্তার আমেজ তৈরি হয়। সমাজ বেহেশতের বাস্তব নমুনা হয়ে ওঠে।

এই বরকতপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ পরিবেশ শয়তান কি মেনে নিতে পারে! সে নানা চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কল্যাণকামীদের ওপর আক্রমণ করতে থাকে। এরপরই সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আস্তে আস্তে ভালো মানুষদের মধ্যে দায়িত্বে অবহেলা ও অলসতা দানা বাঁধতে থাকে। তাদের মধ্যে অপরাধকে মেনে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপরাধীদের শাসানো এবং অপরাধে বাধা দেয়ার সাহস ও হিম্মত তারা হারাতে থাকে। তখন অপরাধীদের সঙ্গে সন্ধি ও

সমঝোতাকেই নিরাপদ মনে করে। অপরাধীরা এ সময়টার অপেক্ষায়ই থাকে। তারা ভালো মানুষদের দুর্বলতা আঁচ করতে পারে। তাদের মন্দ ইচ্ছাগুলোতে প্রাণ সঞ্চার হয়। এরপর আর বেশি সময় লাগে না চারদিকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে। কল্যাণকামী ও সৎ ব্যক্তিদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। অপরাধের অংকুরগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়। মানুষ মনে যা চায় তাই করে। মনের যে কোনো ইচ্ছা যে কোনো ভাবে পূরণ করাকে নিজের অধিকার মনে করতে থাকে। সমাজের বড় একটি অংশ যারা ভালো মানুষদের প্রভাবে অপরাধ থেকে দূরে ছিলো, তারাও তখন অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সকল বাঁধ ভেঙে পড়ে। পুরো সমাজ অপরাধে জড়িয়ে যায়। কল্যানকামীরা সমাজের সমস্যাগুলো শোধরানোর পরিবর্তে নিজেদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবে। সমাজে সততা আর ভালো কাজের কোনো মূল্যই থাকে না।

পুরো সমাজে দুর্ভোগ নেমে আসে। সমাজে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অবিচারে ছেয়ে যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে থাকে। বংশীয় ও পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের সম্মান, জান মালের নিরাপত্তা, বড় ছোটর ভেদাভেদ, লাজ লজ্জা সব হারিয়ে যেতে থাকে। সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেয়। পুরো সমাজ দোযখের মতো হয়ে যায়।

বনী ইসরাইলের শিক্ষনীয় ইতিহাস উল্লেখ করে কুরআনে কারীমও বারবার মুসলমানদের সতর্ক করেছে। রসূলুল্লাহ সা.ও তাদের লজ্জাজনক ইতিহাসের নানা দিক উল্লেখ করে বারবার সতর্ক করেছেন। যাতে মুসলমানরা সচেতন হয় এবং সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে যে দিক দিয়ে অপরাধ নীরবে প্রবেশ করে পুরো সমাজকে ওলট-পালট করে দেয়।

বনী ইসরাঈল একদিনে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়নি। ইজ্জত সম্মানের সুউচ্চ চূড়া থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার তলদেশে তারা এক দিনেই নেমে আসেনি, বরং তাদের অবস্থাও এমনই হয়েছিলো। শুরুতে তাদের মাঝে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের প্রচলন ছিলো। তারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতো। তাদের ভালো ব্যক্তিরা অপরাধের প্রতিবাদ করতো, জীবন বাজি রেখে রুখে দাঁড়াতো। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের সৎ ও ভালো লোকদের মধ্যে ঢিলেমি সৃষ্টি হয়। অপরাধ সহ্য করার, অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতার রোগ তাদেরকে পেয়ে বসে। লড়াই করার শক্তি ও সাহস কমে যেতে থাকে। আপোষ মিমাংসাকেই নিরাপদ সমাধান মনে হতে থাকে। অপরাধ দেখে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তারা তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে চায়। ফলে অপরাধীদের দু:সাহস বাড়তে থাকে আর কল্যাণকামীরা দুর্বল হতে থাকে।

আস্তে আস্তে এই কল্যানকামীরাও অপরাধীদের সঙ্গী হয়ে যায়। এই অবস্থা যখন হয় তখন তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করেন। তাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন বলতে কিছু থাকে না। তাদের অন্তরগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এক দল অপর দলের গলা কাটতে থাকে। অপমান, লাঞ্ছনা এবং দুরাবস্থায় তারা নাজেহাল হয়ে যায়। তারা মানব সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাদের লজ্জাজনক পতনের এই উপাখ্যান অনাগত কালের মানুষের জন্য শিক্ষা হিসেবে রয়ে যায়।

সুনানে আবু দাউদে রসূল সা.-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যা বনী ইসরাইলের সেই বিভৎস ইতিহাসের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। সেই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়– তাদের সমাজ মানবতার সুউচ্চ চূড়া থেকে কীভাবে লজ্জাস্কর দুরাবস্থার পাতালে চলে গিয়েছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রসূল সা. একবার বনী ইসরাইলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রলেন, সর্বপ্রথম বনী ইসরাইলের মাঝে যে অপরাধের জন্ম হয় তা হলো, তাদের মাঝে একজন ভালো মানুষ যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধ করতে দেখতো তখন বলতো, হে আল্লাহর বান্দা! এই কাজ থেকে বিরত হও। এটা কী করছো তুমি! এটা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কিন্তু দ্বিতীয়দিন যখন সেই ব্যক্তিকে সেই অপরাধে লিপ্ত দেখতো তখন আর নিষেধ করতো না। যাতে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ না হয়। তার সঙ্গে চলাফেরা মেলামেশা করতে কোনো সমস্যা না হয়। যখন তাদের মাঝে এই অবস্থা তৈরি হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

এরপর আল্লাহর রসূল সা. কুরআনে কারীমের সূরা মায়েদার এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ تَرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ

مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলো– এটা এই কারণে যে তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট। তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কাজ যে কারণে আল্লাহ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ, নবী ও তার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না; কিন্তু তাদের অনেকে ফাসিক।[১৩৪]

হাদীসটি একটি আয়না; যার মাঝে মুসলমান জাতি নিজের চেহারা পরিস্কার দেখতে পাবে নিজেদের পতনের মূল কারণ জানতে পারবে। বুঝতে পারবে যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়ার গুরুদায়িত্বে অবহেলা কোনো জাতিকে অধঃপতনের কোন সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে!

এ জাতির মাঝে আরেকটি বদঅভ্যাস দেখা দিয়েছে। তারা নিজেদের দুরাবস্থার কাহিনী মুখ ও কলমের ভাষায় পৃথিবীবাসীর কাছে বলে বেড়াচ্ছে।

আল্লাহর দোহাই! শোক পালন না করে জেগে উঠুন, জাতির উন্নতির চিন্তায় সদাজাগ্রত হোন। অসৎ কাজে বাধা প্রদানের সৎসাহস সৃষ্টি করুন এবং আল্লাহ এই শ্রেষ্ঠ উম্মতকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন –অর্থাৎ আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার– তার হক আদায় করতে সচেষ্ট হোন।

---

[১৩৪] সুরা মায়িদা, আয়াত: ৭৮-৮১

পরকালের ভাবনা

যে আজ জীবিত যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে আগামীদিন তার জীবনে আসবেই। এই জীবন "আজ ও কাল" এর আসা যাওয়ারই নাম। যতো দিন এই পৃথিবী থাকবে, প্রতিটি "আজ" এর জন্য "কাল" আবশ্যক। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এই বাস্তবতা জানে। তাই সে আগামী দিনের চিন্তা করে থাকে। এই ভবিষ্যতের চিন্তা দুনিয়াদারদের কাছেও খুবই পছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন সুন্নাহ আজ ও কাল এই দুটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'আজ' মানে হলো বর্তমান জীবন আর 'কাল' মানে পরকাল। যে বর্তমান পেলো সে অবশ্যই পরকালও পাবে। এই জীবনের সময় যতো দিন বা বছর হোক তা 'আজ'-ই। এই অবকাশ শেষ হতেই যে সময় শুরু হবে তা 'কাল'। কিন্তু সেই কাল আসার সাথে সূর্যের উদয় বা অস্তের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা যে কোনো সময়ই শুরু হতে পারে। সূর্য উদয়ের মাধ্যমে যে কাল শুরু হবে তার দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট, কিন্তু এই জীবন শেষে যে 'কাল' শুরু হবে তার সূচনা-সময় কারো জানা নেই। দুনিয়ার জীবন কার জন্য কতো দিন তা আলেমুল গায়ব আল্লাহই জানেন। এই জীবন কয়েকটা দিনের হতে পারে, কয়েক মাসেরও হতে পারে, হতে পারে শত বছরেরও। আবার কয়েকটা মুহূর্তেরও হতে পারে। আপনি কি দেখেননি কতো মানুষ ঘুম থেকে আর জেগে ওঠেনি। কথা বলতে বলতে কতো মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা সেই কালের সূচনা গোপন রেখে মানুষকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন।

এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মূর্খ, সবচেয়ে বড় অজ্ঞ, সবচেয়ে বড় বঞ্চিত সে যে সেই 'কাল' এর চিন্তা না করে উদাসীন রয়েছে। পরকালের ব্যাপারে উদাসীনতার অর্থ হলো তার ঈমান মরে গেছে অথবা তার ঈমানের মৃত্যুযন্ত্রনা শুরু হয়েছে। যে ব্যক্তির কাছে তার ঈমান প্রিয়, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে পরকালের চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকবে। এই পৃথিবীর মায়ার জালে যে ফেঁসে আছে, যার জন্যে দিনরাত সে ব্যস্ত তা ধ্বংসশীল ও নশ্বর। আর সেই আখেরাত থেকে সে উদাসীন তা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। এরচেয়ে বোকামি ও মূর্খতা আর কী হতে পারে যে, বান্দা ধ্বংসশীল ও নশ্বর পৃথিবীর জন্য নিজের পুরোটা জীবন ব্যয় করে আর আখেরাত থেকে উদাসীন থাকে যা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। সেই কালের পর আর কোনো কাল নেই। এই কাল একবার যখন আজ হবে, এর পর থেকে সদা সর্বদা আজ-ই থাকবে। সেই আজ-এর কোনো কাল কখনো আসবে না। সেই আজ কখনো ধ্বংস হবে না। তা চিরস্থায়ী হবে।

সেই ব্যক্তির ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের একটু পরিমাপ করুন! যে সেই পরকালের জন্য ভাবে না। এই জীবন শেষ হতেই যখন সেই কাল শুরু হবে তখন বুঝতে

পারবে, সে একেবারে রিক্তহস্ত। সেখানে তার জন্য কোনো ছায়া থাকবে না, মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই থাকবে না, জীবন ধারণের কোনো উপকরণও থাকবে না। সে আক্ষেপে দুই হাত কচলাতে থাকবে আর ফরিয়াদ জানাবে, হায়! এই জীবনের জন্য যদি কিছু পাঠাতাম! আমি তো আমার শ্রম ও সাধনা সব দুনিয়ার জীবন গড়ার জন্যই ব্যয় করেছি, চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিনি! এটা কতো ভয়ানক মূর্খতা যে মানুষ তুচ্ছ এই জীবনের জন্য নিজের সব শ্রম ব্যায় করে আর পরকালের চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দেয়!

বুদ্ধিমান হলো সেই, যে জীবনের প্রতিটি কাজ হিসেব করে করবে এবং পরকালের জন্য সে কী পাঠাতে পারছে সেই চিন্তা করবে। কারণ বুদ্ধিমান তো সে-ই যে সেই ক্ষণস্থায়ী আরাম আয়েশের কথা না ভেবে চিরস্থায়ী শান্তির কথা ভাবে। একজন প্রকৃত মুমিন প্রতি মুহূর্তে ভাবে– সে পরকালের জন্য কী করতে পারছে! সকাল সন্ধ্যা যে দৌড়ঝাঁপ করছে তাতে পরকালের জীবনের কতোটুকু উপকার হচ্ছে আর কতোটুকু ক্ষতি হচ্ছে? কী বললে কী করলে পরকালের জীবন সুন্দর হবে। কোন কাজ পরকালের জন্য ক্ষতিকর? এসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সেই বিবরণ জানার আগ্রহ তাদেরই থাকে যারা পরকাল নিয়ে ভাবে, যে রাতদিন এই চিন্তাই করে যে, সে পরকালের জন্য কী অর্জন করছে। পরকালের ভাবনা থেকে উদাসীন ব্যক্তি পরকাল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় না।

এই জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে। একদিন এই খোলা চোখ অবশ্যই বন্ধ হবে। চোখ বন্ধ হতেই পরকালের জীবন শুরু হয়ে যাবে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সবাই নিজের ব্যাপারে ভালোভাবেই জানে– সে কী করছে, কী ভাবছে, তার সব পরিশ্রম ও দৌড়ঝাঁপের লক্ষ্য কী আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে জীবন কাটাচ্ছে? গভীরভাবে চিন্তা করে যদি তার মনে হয় তার জীবন পরকালের ভাবনা থেকে উদাসীন, তাহলে তার উচিত নিজের ঈমান যাচাই করে দেখা। কারণ ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ।

যদি সত্যি সত্যিই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উভয় জাহানের সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জন করা হয়, তাহলে মনে রাখবেন, উভয় জাহানের সফলতা ও সৌভাগ্যের মৌলিক সূত্র হলো, পরকালের জন্য কী অর্জন করছেন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে সেই ভাবনাতেই ডুবে থাকতে হবে।

এই ভাবনা আপনার মনে ছেয়ে থাকলে আপনি অস্থির হয়ে এটা জানার চেষ্টা করবেন যে, কোন কাজটা আপনার পরকালীন জীবনে উপকারি আর কোনটা ক্ষতিকর। কোন কাজটা করতে হবে আর কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন কাজে সময় ব্যয় করবেন আর কোন কাজ থেকে দূরে

থাকবেন। কোন কাজ করলে আপনার পরকাল সুন্দর হবে আর কোন কাজ করলে আপনার পরকাল ধ্বংস হবে। দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে; এক. তাকওয়া অবলম্বন করা; সব কাজ আল্লাহর প্রতি প্রবল ভালোবাসা ও তার ভয়ে করবেন। দুই. এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আপনার প্রতিটি কথা, কাজ, মনের পরিবর্তন এবং কল্পনার ব্যাপারেও আল্লাহ পরিপূর্ণভাবেই অবগত আছেন। আপনার কোনো বিষয় তার কাছে গোপন নয়। সব কিছু তার দৃষ্টিতে রয়েছে। এমন প্রজ্ঞাবান সর্বজ্ঞ এক সত্তার সামনে কাল আপনাকে দাঁড়াতে হবে জীবনের হিসেব দিতে। আপনার সব কৃতকর্ম তার সামনে থাকবে। কোনো অপরাধ আকাশের মহাশূন্যে করুন আর সমুদ্রের তলদেশে করুন, সবকিছু সেখানে পুরো চিত্রসহ বিদ্যমান থাকবে।

হযরত লোকমান আপন ছেলেকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেছেন–

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

হে প্রিয় বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে কোনো শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নিচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১৩৫]

পরজীবনের ওপর ঈমান দৃঢ় করুন। পরকালের চিন্তা ভাবনাকে কখনো মন থেকে দূরে থাকতে দেবেন না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই ভাবনায় কাটান যে, সেই পরকালের জন্য আপনি কী করছেন এবং কী পাঠাচ্ছেন। মহান প্রতিপালকের এই নির্দেশনা স্মরণ করুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।[১৩৬]

---

[১৩৫] সূরা লোকমান, আয়াত: ১৬

[১৩৬] সূরা হাশর, আয়াত: ১৮

ঝুঁকির মুখে ঈমান

একজন প্রকৃত মুমিন যে কোনো ঝুঁকি মেনে নিতে পারে, কিন্তু ঈমান হারানোর ঝুঁকি মেনে নিতে পারে না। কারণ ঈমানই তো মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তার কাছে আর কিছুই থাকে না।

আপনি বুঝে শুনে এমন কোনো কাজ করবেন না, যার কারণে আপনার ঈমান ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। অনেক সময় নিজের অজান্তে মানুষ এমন অনেক কাজ করে ফেলে, যার ফলে তার এই প্রিয় মূল্যবান সম্পদ ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়, সে বুঝতেও পারে না।

একটা মাত্র ভুল এমন মারাত্মক হতে পারে যার ফলে মানুষের ঈমান ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এই সতর্কবাণী কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে নয়, স্বয়ং দীনের বার্তাবাহক ও পথনির্দেশক রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে এসেছে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে সতর্ক হোন এবং চিন্তা করুন! আপনি এমন কোনো ভুল ও অপরাধে জড়িয়ে যাননি তো? আল্লাহ না করুন যদি জড়িয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে কোনো প্রকার কৌশল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে তৎক্ষনাত সেই ভুল থেকে সরে আসুন এবং তার ক্ষতিপূরণের উপায় ভাবুন। কারণ ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের কোনো বিশ্বাস নেই। মৃত্যুর পর ঈমানের এই বিপদ সত্যিকারের বিপদ হয়ে দেখা দেবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

সকলেই তো জানেন, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর মৌলিক চারটি ইবাদত ফরয করেছেন– নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ। এটাও জানেন যে, সেগুলোর দুটি বা তিনটি ইবাদত গ্রহণ করে বাকিগুলো ছেড়ে দেবে এই অধিকারও কারো নেই। যদি কোনো মূর্খ কেবল একটি ইবাদত ছেড়ে তিনটি ইবাদত পালন করে, তাহলে আল্লাহর রসূল সা.-এর স্পষ্ট সতর্কবাণী হলো, এই তিনটি ইবাদত তার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহর কাছে কেবল সেই বান্দার ইবাদত গৃহিত হবে যে আল্লাহর নির্ধারিত চারটি ইবাদতই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পালন করবে।

রসূল সা. বলেছেন–

أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِنَّ جَمِيْعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ.

আল্লাহ কর্তৃক ইসলামে চারটি ইবাদত ফরয করা হয়েছে। কেউ তার তিনটি পালন করলে এ তিনটি তার কোনো কাজে আসবে

না। যতক্ষণ না সবগুলো পালন করে। সে চারটি হলো– নামায, যাকাত, রমযানের রোযা এবং বায়তুল্লাহর হজ।[১৩৭]

বর্তমানে মুসলমান নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা করছে ঠিক, কিন্তু তারপরও নামায রোয এবং যাকাত আদায় করার বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কেবল হজ পালনে তারা উদাসীন। অনেক উদাসীন মুসলমানের হজে যাওয়ার সামর্থ্য আছে– স্বচ্ছল, শারীরিকভাবেও সুস্থ, কোনো অপারগতাও নেই, তারপরও হজে যায় না। তাদের এই অনুভূতিটুকুও নেই– তারা কতো মারাত্মক ও ভয়াবহ অপরাধ করছে। তারা এমন এক ভয়ানক অপরাধ করছে যার কারণে তাদের ঈমান হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের থেকে নিজেকে সম্পর্কহীন ঘোষণা করেছেন। আর আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক নেই, ইহকালে ও পরকালে কোথাও তার কোনো আশ্রয় নেই। তবে সে যদি নিজের অপরাধের ক্ষতিপূরণ করে নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টির অধিকারী বানাতে পারে তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহর সতর্কবাণী এই –

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহর বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[১৩৮]

অর্থাৎ যে সেই ফরযকে অস্বীকার করে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বায়তুল্লাহর হজ করে না, সে যেনো ভালো করে শুনে রাখে– আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। বান্দাই তার মুখাপেক্ষী। যদি এই মুখাপেক্ষী বান্দা তার নির্ধারিত ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা দেখায়, তাহলে আল্লাহর তাকে প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কাছে সে বিতাড়িত। আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। সে তার অনুগ্রহের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে।

আল্লাহর রসূল সা. আরো স্পষ্ট শব্দে এ ধরণের উদাস মূর্খদের ধমক দিয়েছেন। সুস্পষ্ট করে সতর্ক করেছেন, যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করতে যায় না, তার ঈমান ঝুঁকির মুখে পড়ে।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ

---

[১৩৭] মুসনাদে আহমদ

[১৩৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭

حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

হযরত আবু উমামা নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যার অভাব নেই, হজে যেতে সমস্যা হয় এমন কোনো রোগও নেই, কোনো অত্যাচারী বাদশার বাধার মুখেও সে পড়েনি, তারপরও সে হজ করলো না, সে ইহুদি হয়ে মরতে পারে বা খ্রিস্টান হয়েও মরতে পারে।

অন্তর কাঁপানো এই সতর্কবানীতেও যার চোখ খোলে না, যে মুসলমান হয়ে মারা যাওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তার ঈমান তো বাস্তবেই ঝুঁকিতে আছে। যার হজে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই, তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর ফরয এই ইবাদত পালনে অবহেলা করে, তার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সা. স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– সে খৃষ্টান হয়ে মারা যাক বা ইহুদী হয়ে মারা যাক। যদি সে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু চায়, তাহলে সে এখনই এই ফরয পালন করুক। ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটা মুহূর্তও আর নষ্ট না করুক। কারো তো জানা নেই তার পরবর্তী মুহূর্ত এই জীবনের নাকি মৃত্যুপরবর্তী জীবনের। বিষয়টা যখন এতোটা কঠিন, তাহলে মুমিন ব্যক্তি কীভাবে এই ফরজ বিধান পালন না করেও নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে!

হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার উপায়

হিংসা নিকৃষ্ট এক স্বভাব। সব যুগে সব সমাজে কিছু মানুষের মধ্যে এই স্বভাব ছিলো। হিংসা মানে হলো অপরের ভালো দেখে মনে মনে পুড়তে থাকা। মনে মনে ওই ব্যক্তির সব কিছুর ধ্বংস কামনা করা এবং তা নিজে পেতে চাওয়া। নিজে না পেলেও তার যেনো না থাকে সেই কামনা করা। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ একটি স্বভাব। এ স্বভাবের মানুষ সব সময় মানসিক অশান্তিতে থাকে। হিংসার আগুনে পুড়ে সে শুধু নিজের আখেরাতই ধ্বংস করে। হিংসার রোগী যখন নিজের হিংসা ও জ্বলনে অস্থির হয়ে অনেক অনৈতিক কাজ করতে থাকে। নানা চক্রান্ত করতে থাকে। মানুষকে কষ্ট দেয়, ক্ষতি করে। অপবাদের মতো ঘৃণ্য উপায়ও অবলম্বন করে। এর ফলে সমাজ ও হিংসার শিকার ব্যক্তি বিপদে পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শিখিয়েছেন, হিংসুক যখন হিংসা করবে তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। যেমন কোরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

এবং আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।[১৩৯]

কুরআনে কারীমের এই বাকভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর। হিংসুকের অনিষ্ট ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো– এটা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে– যখন সে হিংসা করবে তখন তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। অর্থাৎ হিংসুক যখন নিজের আগুন নেভাতে তোমার ক্ষতি করতে উদ্যত হবে তখন আশ্রয় প্রার্থনা করো।

হিংসুক যদি হিংসায় জ্বলতে থাকে এটা হিংসুকের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু যাকে হিংসা করা হয় তার জন্য এটা ক্ষতিকর নয়। তাই তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। যখন হিংসুক নিজের জ্বলনে অস্থির হয়ে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে, তার ক্ষতি করা বা তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে নানা চক্রান্ত করতে থাকে, এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর শিক্ষা হলো– এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো॥ আল্লাহর আশ্রয়েই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। একজন হিংসুক যতো খুশি নিচে নামতে পারে। ভদ্রতা, মনুষ্যত্ব, দীন ও ঈমান রক্ষা করার চিন্তা হিংসুকের মনে থাকে না।

হিংসুক অন্যকে হেয় করা এবং কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তবে সে নিজেরই ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। সে হিংসার আগুনে পুড়তে থাকে। তার রাতদিন খুব কষ্টে কাটে। তার মন মস্তিষ্ক সারাক্ষণ আতঙ্ক ও অস্থিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তার ব্যক্তিত্ব হালকা ও প্রভাবহীন হয়ে যায়।

হিংসার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, হিংসুক আল্লাহর ব্যাপারে অনৈতিক চিন্তা করে। তার চিন্তাধারা ভুল পথে চলতে থাকে। তার কথাবার্তা ও দিনরাতের কাজ কর্মে আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে। তার কাজে মনে হয়, আল্লাহ অমুককে নেয়ামত দিয়ে অনৈতিক কাজ করেছেন। নিজের নেয়ামতের জন্য ভুল ব্যক্তি নির্বাচন করেছেন!! এসব সুখ সমৃদ্ধির হকদার ছিলাম আমি, অথচ আল্লাহ অমুককে দিয়েছেন। সে তো এই নেয়ামত পাওয়ার কোনো যোগ্যতাই রাখে না। আমাকে যদি না-ই দেয়া হয় তাহলে অন্তত তার কাছ থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হোক। আল্লাহ তাকে আমার ওপর অন্যায়ভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

আল্লাহর ব্যাপারে হিংসুকের এমন চিন্তা তার ঈমানের ক্ষতি করে। আল্লাহর গুণাবলির ব্যাপারে তার ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ন্যায়পরায়ণ সত্তার ব্যাপারে এ ধরণের কথা চিন্তা করতে পারে যা একজন মানুষ কোনো ভদ্র সভ্য মানুষের ব্যাপারেও চিন্তা করতে পারে না, ওই ব্যক্তির ঈমান কীভাবে নিরাপদ থাকবে? হিংসুক মূলত নিজেকে আল্লাহর বিপক্ষে দাঁড় করায়।

---

[১৩৯] সুরা ফালাক, আয়াত: ৫

আল্লাহর ফয়সালা উল্টে দেওয়ার জন্য নিকৃষ্ট পথ অবলম্বন করে। যেমন দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিংসুক আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলো। ফলে আল্লাহ তাকে নিজের দরবার থেকে বিতাড়িত করেছেন। হিংসুকদের সেই পূর্বসূরী আল্লাহর আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলো– তুমি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো আর আদমকে মাটি দিয়ে, তারপরও আমাকে আদেশ করছো আদমকে সেজদা করতে? মর্যাদার হকদার তো আমিই, (নাউযুবিল্লাহ) আদমকে মর্যাদার অধিকারী করে তুমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছো। এই অনৈতিক সিদ্ধান্ত আমি কীভাবে মেনে নিতে পারি?'

হুবহু এরকমই হয় সব হিংসুকের মনের কথা। তারাও আল্লাহর কাছে এই অভিযোগই করে যে, সুখ ও সম্মান পাওয়ার হকদার তো আমি ছিলাম, অথচ তুমি অন্যকে সম্মান দিয়েছো, তাকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছো।

আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে মাথানত না করা, তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা ইবলিসী কাজ। প্রত্যেক হিংসুক জেনে হোক বা না জেনে হোক ইবলিসী কাজই করে। বিতাড়িত ইবলিসের অনুসরণের পরিণতিতে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যায়। তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়।

হিংসার বড় আরেকটি ক্ষতি হলো, হিংসুক তার মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা অন্যের ক্ষতির চেষ্টায় ব্যায় করে। এই মেধা নিজের জীবন গড়া, ভবিষ্যতকে সাজানো এবং সংশোধনমূলক কাজে ব্যায় করে না। আল্লাহ সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে যাকে সম্মানিত করেছেন, তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করা, তার ক্ষতি করা, তাকে হেয় করার চেষ্টায়ই সে থাকে। হিংসার আগুন তাকে শান্তিতে বসতে দেয় না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে সে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। তার মেধা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকেরাও তার খারাপ প্রভাবে ভুল পথে পরিচালিত হয়। তার জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখ বলতে কিছু থাকে না। তার ইহকাল ও পরকাল শেষ হয়ে যায়।

হিংসুক হিংসার অনলে জ্বলে অস্থির হয়ে অন্যকে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে এমন ঘৃণ্য কাজ করে ফেলে, যে কাজ সাধারণ অবস্থায় করার কল্পনাও কেউ করতে পারে না। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সে যেনো হিংসুকের ক্ষতি থেকে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনা করবে এই দৃঢ় ঈমানের সঙ্গে যে, আমি যাঁর আশ্রয় চাচ্ছি তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। এই অনিষ্টের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। কোনো বিষয় তার ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়।

হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু উপায়ও আছে। যেমন:-

এক. যাকে হিংসা করা হয় সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখবে। কখনো অস্থিরতা প্রকাশ করবে না। বিশ্বাস রাখবে, যতক্ষণ আল্লাহ না চাইবেন কেউ কিছু করতে পারবে না। লাভ ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহই। যদি আল্লাহ না চান, তাহলে যে যতো চেষ্টাই করুক, কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তার পক্ষ থেকে কল্যাণের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে কোনো শক্তি সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে না। যদি তার পক্ষ থেকেই কোনো ক্ষতির সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কেবল তার শক্তিই মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তার ইচ্ছা ছাড়া এই জগতের কোনো কিছু নড়তেও পারবে না।

দুই. হিংসার শিকার ব্যক্তি কল্যাণ ছাড়া কিছু চিন্তা করবে না। সর্বদা কল্যাণের পথেই থাকবে। এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে যে– উত্তম প্রতিশোধগ্রহণকারী আল্লাহ তাআলাই। তার জ্ঞান থেকে কোনো কিছু গোপন নেই। তার ক্ষমতার পরিধির বাইরেও কোনো কিছু নেই। তার শাস্তি অনেক কঠিন। তিনি যখন প্রতিশোধ নিতে চান কেউ তার শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।

أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।[১৪০]

তিন. হিংসার শিকার ব্যক্তি হিংসুকের ঘৃণ্য আচরণে এবং তার অযথা কথাবার্তায় উত্তেজিত হবে না। প্রতিশোধস্পৃহার কাছে পরাজিত হয়ে সে নিজেও হিংসুকের পর্যায়ে নেমে আসার মতো বোকামি করবে না। সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখবে। ধৈর্যকে নিজের ঢাল বানাবে। এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখবে যে, ধৈর্যের প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহ দেবেন। তিনি কখনো প্রতিশ্রুতির ব্যাতিক্রম করেন না।

চার. যখন হিংসুক আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় করে না, মানুষের অসন্তুষ্টিরও পরোয়া করে না, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে অনর্থক ও ঘৃণ্য আচরণ করতে থাকে, তখন হিংসার শিকার ব্যক্তি তাকওয়া ও খোদাভীতির পথে অবিচল থাকবে। তাকওয়ার বিপরিত কখনো কিছু করবে না। কোনো মূর্খের অসংযমী ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাকওয়া ও খোদাভীতির পথ ছেড়ে দেয়া সবচেয়ে বড় ক্ষতি এবং সবচেয়ে বড় পরাজয়।

পাঁচ. সে হিংসুকের ঘৃণ্য চক্রান্ত ও অনর্থক কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না।

---

[১৪০] সূরা তালাক, আয়াত: ১২

মনে করবে, কিছুই হয়নি। হিংসুকের কথায় মনোযোগ দেবে না। হিংসুক তার দৃষ্টি আকর্ষণের হাজারো চেষ্টা করবে, তারপরও সে তার দিকে একেবারেই মনোযোগ দেবে না। মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখবে। হিংসুকের কাছে তার এই পাত্তা না দেওয়াটাই শাস্তির মতো মনে হবে। তবে যদি হিংসুক তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করার চেষ্টায় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তাহলে তাকে সতর্ক করে দেবে। বলে দেবে, আমি আল্লাহর নির্দেশ ও ভদ্রতার খাতিরে চুপ আছি। মনে রেখো, ভদ্র ব্যক্তির রাগ মারাত্মক ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। এই সতর্কবাণীর ফলে আল্লাহ চাহে তো সে প্রকাশ্যে কুৎসা রটাবে না। অবশ্যই তার মুখ চুপসে যাবে। কারণ হিংসুক সাধারণত কাপুরুষ হয়। তার মনে যে আগুন লেগে আছে, এই পানি সেই আগুন নিভাতে ভালোই কাজ করবে।

ছয়. হিংসুক যতোই কষ্ট দিক বা যতোই খারাপ ব্যবহার করুক, হিংসার শিকার ব্যক্তি তার সাথে সামান্য খারাপ আচরণও করবে না। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে যদি হিংসুকের সঙ্গে ভালো আচরণের কোনো সুযোগ আসে তবে অবশ্যই তা করবে। ভালো ব্যবহার করে এই আশা করবে না যে, এই ভালো ব্যবহার ও সুন্দর আচরণে হিংসুকের মনের আগুন নিভে যাবে তার আচরণে কোনো পরিবর্তন আসবে। সে হয়তো তার মতোই থাকবে। তবুও সে ভালো আচরণ করে যাবে।

সাত. হিংসার শিকার ব্যক্তি হিংসুকের ভয় থেকে নিজের মনকে পুরোপুরি মুক্ত রাখবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে, হিংসুক তার কিছুই করতে পারবে না। হিংসুকের ভয় থেকে মনকে পরিস্কার রাখার জন্য একত্ববাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা করবে। আল্লাহর গুণাবলির কথা স্মরণ করবে। সর্বাবস্থায় একত্ববাদের বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকবে। যার হৃদয়ে আল্লাহর একত্ববাদ দৃঢ় থাকে, তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি ছাড়া অন্য কিছুর ভয় কখনো আসতে পারে না।

শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি সবসময় মানুষের পেছনে লেগে আছে। এগুলোর অনিষ্ট থেকে বাঁচতে যদি কেউ রসূল সা.-এর উত্তম আদর্শকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয়, তাহলে সে সব ধরণের অনিষ্ট ও ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আয়শা রা. বর্ণনা করেন : নবী করীম সা. যখন ঘুমাতে আসতেন তখন দুই হাত দোয়ার জন্য ওঠাতেন আর قل هو الله احد ও قل اعوذ برب الفلق এবং قل اعوذ برب الناس এ সূরাগুলো পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে যতটুকু সম্ভব নিজের সারা শরীরে হাত বোলাতেন। মাথা, চেহারা থেকে শুরু করতেন।... এভাবে রসূল সা. তিনবার করতেন।

পাপীকে ঘৃণা নয়, সংশোধনের কথা ভাবুন

মনে করুন, আপনি শুনলেন, এক ব্যক্তি পাপ করছে কিংবা আপনি নিজ চোখেই তাকে গুনাহ করতে দেখলেন। এরপর আপনি তা এড়িয়ে এই মনে করে চলে গেলেন, সে যেমন করবে তেমন ফল পাবে। আপনার মনে ঘৃণার সামান্য রেশ সৃষ্টি হলো। কিন্তু আপনি ওই দিক থেকে মনকে সরিয়ে আপন কাজে মগ্ন হলেন। নিঃসন্দেহে সেই গুনাহগার ব্যক্তি তার কৃতকর্মের সাজা ভোগ করবে। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো– যাকে আপনি পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে যেতে দেখলেন, তার প্রতি সামান্য ঘৃণা প্রকাশ করে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? তার হেদায়াতের ব্যাপারে চিন্তা করা কি কর্তব্য নয়?

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। সেই পাপীর সঙ্গে আপনি কি কল্যাণমূলক আচরণ করেছেন? আপনি তাকে এড়িয়ে যাবেন এটাই কি যথেষ্ট? নিজেকে সেই গুনাহ থেকে নিরাপদ রেখে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে মনে করছেন যে, পরকালে আল্লাহর সামনে বলে দেবেন, পরওয়ারদেগার! আমি এই পাপীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি, নিজেকে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছি। এইটুকুই কি যথেষ্ট? নাকি সেই পাপীরও আপনার ওপর কিছু অধিকার রয়েছে? সে তো উদাসীন, আপনি তো বিবেকবান! সে পরকালকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, আপনি তো পরকাল নিয়ে ভাবেন। সে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ, আপনি তো দীনের জ্ঞান রাখেন। সে সুস্থ পরিবেশ পায়নি, আপনি সুস্থ পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন। আপনার ওপর তার কি এই অধিকার নেই যে, আপনি তাকে পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন? পাপের নিকৃষ্ট প্রভাব ও ভয়ানক পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করবেন? সে আপনার উপদেশ মেনে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরেও তো আসতে পারে।

সে যে পাপে লিপ্ত তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আপনি ভাবছেন আপনি নিরাপদ। যদি সবাই এভাবে শুধু নিজেকেই বাঁচাতে চায় তাহলে সমাজে পাপ দিন দিন বেড়ে যাবে। পুরো সমাজ পাপে ছেয়ে যাবে। আপনিও তাতে প্রভাবিত হবেন, আপনার পরবর্তী প্রজন্মও পাপী সমাজে বেড়ে উঠবে। পাপের সঙ্গে সমঝোতা ও পাপ সহ্য করে নেয়া মানে পাপে শরিক থাকা। নবী সা.-এর ভাষায়– গুনাহ না করেও আপনি গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অন্য কারো কথা হলে শুনেও না শোনার ভান করতে পারতেন। কিন্তু এই কথা তার, যার সততার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে আপনি ঈমান এনেছেন। যার ওসিলায় পরকালে নাজাতের আশা করেন। রসূল সা. বলেছেন, যে জায়গায় লোকেরা গুনাহ করে, কিছু লোক সেখানে উপস্থিত থাকে কিন্তু মনে প্রাণে সেই গুনাহকে ঘৃণা করে এবং সাধ্য অনুযায়ী বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাই ধরে নেওয়া হয়

তারা সেখানে উপস্থিত নেই। আর যারা সেই গুনাহের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে, সেই স্থানে না থাকলেও ধরা হয় তারা পাপীদের মধ্যে উপস্থিত আছে।

হাদীসের আয়নায় আপনি নিজের আমলের চেহারা দেখুন আর নিজেই সিদ্ধান্ত নিন– আপনি যে পথে চলছেন তা কতটুকু সঠিক। বাস্তবে কোন পথ আপনার জন্য সঠিক? সঠিক পথ হলো, আপনি পাপীর পাপে ব্যথিত হবেন এবং তাকে তার মন্দ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করবেন। তাকে পাপের পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে নিজের সমাজকে গুনাহ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

পাপ আপনার পরিবারে হোক বা আপনার মহল্লায় হোক, আপনার কোনো প্রতিবেশী বা আত্মীয় তাতে লিপ্ত হোক, সর্বাবস্থায় আপনার নৈতিক ও দীনি কর্তব্য হলো, তাকে বাধা দেওয়া এবং পাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। কখনো ভাববেন না যে পাপ করতে দেখেও না দেখার ভাণ করলে আপনি পরকালে আল্লাহর সামনে ধরা পড়বেন না। আপনার প্রতিবেশী হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেন, 'কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীর জামা ধরে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবে– হে রব! সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেই ব্যক্তি উত্তরে বলবে, পরওয়ারদেগার! তোমার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমি তার পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদের ব্যাপারে তার সাথে কোনো প্রতারণা করিনি। অভিযোগকারী বলবে, পরওয়ারদেগার! এই কথা তো সত্য, কিন্তু সে আমাকে পাপে লিপ্ত দেখেও আমাকে পাপ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেনি।'

আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীনের বুঝ, হালাল হারামের মাঝে প্রার্থক্য করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাই মানুষকে অপরাধ ও পাপ করতে দেখলে সাধ্য অনুযায়ী বাঁধা দেওয়া আপনার দায়িত্ব। যদি আপনি এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে আপনি প্রতারণা করেছেন। আপনার প্রতিবেশী কাল হাশরের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলবে।

যখন সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে গুনাহে জড়িয়ে পড়ে আর দীনদাররা শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের চিন্তা নিয়ে থাকে এবং এই ভেবে নিজেকে শান্ত না দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে যে, তাদের কর্মের ফল তারাই ভোগ করবে, তখন সমাজে পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা বেড়ে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে সমাজ ও পুরো পরিবেশ পাপে ছেয়ে যায়। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির সিদ্ধান্ত আসে। মৃত্যুর আগেই তারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হয়। অপরাধীদের যেমন শাস্তি দেওয়া হয়, যারা পাপ দেখেও বাঁধা দেয় নি তাদেরও

শাস্তি দেওয়া হয়। রসূল সা. বলেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহের কাজ করে এবং তারা তাকে বাধা দেয়ার শক্তি থাকার পরও বাধা না দেয়, তাহলে তারা সবাই মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হবে।[১৪১]

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি হলো, পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্যতা মেনে না নেওয়া এবং মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া। সাহাবায়ে কেরাম যাদেরকে কুরআনে কারীমে আল্লাহ 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ)-এর গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার কারণেই। সেই সঙ্গে আল্লাহর ওপর ছিলো তাদের পূর্ণ ও অটল ঈমান।

ব্যক্তিগতভাবেও সাহাবায়ে কেরাম রা. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ করতে বাঁধা দেওয়ার কর্তব্য পালনে কখনো ত্রুটি করেননি। এক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্য পালন ও অন্যের হক আদায়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন তারা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ চেষ্টা ফলদায়কও করেছেন।

হযরত ওমর রা. এর কাছে শাম দেশের এক ব্যক্তি প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো। একবার দীর্ঘ দিন ধরে সে আসছিলো না। তার কথা ওমর রা. এর মনে পড়লে তার ব্যাপারে লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সে কিছু খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। মদ পান করা ও করানো শুরু করেছে। হযরত ওমর রা. তার কাছে লিখলেন,

> ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে শামের অধিবাসী অমুকের ছেলে অমুকের ছেলে অমুকের প্রতি– সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। সকলকে তার কাছেই ফিরতে হবে।

এই চিঠি ওই শামী ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে ওমর রা. নিজের সঙ্গীদের বললেন, তোমরা সবাই তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো– আল্লাহ যেনো তার মন ঘুরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল করে নেন!

এদিকে যখন শামের ওই অধিবাসীর কাছে আমীরুল মুমিনীনের চিঠি পৌঁছলো, সে চিঠিটি পড়ে বলতে লাগলো, আমার প্রতিপালক আমাকে তার শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং অনুগ্রহের আশা দিয়ে আমার গুনাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন! চিঠিটি সে কয়েকবার পড়লো এবং কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে তওবা করলো। এমন খাঁটি তওবা করলো যে, আল্লাহ

---

[১৪১] আবু দাউদ

তার জীবন পুরোপুরি বদলে দিলেন।

হযরত ওমর রা. তার অবস্থা জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হলেন। লোকদের বললেন, তোমরা যখন তোমাদের কোনো মুসলমান ভাইকে পথভ্রষ্ট হতে দেখো, তাকে ত্যাগ করো না; বরং তাকে সংশোধনের চেষ্টা করো।

ভালো কাজগুলোর মধ্যে তওবা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার মাধ্যমে কারো যদি তওবা করার তৌফিক হয়, তাহলে এটা আপনার অনেক বড় সৌভাগ্য।

বন্ধু দিয়ে মানুষ চেনা যায়

এমনও মানুষ আছে যার কোনো বন্ধু নেই। তারা বাস্তবে বঞ্চিত। সাধারণত প্রত্যেকেরই কিছু বন্ধু থাকে। যারা তার সুখ ও দুঃখের অংশ হয়, ব্যথা ও আনন্দে সঙ্গ দেয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরম হিতাকাঙ্খী হয় এবং নানা কাজে কর্মে সহযোগী হয়।

আপনারও কিছু বন্ধু ও সঙ্গী সাথী থাকা স্বাভাবিক। মনে রাখবেন, সমাজে আপনার বন্ধুরা যে স্তরের, আপনিও সেই স্তরের। আপনার মর্যাদা তেমনই, যেমন আপনার বন্ধুদের মর্যাদা।

এখন আপনি ভেবে দেখুন, যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন, মেলামেশা করেন, দিনরাত যারা আপনার সঙ্গে থাকে, আপনার এই বন্ধুরা কোন শ্রেণির লোক? সমাজে তাদের অবস্থান কেমন? তারা কি আমানতদার ও বিশ্বস্ত? তাদের ব্যাপারে মানুষের ধারণা কী? আপনার বন্ধুরা যেমন আপনিও তেমন। এরা আপনার কাছে আসে আর আপনিও তাদের কাছে যান কারণ আপনার আর তাদের ধ্যানধারণা এক, আপনাদের চিন্তাধারা অভিন্ন, কামনা বাসনা একইরকম, আরবী সাহিত্যে পুরাতন এক প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে–

لا تسئل عن المرء بل سل عن قرينه

কারো ব্যাপারে না জিজ্ঞেস করে তার সঙ্গীর ব্যাপারে খোঁজখবর নাও।

মানুষের মূল পরিচয় মেলে তার বন্ধুদের দেখলে। আপনার ব্যাপারে আপনার সমাজ আপনার বন্ধুদের দেখেই সিদ্ধান্ত দেবে। বন্ধুদের দেখে আপনার ব্যাপারে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা প্রায় সব সময়ই সত্য হয়ে থাকে।

আপনি আপনার বন্ধুত্বের জন্য যাদের বাছাই করেন, তাদের স্বভাব আপনার সাথে মেলে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনাও আপনার মতো বলেই আপনি তাদের বাছাই করেন। অথবা আপনি খুবই চতুর, স্বার্থপর; নিজের প্রয়োজনে আপনার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের জমা করেছেন। তাদের

দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছেন। তারাও নিজেদের স্বার্থে দিনরাত এক করে জানপ্রাণ দিয়ে আপনার সঙ্গে লেগে আছে। পৃথিবীর চোখে তারা আপনার সঙ্গী। আপনিও তাদেরকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন। কিন্তু মনে রাখবেন, অচিরেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব আপনাকে তাদের কাছ থেকে কিংবা তাদেরকে আপনার কাছ থেকে আলাদা করে দেবে। আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু, আস্থাভাজন সঙ্গী সে-ই যে চিন্তায় ও মানসিকতায় আপনার মতো হবে। তাই বন্ধু নির্বাচনকে গুরুত্বের সাথে নিন।

মুহাম্মাদ সা. আবু হুরায়রা রা.-কে বলেছিলেন,

المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل

মানুষ তার বন্ধু ও সঙ্গীর ধর্ম মেনে চলে। সুতরাং তোমরা ভেবেচিন্তে বন্ধু বানাও।

এখানে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য জীবন যাপনের পথ ও পদ্ধতি। মানুষ নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনের পদ্ধতি ঠিক করে। বন্ধুদের মানসিকতা, আল্লাহ ও পরকাল বিষয়ে তাদের বিশ্বাস আপনাকে প্রভাবিত করবেই। তাই একজন ভালো বন্ধু আপনার পরকালের পাথেয় হতে পারে, আবার একজন খারাপ বন্ধু আপনার পরকালের শাস্তিরও কারণ হতে পারে। আত্মীয়তার সম্পর্ক করার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টা মনে রাখতে হবে।

সাহাবীদের নামে মসজিদের নাম রাখুন

কিছুদিন ধরে বারবার মনে আসছে যে, আমাদের দেশের মসজিদগুলোর বর্তমান নাম নিয়ে ভাবা দরকার। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছি। যে মসজিদেই যাই, সর্বপ্রথম তার নাম দেখি। কোথাও মসজিদে আবু বকর রা., কোথাও মসজিদে ওমর ফারুক রা., কোথাও মসজিদে মিকদাদ রা., কোথাও মসজিদে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. কোথাও মসজিদে দারুস সালাম, কোথাও মসজিদে আবু হুরায়রা রা. ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি; বিশেষ করে আমাদের মুম্বাই শহরের মসজিদগুলোর নামও দেখেছি। কোথাও চুনা ভাট্টি মসজিদ, কোথাও খুখা বাজার মসজিদ, কোথাও মুরগী মহল্লা মসজিদ, কোথাও লাল চিমনি মসজিদ, কোথাও ঘুঘারি মহল্লা মসজিদ, কোথাও মঙ্গলি কান্দুরি মসজিদ, কোথাও মুরগা গ্রেইন মসজিদ, কোথাও পাঠানবাড়ি মসজিদ, কোথাও মেহেদী মসজিদ। দিল্লীতে কোথাও নিলওয়ালী মসজিদ, কোথাও কোতোয়ালি মসজিদ। করাচিতেও অনেক মসজিদ আজব আজব নামে বানানো হয়েছে। একই অবস্থা লাহোরেও। হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরেও মসজিদের নামগুলো এমনই। মসজিদগুলোর বর্তমান নাম

পরিবর্তন করে সাহাবীদের নামে নামকরণ করা হলে খুবই উত্তম হবে। ভবিষ্যতেও যেসব মসজিদ বানানো হবে সেগুলোও সাহাবীদের নামে বানানোর চেষ্টা করা উচিত। সাহাবাদের মধ্যে বদরী সাহাবীদের নাম বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। তাই সেই নামগুলোর প্রতি মনোযোগ দিলে ভালো হবে। বদরী সাহাবীদের নাম এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহকাল ও পরকালে কুরআনই যথেষ্ট

হাকিম সিনা লিখেছেন, কুরআনের শুরু বিসমিল্লাহর বা' দিয়ে করা হয়েছে। আর শেষ করা হয়েছে সীন' দিয়ে। দুইটা অক্ষর একত্র করলে হয়, بس অর্থাৎ যথেষ্ট। অর্থাৎ কুরআন দুই জগতের জন্যই যথেষ্ট। তার ভাষায়,

اول و آخر قرآن زچہ با آمد و سین
یعنی اندر رہ دین رہبر تو قرآن بس
কুরআনের শুরু ও শেষ ب ও سین দিয়ে
অর্থাৎ দীনের পথে চলার পথপদর্শক হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট।[১৪২]

কুরআন শরীফের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব

নোট: এই হাদীসটি তবরানীর মু'জামে কাবীরে এভাবে এসেছে যে, একদিন হযরত জিবরাইল আ. নবী সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, يَامُحَمَّدُ أُمَّتَكَ بَعْدَكَ؟ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ সা.! আপনার পর আপনার উম্মতের কী হবে? রসূল সা. বলেন, مَا الْمَخْرَجُ يَاجِبْرَائِيْلُ؟ অর্থাৎ তাদের মুক্তির উপায় কী? এর উত্তরে জিবরাইল আ. যা বলেছেন তা নীচে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হচ্ছে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ، قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللهُ صلى اللهُ عليْه وسلم؟ قالَ كِتَابُ اللهُ فِيْهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِيْ غَيْرِهِ أَضَلّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ، وَهُوَ الذّكْرُ الْحَكِيْمُ، وَهُوَ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ، هُوَ الّذِيْ لاَ تَزِيْغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْالْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلُقُ عَلى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ

---

[১৪২] তাফসীরে আযীযী পৃ:৭০২

تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتّى قالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنّا بِهِ، مَنْ قالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সা. একদিন আমাকে বললেন, 'সাবধান হয়ে যাও! বড় এক বিপদ সমাগত।' আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এর থেকে পরিত্রানের উপায় কি? রসূল সা. বলেন, 'কিতাবুল্লাহ! এর মধ্যে তোমাদের পূর্ববর্তীতের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী রয়েছে আর পরবর্তী যাবতীয় সংবাদ রয়েছে। (অর্থাৎ আমল-আখলাকের যে ইহকালীন ও পরকালীন ফলাফল সামনে আসবে, কুরআন মাজীদে সে বিস্তারিত বলা হয়েছে।) তোমাদের মাঝে যতো সমস্যা সৃষ্টি হবে, কুরআনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফয়সালা রয়েছে। (সত্য-অসত্য এবং সঠিক ও ভুলের ব্যাপারে)। কুরআন অনর্থক কোনো কথা নয়, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। যে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কুরআন ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।) আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কোথাও হেদায়াতের অনুসন্ধ্যান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। (অর্থাৎ সে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে।) কুরআনই আল্লাহর শক্তিশালী রজ্জু (অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের মজবুত মাধ্যম) এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ বাণী। আর এটাই সরল সঠিক পথ। এই কুরআন এমন সুস্পষ্ট সত্য; যার অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে বেঁচে থাকা যায়। মানুষ কুরআনের বাণী পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে মানুষ নিজেদের খুশি মতো পরিবর্তন করেছিলো, কুরআনকে কেউ সেভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনকে সংরক্ষণ করবেন।) জ্ঞানীরা কখনো এর জ্ঞান অন্বেষণ থেকে পরিতৃপ্ত হবে না। (অর্থাৎ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় কুরআনের পাঠক প্রতিনিয়তই জানতে পারবে। তাই কুরআনের পাঠকের কখনো মনে হবে না, আমি কুরআনের সব জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি। এখন আর কুরআন থেকে আমার জানার মতো কিছু বাকি নেই। বরং কুরআনের পাঠক যতো বার কুরআন পড়বে প্রত্যেকবার সে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবে। ফলে তার জ্ঞান পিপাসা আরও বেড়ে যাবে।) এবং কুরআন অধিক পাঠের কারণে

পুরনো হয়ে যাবে না (অর্থাৎ দুনিয়ার অন্য বই-পুস্তক যেমন বেশ কয়েকবার পড়ে ফেললে আর পড়ার আগ্রহ থাকে না। কুরআনের ক্ষেত্রে এমন হবে না। মানুষ কুরআন যতই পাঠ করবে ততোই তার অন্তরে কুরআনের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকবে।) কুরআনের বিস্ময় কখনো শেষ হবে না। জীনরা কুরআন শুনে বলে উঠেছিলো, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। এই কিতাব সঠিক পথ প্রদর্শন করে তাই আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি।' যে কুরআন অনুযায়ী কথা বললো সে সত্য বললো। যে কুরআনের ওপর আমল করলো সে সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হলো। যে কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করলো সে ন্যায় ও ইনসাফ করলো। আর যে কুরআনের দিকে দাওয়াত দিলো সে সিরাতে মুসতাকিমের হেদায়াত লাভ করলো।'

কুরআনের মর্যাদার ব্যাপারে এই বিরাট হাদীসটি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলাম। আপনারা এই হাদীসের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণ করুন। বাঁধাই করে নিজেদের ঘরে ঝুলিয়ে রাখুন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করুন। আর মানুষকে কুরআনের দাওয়াত দিয়ে যান। সজাগ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

মুক্তার চেয়ে দামী গ্রন্থটি সম্পর্কে

১. 'মুক্তার চেয়ে দামী' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ছেপে আসার পর মুম্বাইতে এক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেছেন, হুজুর সা.-এর কবর মোবারক খোলা হয়েছে। ফেরেশতারা এই গ্রন্থটির একটি খণ্ড নিয়ে এসে তার শিয়রে রাখছে। ওই বুযুর্গ নিজে এসে এই স্বপ্ন আমাকে শুনিয়েছেন।

২. অধম একবার স্বপ্ন দেখেছি, হযরতজি মাওলানা ইনামুল হাসান রহ. বসে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে গ্রন্থটি পড়ছেন।

৩. আমার এক বন্ধু স্বপ্নে দেখেছেন, সমস্ত আসমানের ওপর অনেকগুলো মুক্তা মানিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার ওপর গ্রন্থটির নাম লেখা।

এগুলো ছাড়াও এরকম আরো অনেক বিস্ময়কর স্বপ্ন অনেকে দেখেছেন।। এ সব কথা লেখার কারণ হলো, আমার কাছে বেশ কয়েকটি ফোন এসেছে যে, গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করা হোক। অন্য কোনো নামে সামনের খণ্ডগুলো বের হোক। কিন্তু আমি এই নাম পরিবর্তন করিনি। কারণ এই নামের মধ্যে বরকত রয়েছে যা এ সব সুসংবাদের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ তাআলাও এই কিতাবটিকে মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত করেছেন। এর নামও মানুষের মাঝে পরিচিত হয়ে গেছে।

রসূল সা.-এর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যাবলি

১. রসূল সা. সামনে যেমন দেখতে পেতেন, পেছনেও দেখতে পেতেন।

২. রাতের অন্ধকারেও তিনি দিনের মতো দেখতে পেতেন।

৩. রসূল সা. পবিত্র লালা লবনাক্ত পানিকে মিঠাপানি বানিয়ে দিতে পারতো। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে তার এক ফোঁটা লালা দিলে সে সারাদিনের জন্য তৃপ্ত হয়ে যেতো।

৪. রসূল সা.-এর বগল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও পরিস্কার ছিলো। তাতে কোনো লোম ছিলো না।

৫. তার আওয়াজ যতো দূরে যেতো, অন্যদের আওয়াজ তার দশভাগের একভাগ দূরেও যেতো না।

৬. তিনি অনেক দূর থেকে আওয়াজ শুনতে পেতেন।

৭. রসূল সা.-এর চোখ ঘুমাতো, কিন্তু তার অন্তর জাগ্রত থাকতো।

৮. তার কখনো হাই আসতো না।

৯. তার কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি।

১০. রসূল সা.-এর ঘাম মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধময় ছিলো। যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন, তার চারপাশের সুবাস থেকেই মানুষ বুঝতে পারতো, রসূল সা. এদিক দিয়ে গিয়েছেন।

১১. রসূল সা.-এর মলমুত্র মাটির ওপর কখনো দেখা যায়নি। মাটি তা গিলে নিতো। মাটির নিচ থেকে তা মেশকের সুবাস ছড়াতো।

১২. রসূল সা. খতনাকৃত ও নাভি কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মের সময় তার পুরো শরীর ময়লামুক্ত ও পরিস্কার ছিলো। তিনি সেজদারত অবস্থায় ও আকাশের দিকে আঙুল উঠিয়ে রেখেছিলেন।

১৩. তার জন্মের সময় এমন আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিলো, যে আলোতে তার সম্মানিত মা শাম দেশের বিভিন্ন শহর স্পষ্ট দেখতে পান।

১৪. ফেরেশতারা তার দোলনায় দোল দিতো।

১৫. দোলনায় চাঁদ তার সঙ্গে কথা বলতো। তিনি চাঁদের দিকে ইশারা দিলে তা তার দিকে ঝুঁকে পড়তো।

১৬. মেঘমালা তাঁকে ছায়া দিতো।

১৭. তিনি কোনো গাছের নিচে গেলে গাছ তার ওপর ঝুঁকে পড়তো।

১৮. তার কাপড়ে কখনো মাছি বসেনি।

১৯. তিনি যতোক্ষণ কোনো সওয়ারির ওপরে থাকতেন, ততোক্ষণ তা পেশাব পায়খানা করত না।

২০. রূহের জগতে সর্বপ্রথম তাঁকে সৃষ্টি করা হয়।

২১. রূহের জগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' এর উত্তরে সর্বপ্রথম তিনিই 'হ্যাঁ' বলেছিলেন।

২২. মে'রাজ কেবল রসূল সা.-এরই হয়েছে।

২৩. বোরাক বাহনটি তারই বিশেষ বাহন।

২৪. قاب قوسين অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে দুই ধনুকের দূরত্বে যাওয়া এবং সরাসরি আল্লাহর দিদার কেবল তারই বৈশিষ্ট্য।

২৫. ফেরেশতা বাহিনী তার পক্ষে লড়েছেন– এটাও তারই বৈশিষ্ট্য।

২৬. চাঁদ দুই টুকরো হওয়াও তারই বৈশিষ্ট্য।

২৭. কেয়ামতের দিন তাঁকে যেসব ক্ষমতা দেয়া হবে তা আর কাউকে দেয়া হবে না।

২৮. কবর থেকে সর্বপ্রথম রসূল সা.ই উঠবেন।

২৯. শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি জাগ্রত হবেন।

৩০. তাকে কেয়ামতের দিন বোরাকে আরোহন করিয়ে হাশরের ময়দানে আনা হবে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তার ডানে বামে থাকবে। আরশে আজীমের ডান পাশের সিংহাসনে তাকে বসানো হবে।

৩১. 'মাকামে মাহমূদ' দান করে তাঁকে সম্মানিত করা হবে।

৩২. তার হাতে لواء حمد বা প্রশংসার পতাকা দেয়া হবে। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে সকল নবী ও রসূল সেই পতাকাতলে সমবেত হবেন। সকল নবী ও রসূল তাঁদের উম্মতদের নিয়ে তার পেছনে চলবেন।

৩৩. আল্লাহর দিদারের সূচনা তাঁকে দিয়েই হবে।

৩৪. শাফায়াতে কুবরা বা বড় শাফায়াত তাঁকেই দান করা হবে।

৩৫. পুলসিরাতের ওপর দিয়ে সর্বপ্রথম তিনিই জাহান্নাম অতিক্রম করবেন। হাশরে উপস্থিত সকলকে আদেশ করা হবে, সবাই যেনো চোখ নিচু করে রাখে। কারণ মুহাম্মাদ সা.-এর পর তার কন্যা ফাতেমা রা. পুলসিরাত পার হবেন।

৩৬. বেহেশতের দরজা সর্বপ্রথম তিনিই খুলবেন।

৩৭. কেয়ামতের দিন রসূল সা.-কে মাকামে ওসীলা দিয়ে সম্মানিত করা হবে। যা তিনি ব্যতিত আর কাউকে দেয়া হবে না।

৩৮. কেয়ামত দিবসে রসূল সা. আল্লাহর এতো কাছে থাকবেন, যেমন উযির বা মন্ত্রী বাদশাহের কাছে থাকে।[১৪৩]

---

[১৪৩] তাফসীরে আযীযী পৃ: ৫০৪

রসূল সা. এর শানে কবিতা

রসূল সা.-কে নিয়ে হাসান ইবনে সাবিত রা. এর রচিত কয়েকটি পঙতি নীচে উল্লেখ করছি,

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

আমার চোখ আপনার চেয়ে সুন্দর আর কিছু দেখেনি।
আপনার চেয়ে সুদর্শন কাউকে কোনো নারী জন্ম দেয় নি

خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

আপনাকে পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত গঠন ও আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে
যেনো আপনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে

أَغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمٌ
مِنَ اللهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ وَيُشْهَدُ

আপনার বরকতময় শরীরে নবুওয়্যাতের মোহর চমকায়
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট নিদর্শন

وَضَمَّ الْإِلٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ
إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ

আল্লাহ নবীর নাম তার নামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন
যখন মুআজ্জিন আজানে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়

وشقّ لهُ من اسمهِ ليجلهُ
فَذُوْ الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ، وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

তাকে সম্মানিত করতে আল্লাহ নিজের নাম থেকেই তার নামকরণ করেছেন
আরশের মালিক 'মাহমুদ' আর ইনি 'মুহাম্মাদ'

نَبِيٌّ أَتَانَا بَعْدَ يَأْسٍ وَفَتْرَةٍ
مِنَ الرُّسُلِ، وَالْأَوْثَانِ فِي الْأَرْضِ تُعْبَدُ

নৈরাশ্য ও দীর্ঘ বিরতির পর আমাদের কাছে একজন নবী এলেন
যখন পৃথিবীতে মূর্তিরা পূজিত হচ্ছিলো

فَأَمْسٰى سِرَاجاً مُسْتَنِيْراً وَهَادِياً
يَلُوْحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِيْلُ الْمُهَنَّدُ

তিনি উজ্বল পথপ্রদর্শক প্রদীপ

তার ঔজ্জ্বল্য ইস্পাতের তরবারীর চমকের মতো

وَافٍ، وَمَاضٍ، شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
بَدْرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ

তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী ও বাস্তবায়নকারী, আলোকজ্জ্বল তারকা
সব গৌরব ও মাহাত্মের ওপর চমকাতে থাকা পূর্ণচন্দ্র

مُبَارَكٌ، كَضِيَاءِ الْبَدْرِ صُوْرَتُهُ
مَا قَالَ كَانَ قَضَاءً غَيْرَ مَرْدُوْدِ

তিনি বরকতময়, তার চেহারা চতুর্দশী চাঁদের আলোর মতো
যা বলেন তাই সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।[১৪৪]

একটি ভাবনা

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللهِ :

আল্লাহ তাআলার তওফিকে বিশ্বাস রেখে তার একত্ববাদ সম্পর্কে বলছি,

أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ এক। তার কোনো শরীক নেই।

وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ.

তার মতো কিছু নেই।

وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ.

কোনো কিছু আল্লাহ তাআলাকে অক্ষম করতে পারে না।

وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ.

তিনি অনাদি; তার কোনো সূচনা নেই। তিনি অনন্ত; তার কোনো শেষ নেই।

لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ.

তার সত্ত্বা কখনো ধ্বংস হবে না। আর কখনো শেষও হবে না।

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ.

এই পৃথিবীতে তিনি যা চান তা-ই হয়।

لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ.

---

[১৪৪] দেওয়ানে হাসসান ইবনে সাবেত

মানুষের কল্পনা-জল্পনা তার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কোনো মস্তিস্ক তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না।

وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ.

তিনি কোনো সৃষ্টিজীবের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ নন।

حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ.

আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব; কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি চিরন্তন তত্ত্বাবধায়ক; কখনো ঘুমান না।

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ.

আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনহীন সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তিনি কোনো কিছু নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নি। তিনি রসদহীন রিযিকদাতা। অর্থাৎ রিযিক দান করতে তার কোনো রসদ সংগ্রহ করতে হয় না।

مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ.

তিনি কোনো ভয় ছাড়াই মৃত্যু দান করেন। কোনো কষ্ট ছাড়াই সবাইকে আবার জীবিত করবেন।

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا.

কোনো কিছু সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ তাআলা আপন গুনাবলীর সঙ্গে শাশ্বত সত্ত্বা হিসেবে বিদ্যমান। সৃষ্টিজীবদের সৃষ্টি করার কারণে তার গুণাবলীর মধ্যে কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি তার গুণাবলীসহ যেমন অনাদিকাল থেকে আছেন, সেই সব গুণাবলীসহ অনন্তকাল থাকবেন।

لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْخَالِقِ"، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْبَارِي"

আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করার পর 'খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা নামা ধারণ করেন নি অথবা গোটা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার কারণে 'বারী' বা উদ্ভাবক নাম ধারণ করেননি।

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقَ.

প্রতিপালিত কোনো কিছু ছাড়াই তিনি 'রব' বা প্রতিপালক, সৃষ্টিজীব ছাড়াই তিনি 'খালিক' বা স্রষ্টা।

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ.

আল্লাহ তাআলা জীবন দান করার পর যেমন 'মুহয়ী' বা জীবনদানকারী

গুণে গুণান্বিত, জীবনদান করার আগেও এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একইভাবে কাউকে সৃষ্টি করার আগেই তিনি 'খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

এসব অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়গুলো এ জন্য যে, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী। সব কাজ আল্লাহর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তার মতো কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ.

তিনি নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছু করেছেন।

وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا.

এবং তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا.

এবং তাদের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন।

وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ.

মাখলুক সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুই অস্পষ্ট ছিলো না; বরং তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই তাদের পরবর্তী সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

আল্লাহ তাআলা মাখলুককে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন।

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

ভূমণ্ডলের সবকিছু তার ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া বান্দা কোনো ইচ্ছা করতে পারে না। তিনি সৃষ্টিজীবদের জন্য যা চান তা-ই বাস্তবায়িত হয়; আর যা চান না তা বাস্তবায়িত হয় না।

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا.

আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন, যাকে ইচ্ছা নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে

ন্যায়সঙ্গতভাবে অপদস্থ করেন এবং পরীক্ষায় ফেলেন।

وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

সকল মাখলুক আল্লাহ তাআলা ইচ্ছার অধীনে তার অনুগ্রহ ও ন্যায় বিচারের মধ্যে আবর্তিত হয়।

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ.

তিনি সকল প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের ঊর্ধ্বে।

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ.

আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে বাধাদানকারী কেউ নেই। তার হুকুমকে উপেক্ষাকারী কেউ নেই এবং তার কোনো বিষয়ে প্রভাব বিস্তারকারী কিংবা হস্তক্ষেপকারীও কেউ নেই।

آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

আমরা উপরোক্ত সব বিষয়ের ওপর ঈমান আনলাম। আর বিশ্বাস করলাম যে, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى.

এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবী ও প্রিয় রসূল।

وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

এবং তিনি সর্বশেষ নবী। মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলগণের সরদার এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের বন্ধু।

وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى.

তার পর নবুওয়াতের সব দাবী ভ্রষ্ট এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ।

وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ، وَكَافَّةِ الْوَرَى، بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ.

তিনি হক ও হেদায়েত, নূর ও আলো নিয়ে সমগ্র জিন ও ইনসান তথা সমগ্র সৃষ্টির কাছে প্রেরিত হয়েছেন।

জ্ঞানীদের কিছু বাণী

সোনার হরফে লেখা একটি বাণী

- আল্লাহর ভয় সকল ভয়কে দূর করে দেয়।

হযরত ইমাম গাযালী রহ. এর বাণী

- কথায় নম্রতা অবলম্বন করো, উচ্চারণের প্রভাব শব্দের চেয়ে বেশি হয়।
- বেশি লৌকিকতা ভালোবাসা কমে যাওয়ার কারণ হয়।
- অন্তরকে জীবিত ও সচেতন রাখার জন্য অধিক পড়াশোনা প্রয়োজন।
- কঠিন কথাবার্তায় রেশমের মতো নরম অন্তরও কঠিন হয়ে যায়।
- আমি ইলমের এ স্তরে পৌঁছতে পেরেছি কারণ আমি যা জানতাম না তা জানার চেষ্টায় কখনো লজ্জাবোধ করতাম না।
- অলসতা বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
- সদা সর্বদা জ্ঞান চর্চা করা উচিত এবং মানুষকে জ্ঞান চর্চার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

সক্রেটিস[১৪৫]-এর বাণী

- অন্তরঙ্গ বন্ধুর দেয়া সামান্য কষ্টও সারা জীবন ব্যথিত করে।
- লেখা এক নিরব আওয়াজ। কলম হলো হাতের যবান।
- জীবনে চলার পথে বহু বিপদাপদের মুকাবিলা করতে হয়। মৃত্যু তা থেকে মুক্তি দেয়।
- যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা বলো না।
- যে পথ জানা নেই, সেই পথে সফর করো না।
- সৎ স্বভাবের চেয়ে ভালো কিছু নেই।

---

[১৪৫]. প্রাচীণ গ্রীক দার্শনিক।

- যার প্রয়োজন যত কম, সে আল্লাহর তত নিকটবর্তী।
- নেককার হওয়া সমস্ত হেকমতের সার সংক্ষেপ। এর দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয় এবং অন্যের অন্তরে ভালোবাসা জন্মায়।

হযরত আলী রা. এর বাণী

- আল্লাহ তাআলার কুদরত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করাও ইবাদত।
- আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ রাখা শিরকের মতোই।
- মৃত্যু এক সংবাদহীন বন্ধু।
- সময়ের মোড়ে মোড়ে বিপদাপদ ওৎ পেতে বসে আছে।
- অধিক ইবাদত করা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।
- পাপের কারণে লজ্জিত হলে পাপ মোচন হয়ে যায়। আর নেককাজ করে মনে আত্মতুষ্টি এলে তা তাকে ধ্বংস করে দেয়।
- জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই চিন্তা-ফিকিরে মগ্ন থাকে।
- অনুপযোগী জায়গায় লজ্জাও বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।
- খুব কম লোকই সব সময় সুস্থ থাকে।
- শিষ্টাচার সর্বোত্তম গুণ আর দান-সদকা করা সর্বোত্তম ইবাদত।
- জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে নিজে গুটিয়ে রেখে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। আর মূর্খ ব্যক্তি নিজে থেকে আগে বেড়ে অপমানিত হয়।
- বন্ধুত্ব নিজের সৃষ্টি করা এক আত্মীয়তা।
- প্রবৃত্তির পূজা মানুষকে ধ্বংস করে।

হযরত হাসান বসরী রহ. এর বাণী

- ইসলাম সকল নেকের মূল।
- হেকমতশূন্য কাজ মানেই বিপদ, হেকতমশূন্য নিরবতা হলো উদাসীনতা। আর হেকমতশূন্য দৃষ্টি মানুষকে লাঞ্ছিত করে।
- যে ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বত থেকে বেঁচে থাকলো, সে নিজেই নিজের উপকার করলো।
- দুনিয়াতে তোমাদের নফসের চেয়ে অবাধ্য প্রাণী নেই। নফসের জন্য কঠিন লাগামের প্রয়োজন।
- দুনিয়ায় ডুবে যাওয়ার শাস্তি হলো অন্তরের মৃত্যু।

- সুখে দুখে, স্বচ্ছল এবং অস্বচ্ছল অবস্থায় মিথ্যা কথা পরিহার করো। এবং সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকো।
- জান্নাতের বিপরীতে বড় থেকে বড় নেয়ামতও তুচ্ছ। আর দোযখের মোকাবেলায় বড় থেকে বড় মসিবতও নগণ্য ও সহনীয়।

আরও কিছু বাণী

کبھی پاؤں لڑکھڑائے تو کہا یہ مجھ سے دل نے
وہ چمک رہی ہے منزل وہ غبارِ کارواں ہے
চলতে চলতে যখন পা টলে ওঠে তখন অন্তর বলে
ওই যে দূরে গন্তব্য দেখা যায়, কাফেলার ধুলো ওড়ে।[১৪৬]

প্রথা-প্রচলন, ফ্যশন ও আধুনিকতা মানুষের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়।[১৪৭]

ওই কাজ করার চেষ্টা করো যা তোমার দৃষ্টিতে ভালো মনে হয়। অন্য কাজ আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।[১৪৮]

آنے والے جانے والے ہر زمانے کے لئے
آدمی مزدور ہے راہیں بنانے کے لئے
আগত ও অনাগত সব যুগেই
মানুষ রাস্তা নির্মাণের শ্রমিক।[১৪৯]

---

[১৪৬] শাকীল বাদায়ুনি
[১৪৭] জন স্টুয়ার্ট মিল
[১৪৮] লং ফেলো
[১৪৯] হাফিজ জলন্ধরি

মুক্তার চেয়ে দামী

দ্বাদশ খণ্ড

مرید باسعادت رو رو کے ہو گیا تائب
اللہ کرے یہ توفیق شیخ کو بھی مل جائے
সৌভাগ্যবান মুরিদ কেঁদে কেঁদে তাওবাকারী হয়ে গেলো
আল্লাহ যেনো শায়েখকেও তওবার তওফিক দান করেন।



সবক : ১

পাপ করার পর অজুহাত খোঁজা

وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ وَ اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

আর বলো, 'তোমরা আমল করো। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তার রসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'।

আর আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় অপর কিছু লোকের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হলো। তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন নয়তো তাদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১]

ব্যাখ্যা : কিছু লোক এমন আছে যারা অবশ্য-পালনীয় দীনি কাজগুলো নিয়মিত করলেও যখন এমন কোনো পরিস্থিতি আসে, যে পরিস্থিতিতে নিজের সর্বস্ব নিয়ে দীনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, তখন সে নানা ধরণের দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগে। নিজের জীবন ও সম্পদকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতে চায়। দুনিয়ার মোহ তাদেরকে দীনি দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে দেয় না। এ ধরনের মানুষ যদিও দোষী; কিন্তু তারা যদি তাদের অপরাধ স্বীকার করে, লজ্জিত হয় এবং তওবা করে দীনের পথে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য।

এরকম কোনো অপরাধী যদি নতুন করে দীনি খেদমত করতে আগ্রহী হয়, সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তাহলে বোঝা যাবে সে অনুতপ্ত হয়েছে। তখন আর তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়। বরং তাদেরকে দূরে ঠেলে না দিয়ে আপন করে নেওয়া উচিত।

অপরাধের উপর অটল অবিচল থাকা এবং অপরাধকে অপরাধ মনে না করাই প্রকৃতপক্ষে বড় অপরাধ। অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। পাপ করার পর কেউ যদি অনুতপ্ত না হয়ে পাপকে ব্যাখ্যা করে হালকা বানানোর চেষ্টা করে, তাহলে সে ধ্বংস হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

অপরাধ করার পর মানুষের দু'টি অবস্থা হয়:

এক. সে নিজের ভুল স্বীকার করে।

দুই. অথবা সে ভুল স্বীকার না করে অপরাধ করেই যায়।

যে ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তার মাঝে বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি হয়। পুনরায় সে আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত হয়। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধ না মেনে তা করতেই থাকে, আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হন। সে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে, মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করায়, একটি দোষ ঢাকার জন্য আরো বহু মিথ্যাচার করতে থাকে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যে অপরাধ স্বীকার করে সে আল্লাহর রহমত লাভ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য আল্লাহর শাস্তি নির্ধারিত হয়।

---

[১] সূরা তওবা, আয়াত: ১০২-১০৬

সবক : ২

তাকওয়া ও জুলুম

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ○ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَّمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ○ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَه عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَه عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِه فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ○ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, 'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি'। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

তুমি সেখানে কখনো [সালাত কায়েম করতে] দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠা করলো, সে কি উত্তম না ওই ব্যক্তি যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়লো জাহান্নামের আগুনে। আর আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।

তাদের নির্মিত গৃহ, তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন [এর বিনিময়ে] যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা

আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা [আল্লাহর সংগে] যে সওদা করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।[২]

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবন গঠনের ভিত্তি যেমন তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি হতে পারে, কারো ক্ষেত্রে জীবন গঠনের ভিত্তি হতে পারে জুলুম অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়ন। যার জীবন গঠনের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি সে যে কোনো কাজ করার আগে ভাবে, তার কাজটি আল্লাহকে অখুশি বা ক্রুদ্ধ করবে কি না? সে কখনো ভুলে যায় না যে, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব একদিন এমন এক মহাপরাক্রমশালী নেবেন যিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে জানেন। প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সবকিছুরই খবর রাখেন। প্রত্যেককেই তিনি তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। এই ব্যক্তির জীবনের ভিত্তি খুবই মজবুত ও শক্তিশালী।

আর যারা আল্লাহভীতি থেকে মুক্ত, বেপরোয়াভাবে যেভাবে খুশি জীবনযাপন করে, কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে যা ইচ্ছা বলে, যা মনে চায় করে, তাদের জীবনের ভিত্তি হলো জুলুম। এরকম ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত ওই ভবনের মতো, যে ভবন গর্তের কিনারায় নির্মাণ করা হয় আর হঠাৎ একদিন ভবনটি স্থানচ্যুত হয়ে গভীর কূপে পতিত হয়।

যারা জুলুমের ভীতের ওপর জীবন গড়ে তোলে এবং অন্যায় অত্যাচার করে জীবন কাটায়, মদিনার মসজিদে যেরারের উপমা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের সবচেয়ে বড় ও কঠিন অপরাধের বর্ণনা দিয়েছেন। সে সময় মদিনায় দুটি মসজিদ ছিলো। জনবসতি এলাকায় ছিলো মসজিদে নববী। শহরতলীতে ছিলো মসজিদে কোবা। মুনাফিক মুসলমানেরা আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করলো। তারা বলতো দীন প্রচারের উদ্দেশ্যেই তারা এই মসজিদ নির্মাণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, নিজেদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করা। আমাদের যুগেও অনেকে আছে যারা নিজের আত্মম্ভরিতার কারণে হকের দাওয়াত কবুল না করে হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নানা ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে থাকেন। তার পক্ষে ও বিপক্ষে মুসলমানগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এ ধরনের লোকজন নিজের ধ্বংসাত্মক কাজকে দীন মনে করে করতে থাকে। এমনকি তারা বড় বড় আলেমদেরকে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে

---

[২] সূরা তওবা, আয়াত: ১০৭-১১০

রাখার অপচেষ্টা চালায়, যাতে তারা মানুষের আস্থাভাজন হতে পারে।

এই লোকগুলো ভুলে যায় যে, হকের বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতার শামিল। আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর যমীনে কেউ কখনো সফল হতে পারবে না। বরং আক্ষেপ ও আফসোসের মৃত্যুবরণই তাদের জন্য নির্ধারিত। তারা আল্লাহর রহমত থেকেও চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়।

সবক : ৩

সরল পথ থেকে সরে যাওয়া

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ○ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○

আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলদের প্রতি ঈমান আনো, তাদেরকে সহযোগিতা করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।

সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের

থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।[৩]

ব্যাখ্যা: বনী ইসরাইলের কাছ থেকে আল্লাহ নবীদের অনুসরণ করা ও আল্লাহর বিধান মেনে জীবনযাপন করার অঙ্গীকার নেন। তাদের বারোটি গোত্র থেকে বারোজন সরদারকে তাদের দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বনী ইসরাঈল আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিলো যে, তারা নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে নবীদের সহযোগিতা করে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বানকারীদের কাতারে শামিল হবে। এই কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করাই আল্লাহর দৃষ্টিতে আল্লাহর সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করার মাধ্যম। এই কাজগুলো মানুষকে পরিশুদ্ধ করে জান্নাতের স্বপ্নীল ভূবনে প্রবেশ করার উপযুক্ত বানায়।

এই অঙ্গীকারের মধ্যে যে আমলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোই দীনের মৌলিক আমল। এটাই সেই সরল পথ যা মানুষকে আল্লাহ এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আসমানি কিতাবের বাহক কোনো সম্প্রদায় যখন অবাধ্য হয়, তখন তারা সরল পথ ছেড়ে ডানে বা বামে চলতে শুরু করে। নিজের খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দীনের ধারণাই পাল্টে দেয়। আল্লাহর ইবাদতের নামে নিজেদের নফসের ইবাদত করে। হকের দাওয়াতের নামে তারা অযথা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। অহেতুক কাজকর্মকে দীনের নামে চালিয়ে দেয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাসের কাজে বিপুল সম্পদ খরচ করে আর দাবি করে এই সম্পদ তারা দীনের কাজে খরচ করেছে।

আয়াতে আল্লাহ বনী ইসরাইলের কথা বলেছেন। তারা নিজেদের দুনিয়া লাভের জন্য একটি নতুন ধর্ম গড়ে তুলেছিলো আর এটাকেই আল্লাহর ধর্ম বলে প্রচার করতো। কোনো সম্প্রদায় যখন বিপথে চলতে চলতে এই পর্যায়ে পৌঁছে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। আল্লাহর রহমত দয়া এবং তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তারা শুধু নিজের জৈবিক চাহিদাটাকেই মুখ্য মনে করে আর এর মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। এভাবেই একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে চলে আসে এবং তাদেরকে পাঁকড়াও করে আল্লাহর আদালতে পৌঁছে দেয়।

---

[৩] সূরা মায়েদা, আয়াত: ১২, ১৩

সবক : ৪

তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ○ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ○

আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি, যখন তারা বলছে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি। বলো, 'কে নাযিল করেছে সে কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছে মানবজাতির জন্য আলো ও পথনির্দেশস্বরূপ, তোমরা তা বিভিন্ন কাগজে লিখে রাখতে, তোমরা তা প্রকাশ করতে আর অনেক অংশ গোপন রাখতে; আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো যা জানতে না তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষ'? বলো, 'আল্লাহ'। তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অযাচিত সমালোচনায় খেলতে থাকুক।

আর এটি একটি কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি, বরকতময়, যা তাদের সামনে আছে তার সত্যায়নকারী। আর যাতে তুমি সতর্ক কর উম্মুল কুরা [মক্কা] ও তার আশ-পাশে যারা আছে তাদেরকে। আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের সালাতের উপর যত্নবান থাকে।[৪]

ব্যাখ্যা : রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার মানুষদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন মক্কার কাফেররা কয়েকজন ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) -এর ওপর আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়? ইহুদিরা উত্তর দিয়েছিলো, আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের ওপর ওহী অবতীর্ণ করেন না।

তাদের এই কথাটি ছিলো খুবই বিস্ময়কর। কারণ ইহুদিরা তো নবীদেরই অনুসারী। সুতরাং তারা অবশ্যই স্বীকার করতো যে, মানুষের উপর আল্লাহর

---

[৪] সূরা আনআম, আয়াত: ৯১-৯২

বাণী অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইহুদিরা রসূল সা.-এর বিরোধিতায় এতোটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যে নিজেদের সর্বসম্মত বিশ্বাসের বিপরীত কথা বলতেও দ্বিধা করেনি।

ইহুদিদের মাঝে এই নির্লজ্জতা তৈরি হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহর কিতাবকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো। তারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানতো আর কিছু অংশ কিতাবের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতো। তারা পুরস্কার দানকারী আয়াতগুলোকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতো এবং শোনাতো। কিন্তু সেই আয়াতগুলো এড়িয়ে যেতো, যেখানে পুরস্কারের যোগ্য হওয়ার আমলগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে। তারা তাওরাতের কিছু আয়াতের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতো, যা তাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রাজনীতির পক্ষে যায়। পাশাপাশি যেসব আয়াতে সরাসরি এগুলোর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে সেই আয়াগুলো পুরোপুরি উপেক্ষা করতো। তারা এমন আয়াতগুলো শিক্ষার্থীদের খুব গুরুত্বের সাথে পড়াতো, যেগুলো তাদের মর্জি মাফিক মনে হতো এবং যেগুলো তারা মানতে পারতো। যে আয়াতগুলো তারা মানতে চাইতো না, সেগুলোতে নজর বুলিয়ে চলে যেতো। তারা ওই আয়াতগুলোই বেশি বেশি আলোচনায় আনতো, যেসব আয়াতে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যম বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতগুলো উপেক্ষা করে যেতো। যারা আল্লাহর কিতাব এভাবে টুকরো টুকরো করার মতো গর্হিত ও জঘন্য কাজ অনবরত করতে থাকে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা লাজ লজ্জাহীন হয়ে যায়। তারা অশ্লীল আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকে। সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী ও নিজেদের বিশ্বাস বিরোধী কথাবার্তা বলতে তারা বিন্দুমাত্রও সংকোচ বোধ করে না। যারা আল্লাহর সাথে এবং তার প্রদত্ত কিতাবের সাথে এভাবে বেইনসাফি করতে পারে, তারা মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

দীনের দাওয়াত মূলত মানুষকে সতর্ক করার দাওয়াত। যে কোনো পর্যায়ের ব্যক্তির পক্ষ থেকে দীনি দাওয়াত আসুক না কেনো তা শ্রোতাদের অন্তরে রেখাপাত করে যদি দাঈর অন্তরে খোদাভীতি এবং আখেরাতের হিসাব-নিকাশের ভয় জাগরুক থাকে। উপদেশ দেয়ার জন্য সেই উপদেশের ওপর উপদেশ দাতার আমল থাকা আবশ্যক। যে নিজে বিপরীত কাজ করে অন্যকে উপদেশ দেয়, তার উপদেশ কারো উপকার করতে পারে না।

সবক : ৫

আল্লাহই দাঈকে সাহায্য করেন

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ○ وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ○

আর তার চেয়ে বড় জালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, অথবা বলে, 'আমার উপর ওহী প্রেরণ করা হয়েছে', অথচ তার প্রতি কোন কিছুই প্রেরণ করা হয়নি? যে বলে 'আমি অচিরেই নাযিল করবো, যেরূপ আল্লাহ নাযিল করেছেন'। যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকবে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে অসত্য বলতে এবং তার বিধান সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।

আর নিশ্চয় তোমরা এসেছ আমার কাছে একা একা, যেরূপ সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদেরকে প্রথমবার এবং আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা তোমরা ছেড়ে রেখেছো তোমাদের পিঠের পেছনে। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের তোমরা মনে করেছো যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহর অংশীদার। অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে।[৫]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা যখন নিজের কোনো বান্দাকে দীনের প্রচার

---

[৫] সূরা আনআম, আয়াত: ৯৩-৯৪

প্রসারের জন্য দাঁড় করান, তখন তাকে সেই কাজ করার তওফীকও দান করেন। তার সব কাজে খোদাভীতির ছাপ থাকে। তার কথাবার্তায়, যুক্তিতর্কে আল্লাহর সাহায্যের দ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। বিরোধীদের সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও সে নিজের দীন প্রচারের কাজকে সর্বোত্তম পন্থায় জারি রাখতে সক্ষম হয়। সে হয় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর স্মারক। তাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।

যারা দুনিয়ার শান শওকত আর মান-মর্যাদা অর্জনের নেশায় ডুবে গেছে, তারা দীন প্রচারকের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। তারা নিজেদেরকে দীন প্রচারকদের চেয়ে উত্তম মনে করে এবং তাদের সাথে উদ্ধত আচরণ করে। যে ব্যক্তি মিথ্যা আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্যে ডুবে থাকে, সে অযৌক্তিক কথাবার্তা বলবে এবং উদ্ধত আচারণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা এমন কি ভুল ধারণায়ও নিমজ্জিত থাকে যে, তারাও ইচ্ছে করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালামের মতো কালাম সৃষ্টি করতে পারে। তারা আল্লাহর প্রেরিত কালাম ও অন্যান্য নিদর্শনগুলোর মাহাত্ম্য বুঝতে ব্যর্থ হয়।

এই উদ্ধত ও অবিশ্বাসীরা ইহলৌকিক সম্পদ ও শান শওকতের ওপর ভর করে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। তারা ভুলে যায় যে, দুনিয়াতে যা কিছু সে লাভ করেছে, তা শুধু তাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আচমকাই এ সব কিছুই হারিয়ে যাবে। উধাও হয়ে যাবে। এরপর মানুষ তেমনই একা হয়ে যাবে যেমন একা সে পৃথিবীতে এসেছিলো। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ এমন এক জগতে চলে যায় যেখানে না তার ধন-দৌলত পৌঁছতে পারে, না তার প্রভাব-প্রতিপত্তি পৌঁছতে পারে। যেখানে না তার কোনো সঙ্গী থাকবে, না কোনো সুপারিশকারী থাকবে। শুধু সে থাকবে। তাকে একা আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়াতে সে যেসব অর্থহীন সম্পদ নিয়ে গর্ব করতো, সেগুলোর কোনোটাই সেদিন তাকে আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে রক্ষা করার জন্য উপস্থিত হবে না।

দুনিয়াতে অনেক মানুষই শব্দের যাদু দিয়ে তর্কে বিজয়ী হতে পারে। শব্দের ভেল্কিবাজি দিয়ে অপরকে হার মানাতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তিই এমন যুক্তি খুঁজে বেড়ায় যার মাধ্যমে সে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে পারবে। তারা তাদের চলার পথকে গন্তব্যস্থলে মনে করে মিথ্যে যুক্তির জাল রচনা করে এবং মিথ্যে মোহমায়ায় ডুবে থাকে। কিন্তু পরজীবনে যখন সব পর্দা উঠিয়ে দেয়া হবে, সব মুখোশ খুলে ফেলা হবে, সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, তখন মানুষের সমস্ত যুক্তিজাল অর্থহীন হয়ে যাবে।

সবক : ৬

মুনাফিক কথায় সবার আগে, কাজে সবার পেছনে

وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ○ طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ○ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ○

আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, 'কেন একটি সূরা নাযিল করা হয়নি?' অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।

আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা তাদের জন্য উত্তম। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো।

তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছো যে, যদি তোমরা শাসন কর্তৃত্ব পাও, তবে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

এরাই যাদেরকে আল্লাহ লানত করেন, তাদে কে বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন।[৬]

ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা কথায় খুব পটু হয়, গলাবাজিতে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে থাকে সবার পেছনে। জিহাদের নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত তারা জিহাদে শরীক হওয়ার কথা বলতো। জিহাদে বীরত্বের সাথে লড়াই করার আকাঙ্খা প্রকাশ করতো। কিন্তু বাস্তবে যখন জিহাদের নির্দেশ চলে এলো, তখন তাদের সব আগ্রহ উবে গেলো। নানা ছল ছুতোয় পেছনে থেকে যাওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলো।

পক্ষান্তরে সত্যিকারের ঈমানদাররা সর্বদাই আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে

---

[৬] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২০-২৩

এবং যখন কোনো কঠিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক আসে, তখন তারা প্রমাণ করে দেয় যে, তারা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো তাতে তারা পুরোপুরি অটল ও অবিচল আছে।

মুনাফিকরা জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য সন্ধি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই তারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। আত্মীয়দের শত্রুদের সাহায্য সহযোগিতা করে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে তাদের যে অবস্থা ছিলো ওই অবস্থায়ই ফিরে যায়। এদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন। ফলে তাদের উপলব্ধি করার শক্তি এবং চিন্তা করার সামর্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। তারা চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না, কান থাকা সত্ত্বেও শুনতে পায় না।

সবক : ৭

মুনাফিকরা রসূলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ভাণ করতো

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ○ وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّ اٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ○

আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই মাত্র সে কী বললো?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে।

আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন।[৭]

ব্যাখ্যা : মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট ছিলো এই যে, রসূল সা.-এর মজলিসে বসলে বাহ্যত তারা ভদ্র ও মনোযোগী শ্রোতা হওয়ার ভাণ করতো; আসলে তারা তখনও তাদের কোনো দুষ্ট চিন্তায়ই বিভোর থাকতো। মজলিসে বসে থাকলেও মজলিসের কথাবার্তা তারা শুনতে পেতো না। তাই মজলিসের বাইরে গিয়ে জ্ঞানী সাহাবীদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করতো, 'হযরত কি বললেন'?

---

[৭] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৬-১৭

এটা ছিলো কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের ফল। যারা সর্বদাই কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাদের বোধশক্তি ও মেধা নষ্ট হয়ে যায়। মুনাফিকরা দলীল-প্রমাণ সামনে থাকার পরও সত্যের অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজেদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিলো, ফলে তাদের মেধা ও বোধশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো। স্পষ্ট বিষয়গুলোও তারা অনুধাবন করতে পারতো না।

এর বিপরীতে যারা প্রকৃতই গুরুত্ব দিয়ে দীনের কথা শোনে। সত্যের সামনে নত হয় এবং নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয়, তাদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তর জীবিত হয়। তারা আল্লাহর আল্লাহর পরিচয় লাভ করে।

সবক : ৮

মুনাফিকের আরেক রোগ অন্তরের কপটতা

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ○
وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ
وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ○

নাকি যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না?

আমি যদি চাইতাম তাহলে, তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, লক্ষণ দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারতে। তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গি দেখে তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহের ব্যাপারে জানেন।[৮]

ব্যাখ্যা : মুনাফিকের আরেকটি রোগ হলো কপটতা। মুনাফিকরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিলো, ইসলাম অগ্রযাত্রায় সত্যিকার মুসলমানরা লাভবান হচ্ছে। তারা ভাবতো আমরা এমন কাজে নিজের জান ও মাল কেনো ব্যয় করবো, যাতে অন্যরা লাভবান হয়, তাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে?

মুনাফিকরা তাদের বাহ্যিক আচার ব্যবহারে এই মনোভাব গোপন করে রাখতো। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে তা গোপন ছিলো না। তারা ধারণা করতো, আল্লাহ পাক তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তাদের ধারণা ছিলো ভুল। আল্লাহ তাআলা তাদের

---

[৮] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৯-৩০

ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার কথা এমনভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হতে পারে নি। মুনাফিকদের ভাণ-ভণ্ডামি সাহাবীরা বুঝতে পারতেন। তাদের মেকি কথা বার্তা থেকেই প্রকাশ পেতো যে, ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শুধু প্রদর্শনের জন্য, বস্তুত ইসলামের সাথে তাদের আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই।

সবক : ৯

প্রতিটি মানুষের ভেতরই বড় হওয়ার স্বপ্ন থাকে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ○

হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।[৯]

ব্যাখ্যা : প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বড় হওয়ার স্বপ্ন থাকে। এ কারণেই অন্যের কোনো কথা বা কোনো কাজ পছন্দ হলে সে এর পেছনে উঠে পড়ে লাগে এবং সেটাকে খুব ভালোভাবে যাচাই করতে থাকে, যেনো সে সেই কথা বা কাজের কোনো ত্রুটি বের করে নিজেকে বড় আর তাকে ছোট প্রমাণ করতে পারে।

মানুষ নিজেকে বড় ভেবে প্রশান্তি লাভ করার জন্যই অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করে, অন্যের দোষ চর্চা করে, অন্যকে মন্দ নামে উল্লেখ করে। কিন্তু ভালো এবং মন্দ হওয়ার মাপকাঠি তো মানুষ নিজে নির্ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত ভালো তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে ভালো আর যে আল্লাহর কাছে মন্দ সেই প্রকৃত মন্দ ব্যক্তি। যে এটা উপলব্ধি করতে পারে সে নিজের বড়ত্বের বড়াই করতে পারে না। অন্যকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা, অন্যকে অপবাদ দেওয়া,

---

[৯] সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১

দোষারোপ করা, মন্দ উপাধিতে ডাকা ইত্যাদি সবই তার কাছে অহেতুক মনে হতে থাকে। কারণ সে তখন ভাবে তখন, মানুষের মর্যাদাবান হওয়ার ফায়সালা তো আল্লাহর কাছেই হবে। আজ আমি যদি কাউকে ছোট মনে করি আর আখেরাতের ফায়সালায় তাকে মর্যাদাবান ঘোষণা দেয়া হয়, তাহলে তাকে ছোট মনে করাটা তো আমার অর্থহীন এবং বোকামি হবে।

সবক : ১০

কোনো কোনো ধারণা পাপ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ○

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।[১০]

ব্যাখ্যা : কারো মনে যদি কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার কাছে ওই ব্যক্তির সবকিছুই ভুল মনে হতে থাকে। তার ব্যাপারে তার মন সর্বদাই নেতিবাচক দিকে ঝোঁকে। সে তার দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতে থাকে এবং তার অপকর্মগুলো লোক সমাজে বর্ণনা করে করে তাকে আরও অসম্মানিত করা তার কাছে খুব প্রিয় ও ভালো কাজ মনে হয়।

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে কুধারণা পোষণ, অপবাদ এবং পরিবার পরিজন অথবা অন্য অধীনস্তদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেক সময় এরকম ধারণা অন্যায় ও পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

কুধারণা থেকে সমাজে অনেক ফেতনা ছড়ায়। তাই এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা কর্তব্য। ভিত্তিহীন কুধারণা মনে জায়গা দেওয়া উচিত নয়।

আপনার মনে যদি কারো ব্যাপারে কুধারণা জন্মায় তাহলে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে কথাবার্তা বলুন। তার অনুপস্থিতিতে তার মন্দচর্চা করবেন না। এটা খুব

---

[১০] সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২

খারাপ অভ্যাস। মানুষের সামনে তার দোষ বললে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে বা নিজেকে সংশোধন করতে পারে কিন্তু পেছনে দোষ বললে শুধু ক্ষতিই হয়, কোনো লাভ হয় না। মানুষ প্রায়ই এ ধরনের ভুল করে; অন্যের দোষ চর্চা করে নিজেকে বড় ভাবে। আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকলে তারা অন্যায় করে নিজেকে বড় ভাবতো না। আল্লাহভীতিই তাদেরকে সতর্ক করে দিতো।

মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য দেখা যায়; কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ এক বংশের, আবার কেউ অন্য বংশের, কেউ এ দেশের আবার, কেউ ভিন দেশের। এসব পার্থক্য শুধু মানুষের পরিচয়ের জন্য। মানুষের মাঝে অসাম্য সৃষ্টি এবং উঁচু নীচু নির্ধারণ করার জন্য আল্লাহ এসব প্রার্থক্য সৃষ্টি করেন নি। অথচ কিছু মানুষ এই পার্থক্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে সমাজে স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয় যা সমাজকে অনাচার ও বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়।

সৃষ্টির শুরু থেকেই সব মানুষ সমান। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই মানুষকে মর্যাদাবান বানাতে পারে আর কার অন্তরে আল্লাহর ভয় কতটুকু আছে এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

সবক : ১১

মুনাফিক মানুষকে শুধু নিজের কথা শোনাতে চায়

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُه وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ○ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ○

যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল'। আল্লাহ জানেন আপনি তার রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

তারা নিজদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাঁধা দেয়। তারা যা করছে, তা কতইনা মন্দ!

তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারে না।[১১]

---

[১১] সূরা মুনাফিকুন, আয়াত: ১-৩

ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা হয় বাকপটু। তারা কথা দিয়ে সবার মন যোগাতে চেষ্টা করে। যেমন রসূলের যুগের মুনাফিকরা শপথ করে তাদের কথা বিশ্বাস করাতে চাইতো। পক্ষান্তরে সত্যিকারের মুমিনরা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে। তারা মুখের তুলনায় অন্তর দিয়ে বেশি কথা বলে। মুনাফিক ব্যক্তি শুধু মানুষকে কথা শোনাতে চায়, বিশ্বাস করাতে চায়। আর প্রকৃত মুমিন নিজের কথা আল্লাহকে শোনাতে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকে।

যখন কোনো ব্যক্তি ঈমান আনে তখন সে এক উত্তম অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। এরপর তার জীবনের আমলী অধ্যায় শুরু হয়। প্রকৃত মুমিন অন্তরের আওয়াজ শোনে এবং নিজের কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী আমল করে। এর বিপরীতে যে অন্তরের আওয়াজকে উপেক্ষা করে প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম আমল করে, সে ধীরে ধীরে নিজের ঈমানের অঙ্গীকারের ব্যাপারে অনুভূতিহীন হয়ে যায়। এটাকেই আল্লাহ 'অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া' বলেছেন।

সবক : ১২

মুনাফিক স্বার্থপর হয়

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ○ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ○

আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে, তারা কথা বললে তুমি তাদের কথা আগ্রহ নিয়ে শোনো, যদিও তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই; তারা প্রতিটি শোরগোলকেই নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে!

আর তাদেরকে যখন বলা হয় এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও দম্ভভরে চলে যেতে।[১২]

ব্যাখ্যা : মুনাফিক ব্যক্তি সব সময় নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টায় থাকে। সে

---

[১২] সূরা মুনাফিকুন, আয়াত: ৪-৫

হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে প্রয়োজনীয় মনে করে না। সত্য অসত্যের কোনো বাছ বিচার করে না। নিজের স্বার্থে সকলের সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। দুনিয়ার জীবন ও পরকাল সম্পর্কে সে কোনো চিন্তা ভাবনাই করে না, তাই কৃতকর্ম নিয়ে সে কোনো দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীতেও থাকে না। দুশ্চিন্তা পেরেশানী না থাকার কারণে তার শরীর স্থুল হয়ে ওঠে। তারা সবার মন যুগিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। এ জন্য তাদের কথাবার্তা সবাইকেই খুশি করে। বাহ্যত তাদেরকে দেখতে সবুজ-শ্যামল বাগানের মতো মনে হলেও আসলে তারা শুকনো কিছু খড়ির স্তুপ মাত্র। যার মাঝে কোনো প্রাণ নেই। তারা ভীরু ও কাপুরুষ। তাদের কাছে দীনি ফায়দার চেয়ে পার্থিব ফায়দা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরা সুউচ্চ কণ্ঠে ঈমানের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও আল্লহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত।

সবক : ১৩

মুনাফিক দুনিয়া পূজারী হয়

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ○

আর তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান এবং কাফির অবস্থায়ই তাদের জান বের হয়ে যাবে।[১৩]

ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা দুনিয়া পূজারী হয়। দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী জমা করায় তাদের আগ্রহ থাকে সিমাহীন। তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করে, মানুষকে দেখায় তাদের পক্ষে ও সমর্থনে অনেক মানুষ রয়েছে। দুর্বল চরিত্রের লোকজন তাদের ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে প্রভাবিত হয়। কিন্তু দূরদর্শী ঈমানদাররা তাদের বাহ্যিক শান শওকত দেখে ঈর্ষা করে না; বরং এটাকে তারা নিজেদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় মনে করে। তারা বুঝতে পারে এসব বিলাস সামগ্রী তাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো তারাই যারা দুনিয়ার মোহ ও মায়াজাল ছিন্ন করে, সব ভয় ভীতি উপেক্ষা করে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। যারা দুনিয়ার বিলাস, সম্পদ ও শান শওকতের পেছনে পড়ে গেছে, যারা দুনিয়ার মোহজাল ছিন্ন করার হিম্মত হারিয়েছে, তারা আল্লাহর নেক বান্দাও হতে পারে না। দুনিয়ার উন্নতিই তাদের পরকালকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আখেরাতে তারা উত্থিত হবে

---

[১৩] সূরা তওবা, আয়াত: ৮৫

একেবারেই শূন্য হাতে।

তাদের অবস্থা হলো, যখন আল্লাহর দীন বলে, নিজের আমিত্য ও অহংকার মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধরো, তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যখন আল্লাহর দীন ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে দীনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে তখন তারা নিজেদের সুনাম ও সুখ্যাতি নষ্ট হওয়ার অজুহাতে পেছনে পড়ে থাকে। যখন আল্লাহর দীন নিজের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দীনের প্রয়োজনে দান করতে বলে, তখন তাদের কাছে তাদের জীবন ও সম্পদ দীনের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে হতে থাকে। যদিও দুনিয়া উপার্জনের জন্য তারা নিজের জীবন ও সম্পদ ঝুঁকির মুখে ফেলতে দ্বিধা করে না।

তাদের দুনিয়া পূজা ও ভোগ বিলাস বাড়তে বাড়তে এক সময় তাদের অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাদের অন্তরের সৎ অংশটি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্তর তাদেরকে আর সত্যের পথে থাকতে বলে না। বড় বড় অন্যায় করলেও অন্তরে কোনে ব্যাথা বা অনুশোচনা জাগে না।

এর বিপরীতে যারা সত্যিকারের ঈমানদার তারা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ও দীনের চাহিদাকেই প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর মোকাবেলায় অন্য সব কিছু তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। তারা সবকিছু উৎসর্গ করে হলেও আল্লাহর পথে অটল ও অবিচল থাকে। তাদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর অবারিত রহমত এবং বিপুল নেয়ামতরাজি। তাদের এবং আল্লাহর চিরস্থায়ী জান্নাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় নেই।

সবক : ১৪

দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ○ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ○

নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।

যদি তাদের কাছে সকল নিদর্শন এসেও উপস্থিত হয়; যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করবে।

তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনো জনপদবাসী কেনো

> এমন হলো না যারা ঈমান আনে এবং তার ঈমান তাদের উপকারেও আসে? যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনাকর আযাব সরিয়ে দিলাম এবং আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।[১৪]

ব্যাখ্যা : মানুষের সামনে যখন সত্য আসে, তখন তার বিবেক সাক্ষ্য দিতে থাকে, এটা ন্যায়, এটা সত্য। ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। হকপন্থী হতে গেলে অনেক কিছু হারাতে হয়। কিন্তু এর জন্য মানুষ প্রস্তুত নয়। মানুষের সামনে অপদস্ত হওয়া, নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলা, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া এগুলো বেশিরভাগ মানুষের জন্যই সহজ কাজ নয়। এগুলোই সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে মনে জানে ও বিশ্বাস করে এটাই ন্যায় ও সত্য কিন্তু মুখে স্বীকার করে না। অন্ধের মতো বিরোধিতা করে যায়।

বর্তমানে মানুষ এমন হয়ে গেছে যে, একবার সে যেদিকে চলতে শুরু করে সেদিকেই অটল থাকতে চায়। তার মেধা-বুদ্ধি সেই মতবাদের পক্ষেই কাজে লাগাতে থাকে। এ কারণে একবার সত্য থেকে বিমুখ হওয়ার পর খুব কম মানুষই আবার সত্যের দিকে ফিরে আসতে পারে। কারণ অসত্য ও অন্যায়ের পথে চলতে চলতে তার বিবেক, চিন্তা-চেতনা কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে যেতে থাকে। এক সময় সে সত্যমুখী হওয়ার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে।

মানুষ নিজের অবস্থান ও মতামত এমনভাবে প্রকাশ করে, যা থেকে মনে হতে পারে সে নিজের যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যাচাই করেই এই মতবাদের পক্ষে আছে। বস্তুত সে একগুঁয়েমি, অহংকার এবং নিজের ইহলৌকিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই এই মতবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আল্লাহর আযাব যখন আসবে, তখন মানুষের ভেক ও ভণ্ডামির পর্দা খসে পড়বে।

কোনো নবী-রসূলের পুরো উম্মতই ঈমান এনেছে এমন কখনো হয় নি। কিন্তু যখন আল্লাহর শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে, শাস্তি তাদের মাথার উপরে চলে এসেছে, তখন কাফের সম্প্রদায় একযোগে বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ এর আগে আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে দলীলের ভিত্তিতে সুপ্রমাণিত সত্য গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তারা ঈমান আনে নি। যখনই আল্লাহ তাআলার শাস্তি চলে এলো, তখন তারা বলতে লাগলো যে, এখন আমরা ঈমান আনছি; আল্লাহ ও তার নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি। কিন্তু ওই সময় তাদের ঈমান আনয়ন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য

---

[১৪] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৬-৯৮

হয়নি। আল্লাহকে মানার অর্থ হলো, দলীল ও প্রমাণ দেখে আল্লাহর রসূলকে সত্যবাদী মনে করা এবং আল্লাহকে মেনে নেওয়া। শাস্তি দেখার পর আর ঈমান আনার কোনো অর্থ থাকে না।

মুসা আ.-এর সম্প্রদায় যখন অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিলো, তখন তিনি বদদোআ' করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিন; আযাব প্রত্যক্ষ করা ছাড়া তারা ঈমান আনবে না।

হযরত ইউনুস আ.-কে ইরাকের নিনওয়া নামক প্রাচীন শহরে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি সেখানকার মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনেনি। অবশেষে হযরত ইউনুস আ. পয়গম্বদের সুন্নত মুতাবিক হিজরত করেন। তিনি এ কথা বলে নিনওয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন যে, এখন তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও শাস্তি আসবে। হযরত ইউনুস আ. চলে যাওয়ার পর আযাবের প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিন্তু সে সময় তাদের প্রতিক্রিয়া হুদ আ. এর সম্প্রদায়ের মতো ছিলো না; যারা আযাবের মেঘমালা আসতে দেখে বলেছিলো, এটা তো আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আসছে।

হযরত ইউনুস আ. যখন নিজের কওমকে ছেড়ে চলে গেলেন, তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখন আর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তখন তাদের অন্তরে তাওবার ইচ্ছা জেগে উঠলো। তারা পুরনো কাপড় পরিধান করে নিজেদের অবয়বে দীন-হীন ভাব ফুপিয়ে তুললো এবং ওই এলাকার সব নারী-পুরুষ বাচ্চা ও পশুদের নিয়ে মাঠে একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করা শুরু করলো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা এভাবে কান্নাকাটি করলো। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিয়ত এবং তাওবার বিশুদ্ধতার কারণে তাদের ওপর পতিত হওয়া শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। শাস্তি প্রকাশ পাওয়ার আগের ঈমান যেমন গ্রহণযোগ্য, শাস্তি পতিত হওয়ার আগের ঈমানও গ্রহণযোগ্য হয়। শর্ত হলো, সেই ঈমান হযরত ইউনুস আ. এর উম্মতের ঈমানের মত পরিপূর্ণ ঈমান হতে হবে।

সবক : ১৫

আল্লাহর নাম শুনলে প্রকৃত মুমিনের অন্তর আলোড়িত হয়

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ○

অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেলো, যেনো তা পাথরের মতো কিংবা তার চেয়েও শক্ত। নিশ্চই কিছু পাথর থেকে নহর উৎসারিত হয়। কিছু পাথর ফেটে পানি বের হয়। কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।[১৫]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর আদেশ নিষেধ না মানার জন্য যারা অজুহাত খোঁজে, তারা ধীরে ধীরে অনুভূতিহীন হয়ে যেতে থাকে, এক সময় তাদের অন্তর পাথরের মতো শক্ত হতে যায়।

আল্লাহর নাম সবচে মর্যাদাপূর্ণ নাম। এই নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মুমিনের অন্তর আলোড়িত হয়। বিনা বাক্য ব্যায়ে তার যে কোনো নির্দেশ তারা মেনে নেয়। কিন্তু দুর্বল ঈমানের মানুষজন আল্লাহর নির্দেশ না মানার ছুতো খোঁজে। তার কথার ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। এই জঘন্য কাজের প্রভাবে তারা ক্রমেই আরও অনুভূতিশূন্য, যুক্তিবুদ্ধিশূণ্য নির্বোধ মানুষে পরিণত হয়ে যেতে থাকে। এক সময় তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তখন আল্লাহর জিকির, তার নাম, তার নিদর্শন তাদের অন্তরকে আর আলোড়িত করে না। পাথর থেকেও ঝরণা প্রবাহিত হয়। অনেক পাথর ফেটে গিয়ে তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে পানি বের হয়। অনেক পাথর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ওই লোকদের অন্তর হাজার নসীহত ও উপদেশেও নরম হয় না।

উদাহরণ হিসেবে এখানে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। এই জগতের সবকিছুই নীরবে সর্বশক্তিমান রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ কিছু মানুষের অন্তরকে পাথরের চেয়ে কঠিন

---

[১৫] সূরা বাকারা, আয়াত: ৭৪

বলেছেন, কারণ পাথর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত ও স্থানচ্যুত হয়, কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হয় না। উল্লিখিত আয়াতে পাথরের উপমায় আল্লাহ তাআলা তিন ধরণের মানুষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এক. আমরা দেখি পাহাড়ের ভেতর থেকে পানির স্রোত প্রবাহিত হয়। একাধিক পাহাড় থেকে প্রবাহিত পানির স্রোত মিলিত হয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। এটা সেই সব খোদাভীরু বান্দাদের দৃষ্টান্ত যাদের অন্তরে অধিক পরিমাণে আল্লাহর ভয় রয়েছে। আল্লাহর ভয়ে তাদের চোখ থেকে পাহাড়ের ঝর্ণার মতোই অধিক পরিমাণ অশ্রু প্রবাহিত হয়।

দুই. আমরা এমন অনেক পাথর দেখি যা বাহ্যত দেখতে শুষ্ক মনে হয়, কিন্তু ভাঙলে দেখা যায় তার ভেতরে অনেক পানি জমে আছে। এটা আল্লাহর ওই বান্দাদের দৃষ্টান্ত যাদেরকে বাহ্যত আল্লাহর স্মরণ থেকে অনেক দূরে মনে হয়, কিন্তু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা তার অন্তরকে কাঁপিয়ে দেয়, তখন সে আল্লাহর দিকে ছুটে আসে এবং অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরায়।

তিন. অনেক পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ে। এটা ওই বান্দাদের দৃষ্টান্ত যারা কারো বিরোধিতা করতে গিয়ে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে। কিন্তু যখন তার সামনে আল্লাহর হুকুম পেশ করা হয়, তখন সে অস্থির হয়ে যায়। একটু আগে তো সে কারো সামনে নিজের ভুল স্বীকার করার জন্যও প্রস্তুত ছিলো না; কিন্তু যখন দেখে আল্লাহ অন্যরকম বলেছেন, তখন আল্লাহর বিধানের সামনে সে মাথা নত করে।

নদী প্রবাহিত হওয়ার অর্থ খুব বেশি ক্রন্দন করা, ফেটে যাওয়া ও পানি বের হওয়ার অর্থ প্রথম প্রকারের তুলনায় কিছুটা কম ক্রন্দন করা এবং নীচে গড়িয়ে পড়ার অর্থ অন্তরে ভয় করা।

সবক : ১৬

আল্লাহই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ○ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ○

আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, তারা আল্লাহকে ভালবাসার মতো ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় সুদৃঢ়। আর যখন জালিমরা আযাব দেখবে, তখন তারা দেখতে পাবে, সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ আযাব দানে কঠোর।

যখন যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তারা আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।[১৬]

আর যারা অনুসরণ করেছে তারা বলবে, 'যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে'। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা : মানুষ এমন সৃষ্টিজীব যারা সব সময়ই আশ্রয় খোঁজে। সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। এমন এক সত্তার কাছে আশ্রয় নিতে যায় যিনি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবেন, তাদের অপরাধ মার্জনা করবেন এবং তিনিই হবেন তাদের ভরসাস্থল। কাউকে একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার জায়গা ভাবা মানে তাকে উপাস্য হিসেবে কবুল করা। মানুষ যখন এমন কোনো সত্তাকে নিজের মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, তখন সে তাকে ভালোবাসে এবং তার ওপর

---

[১৬] সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৫-১৬৭

থাকে তার গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তাকে সে সর্বশক্তিমান মনে করে এবং তার আশ্রয়েই নিজেকে নিরাপদ ভাবে।

দুনিয়াতে বাহ্যিক চোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখা যায় না বিধায় বস্তুবাদী মানুষরা দৃশ্যমান কোনো শক্তিকে উপাস্যের মর্যাদায় বসায়; যে মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিলো শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলাকে।

অনেক সময় মানুষ শক্তিশালী মানুষ অর্থাৎ সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে উপাস্য বানায়। অথচ আল্লাহ তাআলা চান মানুষ উপাস্যের আসনে শুধু তাকেই বসাক। এর কারণ হলো, কারো বাহ্যিক শান শওকত ও প্রভাব দেখে মানুষ তাকে 'বড়' ভাবতে শুরু করে। কেউ কেউ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর মাধ্যমেও মানুষকে প্রভাবিত করে। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও শক্তি জোরে কেউ কেউ হাজারো রূপকথা ও কিসসা-কাহিনীর নায়ক হয়ে যায়। কারো কাছে মানুষের ভীড় দেখে লোকজন ধারণা করে বসে যে, এই ব্যক্তি অন্য সাধারণ মানুষের মত মানুষ নয়, সে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাবান। কারো কাছে আবার উপরোল্লেখিত সবকিছুই থাকে; যা দেখে মানুষ ধারণা করে যে, সে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আল্লাহর এই পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সব কিছুর ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ত'আলার। মানুষ মানুষকে আল্লাহর স্তর ও মর্যাদায় বসানোর এই ধারাবাহিকতা ততো দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতো দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নিজের অস্বিত্ব মানুষের আড়ালে রাখবেন। আল্লাহর অস্বিত্ব প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারবে, উপাসনাকারী উপাস্য থেকে পালাতে চাইবে আর উপাস্য পালাতে চাইবে উপাসনাকারী থেকে। যার ইবাদত ও আনুগত্য নিয়ে মানুষ দুনিয়াতে গর্ব করতো এবং ভাবতো যে, সে সবচে বড় শক্তির আশ্রয়ে আছে, তা পরকালে অর্থহীন প্রমাণিত হবে। মানুষ তার দুনিয়ার জীবনকে পরিতাপের সাথে স্মরণ করতে থাকবে। কিন্তু তার কিছুই করার থাকবে না।

সবক : ১৭

জান্নাত কার জন্য?

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ○ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ○ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ○ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ○

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ধন সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে। তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

যারা বিপদে পড়লে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।[১৭]

ব্যাখ্যা : দীন হলো মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তাকে এভাবে আপন করে নেবে যে, তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সেই সত্তার অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। এমন জীবনযাপনই মানুষের সফল জীবন যাপন। এই সফলতা মানুষ বুঝতে পারবে আখেরাতে। এই পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা মানুষের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সৃষ্টি করেননি। এই দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। এখানে আল্লাহ তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, যে আল্লাহর আনুগত্য করবে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবে, তার সামনেই হাজারো বাধা বিপত্তি আসবে, হাজারো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী তাকে হতে হবে। যাতে আল্লাহ তাআলা জানতে পারেন– কে তার ঈমানের ব্যাপারে

---

[১৭] সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩-১৫৭

অনড় অবিচল, সত্যিকারের ঈমানদার আর কে সত্যিকারের ঈমানদার নয়। কে তার ঈমানের দাবী পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত আর কে প্রস্তুত নয়।

মানুষের অন্তরের খারাপ অংশ তাকে হাজারো প্ররোচনা দেয়। স্ত্রী ও সন্তানের চাহিদার কোনো শেষ থাকে না। দুনিয়ার মোহ, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং সমাজের ভোগী পরিবেশ সবকিছুই মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। এই ঘিরে ধরা ফিতনাগুলোকে চিনতে হয় এবং এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

এই ফিতনাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাও বটে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নামায ও ধৈর্য; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্মে অটল থাকা এবং সকল ধরনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করে হলেও হকের পথে জমে থাকা। যারা গুনাহের সুযোগ পেয়েও গুনাহের কাজ করে না, দীনের বিরুদ্ধে গেলে বিপুল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখার পরও নিজেকে আল্লাহর সঙ্গে বেঁধে রাখে, তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারবে। তাই কঠিন হলেও সব বাঁধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে লেগে থাকতে হবে। মনের চাহিদার সাথে মিললেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

হকের পথে বিপদ-আপদ আসার একটি কারণ হলো মু'মিনের তাবলীগ। দাওয়াত ও নসীহতের কাজে বিপদ আসেই। নসীহত অহংকারী জালিম ও কাফিরদের উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করে। দীনের পথে আহ্বানকারীর আহ্বানের সামনে এরা নিজেদেরকে অপমানিত মনে করতে থাকে। একজন দাঈ সাধারণত সমাজে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এ কারণে জালিম সমাজপতিদের ক্রোধ ও হিংসার শিকার হতে হয় দাঈকে। তার ওপর অত্যাচার নেমে আসে। তার উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি তার জীবনের ওপরও হামলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যক্তিই সঠিক রাস্তায় আছে যাকে বিপথগামী বলে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আসল সুখের সন্ধান সে-ই পেয়েছে যে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় জীবিত ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। পরকালের জান্নাত ওই ব্যক্তির জন্যই, যে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সবক : ১৮

হকের জন্য বাস্তুহারা ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য পায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাপন এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ খুবই স্পষ্ট ছিলো। কারো জন্য এটা বোঝা মোটেই কষ্টকর ছিলো না যে, তার যবানে আল্লাহর বাণী জারী হয়েছে। কিন্তু ইহুদি আলেমরা তাকে রসূল হিসেবে মেনে নেননি।

তাদের আশঙ্কা ছিলো যদি তারা নবীয়ে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নেন, তাহলে- তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে আর তাদের রমরমা ধর্মব্যবসাও ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। তাই তারা সত্যকে গোপন করার মধ্যেই নিজেদের সফলতা ভেবে নিয়েছিলো। অথচ তাদের সফলতা তো ছিলো হককে মেনে নেওয়ার মধ্যে। মূর্খতাবশত তারা হকের দিকে অগ্রসর হওয়াকেই নিজেদের ধ্বংসের কারণ ভেবেছিলো।

যারা হকের জন্য আশ্রয়হীন হয়, ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়, তারা আল্লাহর কাছে খুবই উঁচু মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের সাথে থাকে।

আল্লাহ তাআলার রহমতের দুয়ার তার সব বান্দার জন্যই উন্মুক্ত থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভুল করার পর যদি কেউ তার ভুল বোঝতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসে, তাহলে সেও আল্লাহর অবারিত রহমতের বারিধারায় সিক্ত হয়। মানুষ হকের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যারা মৃত্যু পর্যন্ত অবাধ্যতা ও অস্বীকারের উপরই অনড় থাকে এবং ওই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে তারা আল্লাহর রহমত থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে যায়।

সবক : ১৯

বিপদ এলে আল্লাহকেই স্মরণ করুন

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ○ وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ○ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ○ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

তোমাদেরকে নিশ্চই তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবনের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

স্মরণ করো, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না'। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে। তারা যা ক্রয় করে, তা কতইনা মন্দ!

যারা নিজেদের কৃতকর্ম নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আসমান ও যমীনে সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১৮]

ব্যাখ্যা : ঈমানদারকে এমন কঠিন পথে সফর করতে হয়, যেখানে আপনরাও তাকে কষ্ট দেয়, পররাও কষ্ট দেয়। শত্রুরা যেমন কষ্ট দেয়, আত্মীয়স্বজন থেকেও তারা বিভিন্নভাবে আঘাত পায়। শত্রুদের মতো আপনরাও তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু এগুলো দেখে একজন মুমিনের জন্য কখনই

---

[১৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৬-১৮৯

উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। বরং সে সচেতনতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। নিজের ঈমানের ওপর অটল থাকবে। কারো তিরস্কার, ভৎসনা, গালমন্দ ও অত্যাচারের মুখে পড়ে নিজের আমলে অবহেলা করবে না।

লোকজন তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জড়াতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে এই নীতির ওপরই দৃঢ় থাকতে হবে যে সে সবধরনের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে নেবে, প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করবে না।

বার বার তার অন্তর তাকে প্ররোচিত করবে। তাকে বোঝাবে যে, আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করো, কিন্তু আল্লাহর ভয় তাকে থামিয়ে দেবে। পরকালের কথা, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই সে থমকে যাবে।

দীনের বিভিন্ন প্রয়োজন সামনে আসবে, জান ও মালের কুরবানী চাওয়া হবে, তার ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। মুমিন হওয়ার মানেই হলো নিজেকে ধৈর্য এবং তাকওয়ার পরীক্ষায় দাঁড় করানো। যে এই পরীক্ষায় নিজেকে সত্যিকার ঈমানদার প্রমাণ করবে, তার জন্য পরকালে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে।

আল্লাহর কিতাবের কোনো অনুসারীর ওপর যখন বিপদাপদ আসে, তখন তারা যেনো আল্লাহ ও তার রসূলকে ভুলে না যায়, আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে নিজের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা না দেয়। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে বুঝতে হবে দীন শুধু তার জন্মসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্য মাত্র। দীনের সাথে তার আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই। সে দুনিয়াদারিকেই দীনের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। বেদীন হওয়ার পরও নিজেকে দীনদার বলে পরিচয় দিচ্ছে। সে নিজের না করা কাজের জন্যও কৃতিত্ব লাভ করতে চায়।

এই শ্রেণীর মানুষ দুনিয়ার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে; আবার এটাকেই পরকালের কাজ বলে আখ্যায়িত করে। তারা নিজের উদ্ভাবিত মনগড়া দীনের উপর চলছে কিন্তু নিজেদেরকে আল্লাহর ধর্মের ঝাণ্ডাবাহী দাবি করছে। তারা স্বৈরাচারী শাসনকার্য পরিচালনা করে আর এটাকেই আল্লাহর আইন বলে। তারা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দাঁড়ায় কিন্তু ঘোষণা করে, আমরা জাতীয় স্বার্থে দাঁড়িয়েছি।

এ কথা সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি বেদীনকে দীন বলতে থাকে, সে কখনোই আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহর আযাব থেকে কোনো কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

যারা শুধু দুনিয়ার পেছনেই ছোটে আর আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকে, এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। যদি তারা নিজের ইহলৌকিক কাজকর্ম আল্লাহ এবং তার রসূলের নামে চালাতে থাকে, তাহলে এটা পথভ্রষ্টতা এবং নির্লজ্জতা। কারণ এর মাধ্যমে তারা এমন কাজের বিনিময়ে প্রতিদান আশা করছে, যে কাজ সে করছে না।

সবক : ২০

যদি আসমানী কিতাবের বাহকরাই বিগড়ে যায় তখন কী হয়?

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○

সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। তুমি সর্বদাই অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে, সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।[১৯]

ব্যাখ্যা : হযরত মুসা আ. তার উম্মত বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তাদের বারোটি গোত্র থেকে বারোজন সরদারকে তাদের তত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিলো। বনী ইসরাঈল থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো তা হলো–

- তারা নামায আদায় করার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ বানাবে।
- যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে বান্দার হক আদায় করবে।
- নবী আ. কে সঙ্গ দিয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে।
- আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের সম্পদ খরচ করবে।

আল্লাহ এই কাজগুলো করানোর মাধ্যমে তাদেরকে পাক-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত বানাতে চেয়েছিলেন। এই অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে যে সব আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোই দীনের মৌলিক আমল। এটাই সেই রাজপথ যা সমস্ত মানুষকে আল্লাহ এবং তার জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু যখন আসমানি কিতাবের বাহক কোনো জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়, তখন তারা এই রাজপথ থেকে সরে যায়, এদিক সেদিক মোড় নিয়ে অন্য পথে চলতে শুরু করে, অনেক সময় তো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দীনের ধারণাই পাল্টে দেয়। ইবাদতের নামে দীনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজের প্রচলন ঘটায়। মুক্তির জন্য এমন পথ অন্বেষণ করতে শুরু করে যা বান্দাদের হক

---

[১৯] সূরা মায়েদা, আয়াত: ১৩

আদায় করা ছাড়াই মানুষকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। হকের দাওয়াতের নাম দিয়ে অনর্থক পার্থিব হাঙ্গামা করতে থাকে। তারা দুনিয়ার খরচের হিসাবের জন্য বড় খাতা তৈরি করে আর সেটাকেই দীনি খরচের নাম দিয়ে দেয়।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে, তারা নিজেদের দুনিয়া লাভের জন্য একটি নতুন ধর্ম গড়ে তোলে। আর এটাকেই আল্লাহর ধর্ম বলে প্রচার করে। যখন কোনো দল পথভ্রষ্ট হতে হতে এই পর্যন্ত পৌঁছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আযাবে পাঁকড়াও করেন। আল্লাহর রহমত, দয়া ও তওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তারা শুধু নিজের জৈবিক চাহিদাটাকেই মুখ্য মনে করতে থাকে আর এর মধ্যেই ডুবে থাকে। এই অবস্থায় একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের নিকট চলে আসে এবং তাদেরকে পাঁকড়াও করে আল্লাহর আদালতে পৌঁছে দেয়।

সবক : ২১

জান্নাত কারো বংশীয় সম্পত্তি নয়

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন। বলো, তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে আযাব দেন? না, তোমরা মানুষ তাদেরই মতো যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দেন; আসমান ও যমীনে এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানে যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

হে কিতাবীরা, রসূল প্রেরণে বিরতির পর তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। সে তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে, যেনো তোমরা না বলতে পারো যে, আমাদের কাছে সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি। এখন তো তোমাদের কাছে একজন

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[২০]

ব্যাখ্যা : যে উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলা আসমানী কিতাব ও রসূল প্রেরণ করেন এবং তারা রসূলের ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করেন; তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেন, পৃথিবীর কতৃত্ব দান করেন, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেন, তাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। মুসা আ. ও ঈসা আ.-এর উম্মতের প্রথম প্রজন্মের যারা ঈমান এনেছিলেন, তারা তাদের ঈমানের এমন প্রতিদানই পেয়েছেন। তারা নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিয়েছেন, তাই আল্লাহ তাআলাও তাদের উপর নিজের নেয়ামতরাযি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মে তাদের উম্মতের অবস্থা পাল্টে যায়। তাদের মধ্য থেকে দীনদারি চলে যেতে থাকে। তবুও তারা ভাবতে থাকে প্রথম প্রজন্মের মানুষ আমলের মাধ্যমে যে মর্যাদা লাভ করেছিলো, সেটা বংশানুক্রমে তারাও পেয়েছে। সেই মর্যাদা তাদের বংশীয় মর্যাদা। তারা ভাবে আমরা যা-ই করি না কেনো আমরা আল্লাহর প্রিয়জন। আমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত বর্ষিত হতেই থাকবে।

আসমানী কিতাবের ধারকবাহক উম্মতের এই ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার নীতি হলো দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল দিতে শুরু করা। যেনো তারা বুঝতে পারে তারা আল্লাহর নির্দেশিত সরল পথ থেকে সরে গিয়ে তার মকবুল বান্দাদের কাতার থেকে বের হয়ে গেছে। তিনি শাস্তি হিসেবে ওই উম্মতের প্রতিপক্ষকে তাদের ওপর প্রবল করে দেন। আসমানী কিতাবের অধিকারী কোনো দল যদি নিজেদের সংখ্যাধিক্য থাকার পরও পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়, তাহলে তারা যেনো এই আশা না করে যে, আখেরাতে তারাই ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হবে, সফলতা ও কামিয়াবি লাভ করবে।

কোনো উম্মত নিজেদেরকে বংশীয়ভাবে আল্লাহর প্রিয় মনে করলে সেটা স্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহর দরবারে প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা আলাদা হিসাব হবে। প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে শুধু একজন মানুষ হিসেবেই বিবেচিত হবে; চাই সে যে উম্মত বা সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেনো। দুনিয়ার পরীক্ষার পাঠশালায় যে যেমন আমল করবে, আখেরাতের ফায়সালা এর উপর ভিত্তি করেই করা হবে। জান্নাত কারো বংশীয় সম্পত্তি নয়। বাপদাদার কেনা জায়গা নয়। জাহান্নামও

---

[২০] সূরা মায়েদা, আয়াত: ১৮-১৯

কারো বংশীয় শান্তির জায়গা নয়।

আল্লাহর ফায়সালার পদ্ধতি হলো, তিনি নিজের পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তিদের প্রেরণ করেন, যারা মানুষকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করে। জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করে, জান্নাতের সুসংবাদ দান করে। আল্লাহর নেয়ামতের সুসংবাদবাহী ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারীর কথা মানলে মানুষ আল্লাহকে পেয়ে যায়। অন্য কোনো পদ্ধদিতে আল্লাহ পাওয়া যায় না।

সবক : ২২

দুনিয়া পূজা ও পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ○

আর এভাবেই আমি এককে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, 'এরাই কি তারা আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত নন![২১]

ব্যাখ্যা : ওই সব ব্যক্তিরাই উপদেশ-নসীহত গ্রহণ করে, যারা নিজেদের অবস্থা নিয়ে ভীতি ও আশংকার মধ্যে থাকে। নিজের কৃতকর্ম নিয়ে যে বিচলিত বা খটকার মধ্যে আছে, তাকেই তার কৃতকর্মের ভালো মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা যায়। এর বিপরীতে যারা ভয়-ভীতিহীন ও বেপরোয়া, তারা কখনো নসীহতে কান দিতে চায় না। নসীহত গ্রহণ করা তো দূরের কথা, নসীহত শুনতেও তারা আগ্রহী হয় না।

মানুষের মধ্যে এই বেপরোয়া ভাব সাধারণত দুই কারণে আসে; এক. দুনিয়া পূজা, দুই. পুর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ। দুনিয়া পূজারীরা দুনিয়া উপার্জনের মাঝে হারিয়ে যায়, দুনিয়ার খেল-তামাশার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে, দুনিয়াবী কোনো ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে এর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, এটাও তাদের স্মরণ থাকে না যে, একদিন তাদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে, প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। তারা আখেরাতকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করে না। আখেরাতের স্মরণ তাদের মনে কোনো স্থান পায় না। আখেরাত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিহদের আলোচনাকে তারা গুরুত্বহীন মনে করে উপেক্ষা করে চলে।

---

[২১] সূরা আনআম, আয়াত: ৫৩

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ওই সমস্ত লোক, যারা আখেরাতের বিষয়টাকে সুপারিশের বিষয় ভেবে নিয়েছে। তারা ধরে রেখেছে যে, যাদের সঙ্গে তারা নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে, পরকালে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। অর্থাৎ সুপারিশ করে তারা তাদেরকে পার করে দেবে।

এরা এই ভরসার উপরই বেঁচে আছে যে, তারা মহান ব্যক্তিদের আঁচল আঁকড়ে ধরে আছে আর তারা আল্লাহর প্রিয়, তাই তাদের কোনো ভয় নেই। এই ভুল ধারণাই তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে নির্ভয় বানিয়ে রাখে। তারা আখেরাতের ব্যাপারে গভীর কোনো চিন্তাভাবনা করতে চায় না, দুনিয়ার মিথ্যে মায়াজাল তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। তারা দুনিয়ায় যে ধন-দৌলত ও মর্যাদা লাভ করেছে, তা ব্যবহার করে কীভাবে ভোগ বিলাসে জীবন কাটাবে সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। কেননা তাদের জন্য হকের পথে চলে আসার অর্থ অনেক পরিশ্রমে নির্মিত বিলাসের প্রাসাদ ভেঙে ফেলা, অনেক কষ্টে অর্জিত দুনিয়াবী সম্মান ও মর্যাদার সিংহাসন ছেড়ে মাটিতে নেমে আসা। তারা দেখে হকের বেশিরভাগ অনুসারী সাধারণ গরীব দুখী মানুষ, তাদের কাছে মনে হতে থাকে হক মেনে নিলে তারা এই গরীব দুখী মানুষের কাতারে নেমে যাবে।

তাই হকের পথে যেতে তারা তাদের মান-সম্মান হারানোর ভয় করে। তারা হককে তাদের মতো করে পেতে চায়। দুনিয়ার মিথ্যে ভোগ বিলাস, মিথ্যে অহম টিকিয়ে রেখেই হকের পথে আসতে। কিন্তু হককে নিজের মতো বানাতে না পেরে অপছন্দ করতে শুরু করে।

সবক : ২৩

জ্ঞান মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির পেছনে চলতে বাধা দেয়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ○ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ○ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ○

হে মুমিনগণ তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহকে ভয় করো।

যখন তোমরা সালাতের দিকে ডাকো, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। কারণ বোধশক্তিহীন সম্প্রদায়। বলো, 'হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক।'

বলো, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেবো যা আল্লাহর কাছে আছে? যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং যার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বাঁদর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূতের উপাসনা করে, তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে বেশি বিচ্যুত'।[২২]

ব্যাখ্যা : যারা নিজেদের আবিষ্কৃত দীনের অনুসারী হয়ে নিজেকে আল্লাহর

---

[২২] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৭-৬০

অনুসারী মনে করে, তাদেরকে যখন আল্লাহর প্রকৃত দীনের দিকে ডাকা হয়, তারা তখন এর বিরুদ্ধে লেগে যায়। বিদ্বেষ ও শত্রুতায় তারা উন্মাদ হয়ে যায়। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এতোটাই লোপ পায় যে, যে জিনিস তাদের কাছেও মর্যাদাপূর্ণ তা নিয়েও তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে। মদিনার ইহুদিদের অবস্থা ছিলো এমনই। তারা মুসলমানদের আযান নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে ছাড়ে নি। যারা এতটাই নির্বোধ এবং অভদ্র, তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই একজন মুসলমানের বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। শুধু দাওয়াত দেয়ার সম্পর্ক ছাড়া এমন ব্যক্তিদের সাথে অন্য কোনো সম্পর্ক রাখা অনুচিত।

এই সমস্ত লোকজন খাটি মুসলমানদের অপরাধী মনে করে আর নিজেরা সব ধরনের অপকর্ম করা সত্ত্বেও তারা মনে করে, আমাদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ঠিকই আছে। তারা যদি দ্রুত তাদের এই অবস্থা সংশোধন না করে, তাহলে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কমতে কমতে এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, তারা আর হক-বাতিলের তারতম্য করতে পারে না। এটা আল্লাহর শাস্তি। তারা আকৃতিতে যদিও মানুষই থাকে, কিন্তু ভেতরগতভাবে তারা নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত হয়।

মানুষের অন্তরের যে অংশ আল্লাহর চৌকিদারের মত কাজ করে, যা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, অব্যাহতভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে সেটা মৃত্যুবরণ করে। মানুষের লজ্জা, ভদ্রতা, পবিত্রতাপ্রিয়তা ইত্যাদি সব ভালো গুণই তখন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এই অধঃপতনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে মানুষ শয়তানের মতো অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারা বিকৃত মানসিকতা নিয়ে জন্তু জানোয়ারের মতো খেয়ে পরে বেঁচে থাকে।

আকল মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির পেছনে চলতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু যখন মানুষের ওপর তার অহম ও বিদ্বেষ প্রভাব বিস্তার করে, তখন তার আকল তার কুপ্রবৃত্তির নিচে চাপা পড়ে যায়। বাহ্যত সে মানুষই থাকে, কিন্তু বাস্তবে সে হয়ে যায় একটা নিকৃষ্ট জন্তু। আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিরা তাদের প্রকৃত রূপ দেখতে পান। বুঝতে পারেন, তার মানুষরূপী চেহারার পেছনে কোন প্রাণী লুকিয়ে আছে।

সবক : ২৪

প্রবৃত্তির চাহিদাই সবচে বড় পৌত্তলিকতা

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَه هَوٰىهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ○ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?

তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো বেশি পথভ্রষ্ট।[২৩]

ব্যাখ্যা : হযরত আবী উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমানের ছায়ার নিচে আল্লাহ ছাড়া আর যাদের উপাসনা করা হয় তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হলো মানুষের ওই প্রবৃত্তি; যার অনুসরণ করা হয়।[২৪]

একটা বাস্তব সত্য কথা হলো, প্রবৃত্তির চাহিদাই হলো পৌত্তলিকতার মূল বিষয়। অন্য সকল দেবতা প্রবৃত্তি পূজাকে বৈধ প্রমাণ করার প্রয়োজনেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।

প্রবৃত্তিকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করার পর মানুষ জন্তু জানোয়ারের স্তরে চলে যায়। জন্তু জানোয়ার যেমন ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করে না, প্রবৃত্তি যা চায় তাই করে, প্রবৃত্তির পূজারী মানুষও জ্ঞান ও বুদ্ধি খরচ করা বা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলতে থাকে। প্রবৃত্তির বশীভূত মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

---

[২৩] সূরা ফুরকান, আয়াত: ৪৩-৪৪

[২৪] তাবরানী

সবক : ২৫

একজন দাঈ অবশ্যই দীনদার হবেন

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

ব্যাখ্যা : কুরআন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে; তার প্রতিপালকের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিতে চায়, মানুষের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখতে চায় এবং মানুষের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চায় যে, মানুষের সব প্রয়োজন ও চাহিদা এক আল্লাহই পূরণ করতে পারেন। এটাই কুরআনের দাওয়াত। নিঃসন্দেহে এই আহ্বানের চেয়ে উত্তম কোনো আহ্বান নেই। কুরআনের দাওয়াত যারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে অর্থাৎ দীনের দাঈ যারা হবে তারা যেনো অন্যকে দাওয়াত দেওয়ার আগে নিজে পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনে এবং মানুষকে আমল করতে বলার আগে নিজে আমলে অভ্যস্ত হয়।

দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো উত্তম ব্যবহার। মানুষ দুর্ব্যবহার করলেও সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মানুষ তার ওপর ক্রুদ্ধ হলে, তাকে কষ্ট দিলে সে ধৈর্য ধারণ করবে। যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, আল্লাহ তাআলা সবার কাছে তাকে প্রিয় বানিয়ে দেন। আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যেনো মানুষের কাছে প্রিয় হওয়ার এই পন্থার ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত থাকে এবং এটাকে সে পরিপূর্ণভাবে কাজেও লাগায়। আল্লাহর পথে একজন মানুষকে নিয়ে আসার জন্য নিজের অহমিকা দলিত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কিছু হতে পারে না।

যখনই দাঈর মনে এরকম ভাবনা আসবে যে, অমুকের কথার উত্তর দেয়া প্রয়োজন অথবা অমুক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, না হলে শত্রু আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে বুঝে নিতে হবে, এটা একটা শয়তানি ধোঁকা। মুমিন এবং দাঈর জন্য আবশ্যক হলো, সে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, এসব ভাবনা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে।

---

[২৫] সূরা হা মীম সিজদা, আয়াত: ৩৩

সবক : ২৬

দাঈকে ধৈর্যশীল হতে হয়

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ○

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলো সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা পৃথিবীতে দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, পাপাচারী দলকেই ধ্বংস করা হবে।[২৬]

ব্যাখ্যা : হকের পথে আহ্বানকারীকে যমীনের মত ধৈর্যশীল হতে হয়। যাকে হকের পথে আহ্বান করা হয়, তার পক্ষ থেকে দাঈকে যতো ধরনের দুঃখ-কষ্ট দেয়া হোক না কেনো, যতো কটু কথাই শোনানো হোক না কেনো দাঈ যেনো সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে। দাঈর মধ্যে সবসময় ছাড় দেয়ার মনমানসিকতা থাকা উচিত। মানুষের একগুঁয়েমি এবং অস্বীকার করতে দেখে একজন দাঈ কখনোই হতাশ হবে না; লাগাতার তাদেরকে দাওয়াত দিতেই থাকবে। দাঈ মনে প্রাণে মানুষের কল্যাণকামী হবে। মানুষ যতোই অসন্তুষ্ট হোক না কেনো, দাঈ সর্বদা তাদের কল্যাণের জন্যই তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে যাবে। একতরফা ধৈর্য এ জন্যও আবশ্যক যে, ধৈর্য ধারণ ছাড়া দাওয়াতের হক পূর্ণ হয় না, প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের ওপর আল্লাহর দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আল্লাহ তাআলার নবী-রসূলগণ যুগে যুগে ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সঙ্গে হকের দাওয়াতের কাজ করেছেন। নবীদের প্রতিনিধি হিসেবে যারা হকের দাওয়াতের কাজ করে, তাদের উচিত নবী-রসূলদেরকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে তাদের মতোই ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের কাজ করা। হকের দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীরা উত্তম আদর্শ। আল্লাহর কাছে দাঈ হিসেবে তারাই গণ্য হবে, যারা নবীদের মতো ধৈর্য ধারণ করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

---

[২৬] সূরা আহকাফ, আয়াত: ৩৫

সবক : ২৭

কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ○

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না।[২৭]

ব্যাখ্যা : মানুষের অভ্যাস হলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তার ব্যাপারে মনে অতিভক্তি পোষণ করতে থাকে। তার মর্যাদা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলে এবং যথাযথ মাত্রার অনেক বেশি ওপরে চলে যায়। এর নামই হলো 'গুলু' বা সীমালঙ্ঘন। শিরক এবং ব্যক্তিপূজার সবগুলো প্রকারই সীমালঙ্ঘন থেকে সৃষ্ট।

দীনের ক্ষেত্রে 'গুলু' বা সীমালঙ্ঘন হলো, দীনের মধ্যে যে কাজের যে স্তর রয়েছে সেটাকে তার আসল স্তরে না রেখে অনেক ওপরের স্তরে নেওয়ার চেষ্টা করা। যেমন,

- আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তাকে আল্লাহর পুত্র বলা।
- আল্লাহ তাআলা মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন এমন কারো ব্যাপারে ধারণা করা যে, সে মানবীয় দোষ ত্রুটির ঊর্ধ্বে।
- শরিয়তের কোনো বিধান পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলা। যেমন ইসলামে দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে করতে অনেকে বৈরাগ্যের স্তরে চলে যায়। যদিও ইসলাম বৈরাগ্যকে অনুমোদন করে না।

এভাবে যে কোনো দীনি বিধানকে তার প্রকৃত গুরুত্বের স্তর থেকে ওপরে তুললে তা দীনের ক্ষেত্রে গুলু বা সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলাই সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি ব্যতিত যা কিছু রয়েছে সবই তার প্রভাবাধীন ও অক্ষম। মানুষ আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে করতে এক সময় উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহ তাআলা 'কাদিরে মুতলাক' অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষমতাবান আর তার বিপরীতে মানুষ 'আজিযে মুতলাক' অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায় ও নিঃস্ব। নবী এবং ফেরেশতাগণ যেহেতু আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন, এই সত্যটা তারাই সবচেয়ে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তাই আল্লাহর কুদরত এবং নিজেদের

---

[২৭] সূরা নিসা, আয়াত: ১৭১

অক্ষমতার স্বীকারোক্তিও তারা সবার আগে দিয়েছেন।

এই স্বীকারোক্তিই হলো মানুষের আসল পরীক্ষা। যে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, তার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর যে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে না, তার সঙ্গে কখনোই আল্লাহর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। সে আল্লাহর সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হয়। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, তারা সফলতার সঙ্গে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা অন্ধ; বিপথগামী হওয়া ছাড়া তাদের কোনো গতি নেই। তারা আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত হয়ে অপদস্ততার গর্তে পতিত হয়।

সবক : ২৮

এ পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে বিপদাপন্ন

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَه تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَة لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِه لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ○ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ○ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ○ وَكَذَّبَ بِه قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ○ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ○

বলো, কে তোমাদেরকে নাজাত দেন স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে যখন তোমরা তাকে অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে ডেকে বলো, যদি তিনি আমাদেরকে এ থেকে নাজাত দেন, আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

বলো, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে নাজাত দেন এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে। তারপর তোমরা শির্ক করো।

বলো, তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে অথবা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম। দেখো, কীভাবে আমি আয়াতসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে।

আর তোমার কওম তাকে মিথ্যা বলেছে, অথচ তা সত্য। বলো

আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই।

প্রত্যেক সংবাদের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা অবহিত হবে।[২৮]

ব্যাখ্যা : মানুষ এ পৃথিবীতে যতো বিপদে পড়ে, অন্য কোনো প্রাণী এতো বিপদে পড়ে না। মানুষকে আল্লাহ বিপদে ফেলেন যেনো এমন সে সৃষ্টির মূল রহস্য উপলব্ধি করে। যেনো সে চিন্তা ভাবনা করে। কাল্পনার রাজত্বে বসে না থাকে। বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মানুষ যতো বেশি চিন্তা ভাবনা করে, ততোই সে আল্লাহর মারিফাতের নিকটবর্তী হতে থাকে। যখন মানুষ কোনো কঠিন বিপদে পড়ে, তখন সে নির্জনে কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। বলতে থাকে, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তাহলে আমি আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। তখন তার অন্তর থেকে সব অবাস্তব ধারণা ও শক্তির প্রতাপ দূর হয়ে যায়। চোখ থেকে মিথ্যে অহমিকার পর্দা সরে যায়। সে বুঝতে পারে মানুষ আসলেই অক্ষম। পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে অসহায় আর কেউ নেই। সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কিন্তু যখন তার মসিবত কেটে যায়, বিপদাপদ দূর হয়ে যায়, তখন সে আবার তার অভ্যাস অনুযায়ী গাফলতের শিকার হয়ে আগের মতো হয়ে যায়। আগের মতো আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।

শিরক অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর নির্ভর করা। আর তাওহীদ বা একত্ববাদ হলো, সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হওয়া। দেবতা ও অন্য বাহ্যিক উপাস্যদের উপাসনা যেমন শিরক, আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ হওয়াও শিরক। নিজেকেই নিজের উপাস্য বা দেবতার আসনে বসিয়ে দেয়াও শিরক। নিজেকে দেবতার আসনে বসানোর মানে হলো নিজের শক্তির ও ক্ষমতার ওপর চূড়ান্তভাবে আস্থাবান ও নির্ভরশীল হওয়া।

মানুষ যখন দম্ভ ও অহংকার করে, তখন সে আসলে নিজের শক্তিমত্তা অর্থাৎ নিজের আত্মা ও শরীরের শক্তির ব্যাপারে আত্মতুষ্টি ও মুগ্ধতায় ভোগে।

মানুষ যখন নিজের উপার্জনকে নিজের শক্তি ও ক্ষমতাবলে কৃত উপার্জন মনে করতে থাকে, তখন সে অহংকারী হয়ে ওঠে।

মানুষ তখনই সত্যকে উপেক্ষা করে চলে, যখন সে ভাবে আমি যা-ই করি না কেনো, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

মানুষ তখনই কারো উপর জুলুম করে যখন সে ধারণা করতে থাকে, আমি তার উপর ক্ষমতাবান, আমি নিজের শক্তি ও ক্ষমতায় তার ওপর আমার কতৃত্ব

---

[২৮] সূরা আনআম ৬৩-৬৭

প্রতিষ্ঠা করতে পারি, আমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

পৃথিবীতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জুলুম ও অনাচারের উৎপত্তি হয় দম্ভ থেকে, দম্ভ সবচেয়ে বড় শিরক। কারণ দম্ভের অর্থ হলো বান্দা নিজেকে সর্বশক্তিমান ও ইলাহের স্তরের মনে করা। মানুষ যদি নিজের প্রকৃত শক্তি, ক্ষমতা ও বাস্তব দুর্বল অবস্থার কথা চিন্তা করতো, তাহলে সে কখনোই অহংকার করতো না। সে এমন বাতাসের রাজ্যে বসবাস করে যে বাতাস যে কোনো মুহূর্তেই তুফানের রূপ ধারণ করে তার জীবনকে তছনছ করে দিতে পারে। সে এমন যমীনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা যে কোনো মুহূর্তে নড়ে উঠতে পারে, এবং তাকে তার সবকিছুসহ ধ্বংস করে দিতে পারে। সে এমন এক সমাজে বসবাস করে যাতে সর্বদাই শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিরাজমান থাকে, যে কোনো ব্যাপার থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে তা তার জীবন ও সম্পদহানির কারণ হতে পারে।

সবক : ২৯

দম্ভ পথভ্রষ্টতার মূল কারণ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ○

আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।

আর যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করতো, তবে অবশ্যই তারা আহার লাভ করতো তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে। তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী এবং তাদের অধিকাংশ যা করছে, তা কতইনা মন্দ![২৯]

ব্যাখ্যা : সমস্ত পথভ্রষ্টতার মূল কারণ মানুষের অহংকার ও দম্ভ। মানুষ যদি আল্লাহকে ভয় করতো, তাহলে তারা বুঝতে পারতো আল্লাহ মানুষের কাছে কী চান, কোনটা আল্লাহর কথা আর কোনটা আল্লাহর কথা নয়। আল্লাহ-ভীতি

---

[২৯] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬৫-৬৬

মানুষের অন্তর থেকে সব কুচিন্তা ও পাপাচারের লিপ্সা দূর করে দেয়। মানুষ যখন এভাবে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে নিজে আল্লাহর নিকট সঁপে দেবে তখন সে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে। আল্লাহ তাকে মানবীয় দুর্বলতা জনিত গুনাহ থেকে রক্ষা করবেন। মৃত্যুর পর সে জান্নাতের উদ্যানে স্থান পাবে। মানবীয় দুর্বলতা মানুষকে জান্নাতের পথে অগ্রসর হতে দেয় না। আল্লাহর তাওফীকে যে ব্যক্তি নিজের মানবীয় দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবে, সে-ই জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।

যখন হকের শ্লোগান উঠতে থাকে, হকের দাওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছতে থাকে তখন ওই সমস্ত লোক ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে যায়, যারা আগের রীতিতে সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। সমাজপতির আসন দখল করে রেখেছিলো। তারা সংকিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, মানুষ যদি হককে কবুল করে নেয়, তাহলে তার নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দেয়ার প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সমাজে তাদের আগের মর্যাদা ও সম্মান থাকবে না।

কিন্তু তারা এরকম ভাবে তাদের সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে। তারা বুঝতে পারে না দীন শুধু তাদের মানসিকতাই পরীক্ষা করতে চায়। ভবিষ্যতে তারা আল্লাহর নেয়ামত লাভ করবে কি না এটা তাদের নিজেদের কৌশলের ওপর নির্ভর করে না, বরং হকের দাওয়াত তারা কিভাবে কবুল করছে তার ওপর নির্ভর করে। হকের দাওয়াতের সঙ্গে তারা নিজেদেরকে কতটুকু জড়াতে পারছে, হকের পথে থেকে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাই তাদের মর্যাদাবান বা সম্মানিত হওয়ার মানদণ্ড। হকের দাওয়াতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা নিজেদের যেই নেতৃত্বকে রক্ষা করতে চায়, অথচ নেতৃত্বের লোভ উপেক্ষা করতে পারলে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও সম্মানিত হতে পারে। তারা বুঝতে পারে না যে, হকের দাওয়াত অস্বীকার করাই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনার কারণ হবে।

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের বাহক উম্মতগুলো আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বিধানাবলীতে ইফরাত-তাফরীত অর্থাৎ বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করে নিজেদের মনগড়া একটি ধর্ম তৈরি করেছিলো। কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়িই তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রকৃত ধর্ম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যখন আল্লাহ তাআলার সত্য ও সঠিক ধর্ম তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তখন সেটা তাদের কাছে অপরিচিত মনে হয়েছে, তারা ভীত হয়ে গেছে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অবস্থা প্রায় একই ছিলো। তাদের একটা বিরাট অংশ ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে নি। রসূল সা.-এর যুগে কিতাবীদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেনি।

হাতেগোনা কয়েকজন যেমন, হাবশার বাদশাহ নাজাশী, আবদুল্লাহ ইবনে সালামসহ কিছু ইহুদি খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যারা পূর্ববর্তী ধর্মে থেকেও ভারসাম্যের ওপর ছিলেন, দীনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থী ছিলেন। ইসলামের সত্যতা তাদের কাছে স্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগেনি। তারাও ইসলাম কবুল করতে দেরি করেননি। তারা ইসলামকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছিলেন যেনো তারা পূর্ব থেকেই এ দীনের ওপরই ছিলেন। যেনো তারা অনেক আগ থেকেই এ পথের অনুসারী।

সবক : ৩০

ইহুদিরা আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

বলো, 'হে কিতাবীরা, তোমরা কোনো ভিত্তির উপর নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল এবং তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা প্রতিষ্ঠা করো'। আর তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অধিকাংশের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফির কওমের ওপর হতাশ হয়ো না।

নিশ্চই যারা ঈমান এনেছে, ইহুদি হয়েছে এবং সাবিঈ ও নাসারাদের মধ্য থেকে যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে এবং নেককাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[৩০]

ব্যাখ্যা : ইহুদিরা আল্লাহর দীনের উপর ছিলো না। তারা আসলে কোনো ধর্মের অনুসারী ছিলো না। তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মতোই কিছু রীতি-নীতি পালন করতো এবং বিশ্বাস করতো এগুলোই তাদের পরকালে মুক্তির জন্য যথেষ্ট। অথচ তাদের কাছে সেই রীতি নীতিগুলোর পক্ষে কোনো দলিল ছিলো

---

[৩০] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬৮-৬৯

না। তারা নিজেরাও ভালো করেই জানতো যে, তওরাতে এসব রীতি-নীতি সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। ক্রমাগতভাবে সত্যের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা তাদেরকে দুঃসাহসী করে তুলেছিলো। আল্লাহ তাআলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলতো, 'আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েকদিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করবো'।

তারা নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যে বিশ্বাস এবং পূর্বসূরীদের বানোয়াট কল্পকাহিনী ধারণ করে বেঁচে ছিলো। আল্লাহর নিকট এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই; আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের আমল।

যারা মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর বেঁচে থাকে, তাদের কাছে দাওয়াত আসে যে, আল্লাহর নিকট শুধু আমলেরই মূল্য রয়েছে, মিথ্যা আশা-আকাঙ্খা এবং আশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, তখন তারা এর বিরুদ্ধে লেগে যায়। কারণ তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত মিথ্যে আশা ও ভোগ বিলাসের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে তা তারা মেনে নিতে পারে না।

পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের অনুসারীরা তাদের ওফাতের পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। নবীদের আদর্শ ও আমল তাদের মধ্যে বাকি নেই। তারা নিজেদের বানানো কিছু ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করে। তারা ধারণা করে, আমরা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহর কাছে আমরাই সবচেয়ে সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে জাতিগত সম্মানের কোনো মূল্য নেই। তার দরবারে প্রত্যেক বান্দাকে আলাদা আলাদাভাবে পেশ করা হবে আর তার নিজের আমলই তাকে সম্মানিত করবে বা লাঞ্ছিত করবে।

আল্লাহর কিতাবের আইন বাস্তবায়ন করার অর্থ হলো- আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎ জীবনযাপন করা। এটাই আসল দীন। প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত সৎ হয়ে জীবন যাপন করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আসমানী কিতাবের ধারকবাহকরা যদি আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকে, তাহলেই তারা সম্মানিত হতে পারে। আল্লাহর দীন থেকে সরে গেলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা মূল্যহীন হয়ে যায়।

সবক : ৩১

হক পৃথিবীতে আল্লাহর মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا○ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا○

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সদকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তার করলে আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেবো।

কারো কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর সে যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, তা কতো মন্দ আবাস![৩১]

ব্যাখ্যা : হকের দাওয়াত পৃথিবীতে আল্লাহর মানদণ্ড কায়েম করে দেয়। তার দাঁড়িপাল্লায় সকলেই নিজেকে মাপতে বাধ্য হয়, ফলে কাফেরদের ভণ্ডামির মুখোশ ছিড়ে যায় এবং প্রকৃত চেহারা প্রকাশিত হয়। এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তারা তখন একযোগে দাঈর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। দাঈর তখন মনে হতে থাকে, যেনো সে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দণ্ডায়মান।

হকের মানদণ্ডে যে নিজেকে মর্যাদাহীন মনে করে, তার ভেতরে দম্ভ ও অহংকার জেগে ওঠে। তারা তখন হকের বিরোধিতা করতে থাকে। অন্যকে হকের পথে চলতে বাধা দিতে থাকে। তারা দাঈ এবং তার দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ছড়ায়। তাকে অবদমিত করার জন্য বিভিন্ন প্লান তৈরি করে। তারা লোকজনকে নিষেধ করে তারা যেনো হকপন্থীদের আর্থিক সাহায্য না করে। আল্লাহর যে সকল বান্দারা আল্লাহর রজ্জুকে চতুর্দিক থেকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে কুধারণা রটিয়ে দিয়ে তারা তাদের ঐক্যকে নসাৎ করার ষড়যন্ত্র করে।

এর বিপরীতে হকপন্থীরা আল্লাহর সামনে নত হয় এবং নিজেদের জীবনকে

---

[৩১] সূরা নিসা, আয়াত: ১১৪-১১৫

তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করে। তারা সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং মানুষকে বলে এটা আল্লাহর দীন। এর পক্ষে নিজের সম্পদ ও সময় ব্যয় করো। তারা মানুষকে উৎসাহ দেয় তারা যেনো নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে নেক এবং ভালো কাজে লাগায়। তারা পরস্পরের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে। অভিযোগ অনুযোগকে দূরে ঠেলে দেয়।

হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করা এবং যারা হকের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে নিজের শত্রুতার আগুনে জ্বালানোর চেষ্টা করা আল্লাহর নিকট মারাত্মক ও অমার্জনীয় অপরাধ। অধিকাংশ গুনাহের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থাকে যে, তা মানুষের গাফলতী অথবা দুর্বলতার কারণে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু হকের দাওয়াতের বিরোধিতা মানুষ নিজের অহংকার ও দম্ভের কারণেই করে থাকে। আর জেনে রাখা উচিত যে, অহংকার এমন পাপ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। তবে হ্যাঁ, যদি সে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। দীনের দাওয়াত যখন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়, তখন আল্লাহর বিশেষ সাহায্য আসে। এই দাওয়াতের বিরোধিতা করা আল্লাহরই বিরোধিতা করার নামান্তর। আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে কেউ সফল হয় না।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন। যে ব্যক্তি শরীয়তের বিপরীত পথে চলে, শরীয়ত হয় একদিকে তার পথ হয় অন্যদিকে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে চলার নির্দেশ দিয়েছে আর সে চলে অন্যদিকে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়েছে, সে দলীল প্রমাণও দেখেছে, তথাপি সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদের সরল ও সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ওই ভ্রান্ত পথেই রেখে দেবেন। ভ্রান্ত পথকেই তার কাছে ভালো বলে মনে হবে। একসময় সে জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছবে।

সবক : ৩২

যে বান্দার ওপর আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا○ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا○ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا○

তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হবে না, কেউ মন্দকাজ করলে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে কেউ নেককাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করলো এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করলো? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

যা আসমানসমূহে আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই; আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী।[৩২]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী লোকেরা যখন দুনিয়া পূজায় ডুবে যায়, দুনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা আল্লাহ এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে এমন করে তা নয়, বরং তারা পরকালের হিসাব-নিকাশকে আকীদা-বিশ্বাসের জায়গায় ফেলে রাখে এবং কার্যক্ষেত্রে তাদের সকল মেহনত, মোজাহাদা ও শ্রম দুনিয়া উপার্জনে নিয়োজিত থাকে। দুনিয়ার সম্মান, পদ ও সম্পদ উপার্জনের কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করে না। এগুলো অর্জন করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতেও তারা দ্বিধা করে না। কিন্তু আখেরাতে

---

[৩২] সূরা নিসা, আয়াত: ১২৩-১২৬

সফলতা লাভের জন্য নিজেদের আকিদা ও সুধারণাকেই তারা যথেষ্ট মনে করতে থাকে। তারা ভাবে কোনো বুযুর্গের সুপারিশ, কোনো বড় দলের সম্পৃক্ততা অথবা কিছু পবিত্র বাণীর উচ্চারণই তাদেরকে জাহান্নামের পীড়াদায়ক আগুন থেকে রক্ষা করবে এবং জান্নাতের সবুজ-শ্যামল উদ্যানে প্রবেশ করাবে। এ কথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা দরকার যে, এ ধরনের সুধারণা পরকালে কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহর কাছে সমস্ত কিছুর ফায়সালা হবে হাকীকত অনুযায়ী; মানুষের অলীক, মিথ্যা ও বানোয়াট ধারণার ওপর ভিত্তি করে নয়। আল্লাহর আদালতে মানুষের আমল দেখা হবে। যার আমল যেমন হবে তার ফায়সালাও ঠিক তেমনই হবে। আল্লাহর আইন একমাত্র ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তার কেমন বান্দাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর একটি দৃষ্টান্ত ইবরাহিম আ.; যিনি দুনিয়াতে আল্লাহর মুমিন বান্দা হিসেবে ছিলেন, যিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রবের ইচ্ছার অনুগামী বানিয়েছিলেন এবং যিনি জুলুম এবং অহংকার থেকে দূরে থেকে ইনসাফ এবং বিনয়ের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছিলেন।

মানুষের চেহারা তার পূর্ণ অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। চেহারা আল্লাহর দিকে ফেরানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজের পূর্ণ অস্তিত্বকে আল্লাহর দিকে ফেরানো।

আল্লাহ তাআলা সমগ্র জগতের মালিক। সকল ক্ষমতা তার। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার মালিকানাধীন এবং তারই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সবই তার সৃষ্ট। তিনি যখন যা করার ইচ্ছে করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতেই করে থাকেন। কারো সঙ্গে পরামর্শ করার তার কোনো প্রয়োজন হয় না। এমন কেউ নেই যে, তাকে তার ইচ্ছা হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেউ তার আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারে না। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি। কোনো লুকায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তার নিকট গোপন নয়। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা নিজেকে গোপন করে রেখেছেন। দুনিয়াতে যতো অকল্যাণ সৃষ্টি হচ্ছে, এর অন্যতম কারণ হলো, মানুষ আল্লাহকে দেখে না। ফলে তারা ভেবে নেয় আমরা স্বাধীন, যা ইচ্ছা করবো। মানুষ যদি এটা বুঝতে পারতো যে, মানুষের সাধ্যে কোনো কিছুই নেই, মানুষ কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে মানুষের ওপর কিয়ামতের দিন যা কিছু ঘটবে আজই তা ঘটে যেতো। পরকালে যা সে উপলব্ধি করতে পারতো, আজই তা উপলব্ধি করতে পারতো।

সবক : ৩৩

মুনাফিক প্রকাশ্য দীনদার ও গোপন বেদীন

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا○ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا○

আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথা শুরু করে, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

যারা তোমাদের অকল্যাণের অপেক্ষায় থাকে, অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় এলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করে রাখিনি এবং মুমিনদের কবল থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি'? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের বিচার করবেন। আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদের জন্য পথ রাখবেন না।[৩৩]

ব্যাখ্যা : যখন কোনো সমাজে দাওয়াতি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, তখন তার ভীত এতটাই মযবুত হয় যে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই যারা দীনকে মানতে চায় না, তারা যুক্তিহীন ঠাট্টা-মশকরায় মেতে ওঠে। দীনকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে থাকে। কৌশলে মানুষের কাছে দীনকে গুরুত্বহীন করে তুলতে চায়। মানুষকে বোঝাতে চায় যে, তারা দীনি বিষয়গুলোকে কোনো

---

[৩৩] সূরা নিসা, আয়াত: ১৪০-১৪১

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে না। আর যখন কোনো মানুষের কাছে কোনো বিষয় গুরুত্বহীন মনে হবে, তখন তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনা করা সম্পূর্ণই বেকার। এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। তাই নীরব থেকে আলোচনার বিষয় পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়। যে মজলিসে আল্লাহর দাওয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়, ওই মজলিসে কেউ বসে থাকলে বোঝা যায় যে, হকের প্রতি তার আবেগ ও ভালোবাসায় ঘাটতি আছে।

মুনাফিক শরীয়তের পছন্দনীয় মূলনীতির পরোয়া করে না। শরীয়তের মেজাজ বুঝতে চায় না। যেদিকে সে তার লাভ দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। সে নিজেকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, যার থেকে তার দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার হয়। চাই সেটা ঈমানদারদের থেকে হোক বা বেঈমানদারদের থেকে হোক। সে যে মজলিসে যায়, সেখানে তাদের মন যুগিয়ে কথাবার্তা বলে। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কখনো তাকে সত্যিকারের ঈমানদারদের পক্ষ নিতে হয়; কিন্তু তখনও সে মনে মনে তাদের অকল্যাণ কামনা করে, তাদের হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। কেননা কোনো সমাজে সত্যিকারের ঈমানদাররা থাকলে তারা হকের পরিমাপক হয়ে যান। এজন্য যারা মিথ্যা দীনদারির দাবি করে, তারা কামনা করে যেনো এই পরিমাপক যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায় যা তাদের দীনদারির মুখোশ খুলে ফেলে। কিন্তু ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করতে পারবে, শুধু এই দুনিয়াতেই, পরকালে তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।

মুনাফিক ওই ব্যক্তি যে বাহ্যত দীনদার; অর্থাৎ ওপরে ওপরে মুসলমানদের সাথে কথা বলার সময় ইসলামের পক্ষে কথা বলে, কিন্তু মূলত সে বেদীন। আয়াতে এমন মুনাফিকদের অন্তরের অবস্থার বর্ণনাই দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তারা সবসময় মুসলমানদের ধ্বংস কামনা করতো। কোনো জিহাদে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে জাহির করতো এবং তাদের কাছে গিয়ে বলতো, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?'

পক্ষান্তরে যদি কোনো কোনো সময় মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করতেন, তখন তারা কাফিরদের কাছে গিয়ে বলতো, 'আমরা তো গোপনে গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি এবং সদা-সর্বদা মুসলমানদের অধঃপতন কামনা করেছি, ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিলো আমাদের একটা কৌশল মাত্র। যার বলে আজ বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করেছে।'

এটাই হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস যে, তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে রাখে। তারা যদিও তাদের এ কৌশলকে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক মনে করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থই হয়।

কাঁচা রং স্থায়ী হয় না। গাজরের বাঁশী বেশি দিন বাজে না। কাগজের নৌকা বেশিদিন চলে না। আকাশে চিরদিন মেঘ জমে থাকে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। একদিন তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে আফসোস করবে। লজ্জাজনক কাজের কথা ভেবে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। তারা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভাঙ্গবে। তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ পাবে। সেদিন সব রহস্যই উদঘাটিত হবে। তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা আল্লাহ তাআলার ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে।

মোটকথা তাদের পরিণতি হবে কাফেরের পরিণতির মত। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকাশ্য দীনদার আর প্রকাশ্য বদদীনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ বাইরে থেকে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা গেলেও ভেতরে তারা একই। আল্লাহর কাছে মানুষের ফয়সালা হবে অন্তরের অবস্থার ওপর।

সবক : ৩৪

মসজিদ মুসলিম সমাজের হৃৎপিণ্ডের মতো

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُه يُسَبِّحُ لَه فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ○ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ○ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِه وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ○

সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আলাহর যিক্‌র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

যাতে তাদের কৃত উত্তম আমলের জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দেন এবং তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করেন।[৩৪]

ব্যাখ্যা : মানব শরীরে হৃৎপিণ্ডের মূল্য যতটুকু, মানব সমাজে মসজিদের মূল্য ততটুকু। মানুষের শরীরের জন্য হৃৎপিণ্ড যতটা প্রয়োজনীয়, মানব সমাজের জন্য মসজিদ ততটাই প্রয়োজনীয়। হৃৎপিণ্ড ছাড়া মানুষ যেমন মূল্যহীন, ঠিক তেমনিভাবে মসজিদ ছাড়াও মানব সমাজ মূল্যহীন। মানুষের অন্তর আবাদ হয় ঈমান ও আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে। মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্য হলো সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার নামের তাছবীহ জপা।

মসজিদের রূহানী পরিবেশ মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী করে। মসজিদে বসে মানুষ কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকতে পারে। গোপনে কিছু সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারে।

যারা সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং নিজেকে মসজিদের সঙ্গে জুড়ে দেয়, তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া দান করেন। তাকওয়া মানুষের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত। যাদের অন্তরে তাকওয়া থাকে, তারা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, গাইরুল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায়।

তারাই ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহর নিকট উত্তম নেয়ামত লাভ করবে। যাদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অগণিত অনুগ্রহ দান করবেন।

---

[৩৪] সূরা নূর, আয়াত: ৩৬-৩৮

সবক : ৩৫

প্রবৃত্তি পূজারীরা বাস্তবতা বুঝতে পারে না

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ○ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ○ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ○ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ○ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ○

তার কওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ সেই ঈমানদার– যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বললো, 'তোমরা কি জানো যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত'? তারা বললো, 'নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী'।

যারা অহঙ্কার করেছিলো তারা বললো, 'নিশ্চয় তোমরা যার বিশ্বাস করো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।'

অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে যবেহ করে এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করে আর বলে, 'হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখিয়েছো, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো।'

ফলে তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করলো; সকালে তারা তাদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইলো।

অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, 'হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ করো না'।[৩৫]

ব্যাখ্যা : সব নবী রসূলগণই অবিশ্বাসী কাফিরদের বিরোধিতার মুখোমুখী হয়েছেন। মানুষ সহজে তাদের মেনে নেয়নি। আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে এসেই তারা কারো প্রিয় হতে পারেন নি। দুনিয়ার শান শওকত নবীদের ছিলো না।

---

[৩৫] সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৭৫-৭৯

পার্থিব জীবনের বিলাসসামগ্রীও তাদের ছিলো না। দুনিয়ায় কোনো রাজ সিংহাসনে তারা বসতেন না। তাই মানুষ তাদেরকে নবী মেনে নিতে চাইতো না। মিথ্যুক বলতো, অস্বীকার করতো। মানুষ এটা বিশ্বাস করতে চাইতো না যে, আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ, যাকে আমরা আমাদের সমমর্যাদা ও অবস্থানের একজন মানুষ মনে করি, সে আল্লাহর নবী! তাকে আল্লাহ তাআলা নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন করেছেন!

হযরত সালেহ আ. এর সাথী-সঙ্গীদেরকে অবিশ্বাসীরা জিজ্ঞাসা করতো, তার এবং অন্যদের মাঝে কি পার্থক্য রয়েছে? অস্বীকারকারীরা হযরত সালেহ আ.-কে তাদের মতো সাধারণ মানুষ ভেবে তাকে নবী মানতে অস্বীকার করেছিলো। বিপরীতে মুমিনরা হযরত সালেহ আ.-এর দলীল-প্রমাণে সত্যের ঝলক দেখতে পেয়ে তার ওপর ঈমান এনেছিলো। তার সঙ্গী হয়েছিলো।

সত্য সব সময় দলিল-প্রমাণ নির্ভর হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফেররা দলিল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে দেখতেও আগ্রহী হয় না। তারা দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মানকেই সবচেয়ে বড় করে দেখে। যারা দলীল যাচাই করে দেখে তারা সঙ্গে সঙ্গে হককে গ্রহণ করে নেয়। হকের পক্ষে আওয়াজ তুলতে শুরু করে। আর যারা বাহ্যিক শান শওকত খোঁজে, তারা সন্দেহেই থেকে যায়। তারা বেশিরভাগ সময়ই হকের সঙ্গ দেয়ার তাওফীক পায় না। তাদের জন্য হককে গ্রহণ করা খুব মুশকিলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত সালেহ আ. এর উটনীকে যদিও হত্যা করেছিলো গোত্রের এক অবাধ্য ব্যক্তি, কিন্তু আয়াতে আল্লাহ তাদের সমস্ত গোত্রের দিকে নিসবত করে বলেছেন, 'তারা উটনীকে হত্যা করে ফেললো।' এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যদি কোনো দলের একজন মন্দ আমল করে আর অন্যরা তার এই মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সবাইকে এই অপরাধের শরীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

যারা প্রবৃত্তি পূজারী তারা কখনো প্রকৃত বাস্তবতা বুঝতে পারে না। তারা সমাজের ভালো মানুষের সঙ্গ দিতে রাযি হয় না। এমন মানুষের সঙ্গ দিতে তারা প্রস্তুত হয় না, যারা তাকে উত্তম কাজের দিকে ডাকে। যারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, সবার পছন্দের সঙ্গে তাল মিলায়, অপকর্ম ও মন্দের দিকে ডাকে, তাদের পাশে দলে দলে মানুষ ভিড় জমায়। সত্যিকারের কল্যাণকামীর জন্য মানুষের অন্তরে কোনো মায়া-মহব্বত থাকে না। বরং ওই সমস্ত মন্দ লোকেরা তাদেরকে শত্রু মনে করে এবং অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

সবক : ৩৬

কখনো শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে হয়

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. সম্পর্কে অপবাদ রটানোর মূল হোতা ছিলো প্রসিদ্ধ মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে, সে পরকালে কঠিন শাস্তি পাবে। কিন্তু দুনিয়াতে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া হয় নি। সে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলো। ইফকের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হযরত উমর রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, তাকে হত্যা করে আসি।

রসূল উত্তর দিয়েছিলেন,

فَكَيْفَ يَاعُمَرُ! إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

হে উমর! তখন কেমন শোনাবে যখন লোকেরা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সাথীদেরকে হত্যা করে।

কখনো কখনো বৃহত্তর স্বার্থে বড় বড় অপরাধীদেরকেও ছেড়ে দিতে হয়। তবে আখেরাতে তারা শাস্তি পাবেই।

সবক : ৩৭

কোনো বিষয় বুঝতে বুদ্ধিমত্তা জরুরি

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ○ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ○ وَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ○

রাতের সামান্য অংশই তারা ঘুমিয়ে কাটায়। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক।[৩৬]

ব্যাখ্যা : কোনো বিষয় বোঝার জন্য দূরদর্শী মেধা থাকা জরুরি। যাদের প্রজ্ঞা নেই, তারা আল্লাহর নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ বুঝতে পারে না। তারা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আল্লাহর নিদর্শন বোঝার যোগ্যতাই আসলে তাদের থাকে না। তাদের চিন্তাশক্তি হয় স্থূল। এ সব লোকদের হকের পথে আনা খুব কঠিন। তারা শুধু তখনই সত্যকে স্বীকার করে নেয়, যখন তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অন্যায়গুলো শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তাদের ওপর হামলে পড়ে। তখন আর ওই শাস্তি থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার সুযোগ থাকে না।

---

[৩৬] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৭-১৯

পক্ষান্তরে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দলীল প্রমাণ যাচাই করে হককে মেনে নেয়। অবাধ্যতা থেকে তারা দূরে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খা তাদেরকে রাতের বেলা ঘুমাতে দেয় না। তাদের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর স্মরণে কাটতে থাকে। তারা সম্পদ উপার্জনকে জীবনের লক্ষ্য বানায় না, নিজের সম্পদকে নিজের পরিশ্রমে উপার্জিত মনে করে না; বরং আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে। তাই তারা বিশ্বাস করে, তাদের সম্পত্তিতে তাদের অধিকার যেমন আছে, অসহায় ও দরিদ্রদেরও অধিকার আছে।

সবক : ৩৮

আল্লাহর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার পরিণতি

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ○ فَلَوْلَا اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ○ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়।

যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো তখন কেনো তারা বিনীত হলো না? তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলো আর তারা যা করছিলো শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তুলেছিলো।

তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের জন্য সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেওয়া হলো যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো তখন হঠাৎ আমি তাদের ধরলাম; ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো।

অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই– যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[৩৭]

---

[৩৭] সূরা আনআম, আয়াত: ৪২-৪৫

ব্যাখ্যা : মানুষের সামনে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর যদি তারা তা না মানে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাকড়াও করেন না; বরং তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করে কিছুটা বিপদে ফেলে দেন যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে, যাতে তার ঘুমন্ত হৃদয় জেগে ওঠে

মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বিপদাপদ শুধু বিপদাপদই নয়; বরং তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সতর্কবাণী। ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তাআলা সতর্কবাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। তারা এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে যে, এটা তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র; এরকম দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটেই থাকে, তাই এ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এভাবেই সর্বক্ষেত্রে শয়তান মানুষের সামনে কোনো না কোনো ভালো ব্যাখ্যা তুলে ধরে এবং মানুষের মস্তিষ্ককে উপদেশ গ্রহণের স্থলে গাফলতির দিকে ফিরিয়ে দেয়। মানুষ যখন বারবার এমনটি করে, তখন তার অন্তর থেকে হক-বাতিল ও সত্য-অসত্যের মাঝে তারতম্য করার চেতনা বিলীন হয়ে যায়। সে আল্লাহর অবাধ্যতার ভেতরেই উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে।

যখন মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সতর্কবাণীকে এড়িয়ে চলে, সতর্কবাণীর প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে, তখন তার ওপর থেকে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি সরে যায়। তখন তার জন্য দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাস সহজ করে দেয়া হয়, তার জন্য সফলতার সকল দ্বার উন্মোক্ত করা হয়, তার ওপর সুখের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়, তার ইজ্জত-সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হয়, সমাজে সে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তার জন্য এক প্রকার শাস্তি। এগুলো তাকে দেয়া হয় যেনো তার অবাধ্যতার মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

দুনিয়াতে সুখ সমৃদ্ধি তার চেতনাহীনতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সে হককে এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত দাম্ভিক হয়ে ওঠে। আর এভাবেই সে আল্লাহর শাস্তির পুরোপুরি উপযুক্ত হয়। হঠাৎ একদিন তার ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। তাকে দুনিয়ার সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত করে পরকালের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। আল্লাহর দরবারে অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ তার জন্য চির জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে যায়।

এই পৃথিবী আল্লাহর। তিনিই এর এককছত্র মালিক ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সব প্রশংসা ও গুণগানের হকদার ওই সত্ত্বাই। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হককে এড়িয়ে যায়, সে যেনো আল্লাহকেই এড়িয়ে গেলো। সে আল্লাহর বড়ত্ব অস্বীকার করলো এবং নিজেকে তার চেয়ে বড় ভাবলো। এর চেয়ে বড় কোনো জুলুম হতে পারে না। সে ওই সত্ত্বার সাথে

বেয়াদবি করলো, কুল মাখলুকাত যার সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা করে। যার ইচ্ছা ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকার সাধ্য তার নেই। যিনি তার সৃষ্টিকর্তা এবং জীবন ও মৃত্যুর মালিক।

সবক : ৩৯

মানুষের অন্তরেই আল্লাহর প্রতিনিধি রয়েছে

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۝ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যারা নিজেদের প্রতারিত করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে তিনি পছন্দ করেন না এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে তা সর্বোতভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত।[৩৮]

ব্যাখ্যা : মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। এ প্রয়োজনেই জাতি, গোত্র বা দল অস্তিত্ব লাভ করে। বড় একটি দলের সঙ্গে জড়িত হয়ে মানুষ নিজের শক্তিকে হাজার ও লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে সকলের প্রয়োজনেই যা গঠিত হয়েছিলো, তা একটি ধর্মের রূপ ধারণ করে। মানুষের চিন্তা ভাবনা এমন হয়ে যায় যে, আমার দল যা করেছে তাই সঠিক। সে ন্যায়

---

[৩৮] সূরা নিসা, আয়াত: ১০৫-১০৭

করুক আর অন্যায় করুক। হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা বাতিলের উপর। এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকে নিজের দলকে ভালো বলতে থাকে। নিজের দলকেই সবচেয়ে সঠিক ও উত্তম প্রমাণের চেষ্টা করে আর অন্য দলের মন্দাচার করতে থাকে। অন্য দলে নানা দুর্নাম রটাতে থাকে। নিজের দলের লোক যদি ভুলের ওপরও থাকে, তারপরও তাকে সাহায্য করা অত্যাবশ্যক মনে করে। আর অন্য দলের মানুষ যদি হকের ওপরও থাকে, তারপরও তাকে সহযোগিতা করাকে সঠিক মনে করে না।

কোনো দল যখন এই ধারণা পোষণকারী হয়ে যায়, তখন সে নিজের দলের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। তাদের অন্যায় ও অপরাধের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ হাজির করে। অথচ মানুষের উচিত আল্লাহর হেদায়াতকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে নিজের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা। দুনিয়ার স্বার্থ ও দলের কাজকর্ম ন্যায়ের মানদণ্ড হতে পারে না।

কেউ ভুল করলে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তার কাজের প্রতিবাদ করা উচিত। চাই সে নিজের দলের হোক বা অন্য কোনো দলের হোক। আবার কেউ সঠিক কথা বললে সমর্থন করা উচিত। অন্য দলের লোক হলেই তার ভালো কাজে সমর্থন দেওয়া থেকে বিরত থাকা অন্যায়।

কোনো বিষয়ে দুই দলের লোক বিবাদে জড়িয়ে পড়লে সেই বিষয়কে নিজেদের ও অন্যদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে হক বাতিলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে, কারো পরোয়া না করে নিজেকে হকের পক্ষে রাখা উচিত। হকের পক্ষে লড়াই করা উচিত। সত্য কথা না বলা, সত্যের পক্ষে না লড়া, সত্যের পক্ষপাতিত্ব না করার অর্থ নিজেকে প্রতারিত করা। মানুষ যখন অন্যকে ধোঁকা দেয়, তখন সর্বপ্রথম সে নিজেকেই ধোঁকা দেয়। কারণ সবার দেহেই আল্লাহ তাআলা নিজের একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে রেখেছেন। মানুষের অন্তরের ভালো অংশটিই আল্লাহর সেই প্রতিনিধি। মানুষ যখন হকের বিরুদ্ধে যাওয়ার চিন্তা করে, তখন তার ভেতরে হকের এই প্রতিনিধি তাকে বাঁধা দিতে থাকে। অবিশ্বাসী ও অপরাধীরা এই আভ্যন্তরীণ আওয়াজের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এরপর সে অন্যায়ের পথে চলতে শুরু করে।

মানুষ যখন কারো সঙ্গী হয় তখন সে তাকে মানুষ ভেবেই তার সঙ্গী হয়। দুনিয়ার কল্যাণের ভিত্তিতেই সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু কেউ অসত্যের পথে আছে জানার পরও তার সঙ্গ না ছাড়ার মানে হলো তার জন্য নিজের প্রতিপালককে ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহর থেকে নিজেকে নিজে আলাদা করে নেওয়া। মানুষ যদি দুনিয়াতে অন্যায়ের সঙ্গ দেয়, অসত্যকে সমর্থন করে তাহলে

সে পরকালে আল্লাহর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো সাহায্য করবেন না।

সবক : ৪০

মানুষ সহজে মুক্তি পেতে চায়

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ○

আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।[৩৯]

ব্যাখ্যা : মিথ্যা আশা আকাঙ্খা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই সব বানোয়াট ও মনগড়া গল্প কাহিনী; যা ইহুদি আলেমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে রচনা করেছিলো। আর তাদের ধর্মের মানুষের মাঝে খুব প্রচারও হয়ে গিয়েছিলো।

তারা বিশ্বাস করতো জাহান্নামের আগুন ইহুদিদের জন্য নয়। তারা তাদের বুযুর্গ ও নবীদের বানোয়াট বাণী মানুষকে বলতো। তারা বলতো, বনী ইসরাঈল আল্লাহর বিশেষ বান্দা, জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমলের প্রয়োজন নেই।

মানুষ স্বভাবত মুক্তির সহজ উপায়ই পছন্দ করে। কারণ তাতে তারা নিজেদের মন মতো চলতে পারে। পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির আশাও জিইয়ে রাখতে পারে। লাগামহীন জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং যে সকল ইহুদি আলেম মানুষকে 'সহজ মুক্তির পথ' দেখাতে পারতো, মানুষের মধ্যে তারা খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতো। তাদের দরবারে হাদিয়া তোহফা আসা বেড়ে যেতো। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের ভিড় লেগে থাকতো। তারা মানুষকে বিনা পরিশ্রমে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা বলে দিতো আর মানুষও অঢেল ধন সম্পদ হাদিয়া হিসেবে পেশ করে এই অনুগ্রহের মূল্য চোকানোর চেষ্টা করতো। মোটকথা তাদের ধর্ম ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠতো।

এটাই ছিলো কিতাবীদের মূল সমস্যা। তারা কিছু না করেই জান্নাতে যেতে চাইতো। আলেমরা নিজেদের ব্যবসার জন্য তাদেরকে মজাদার স্বপ্ন দেখাতো। তারা ধারণা করতো প্রথাগত কিছু আমল ছাড়া তাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। যারা এ সুধারণার মাঝে ডুবে রয়েছে, প্রকৃত হকের বাণী তাদের কানে গরম পানির মতো মনে হয়। নিজেদের সুন্দর স্বপ্ন থেকে তারা বের হতে চায় না। সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান তাদের আরামের ঘুমকে হারাম করে দিতে চায়, এটা

---

[৩৯] সূরা বাকারা, আয়াত: ৭৮

তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সত্য ধর্মের আহ্বান কল্প কাহিনী শোনায় না, মিথ্যা স্বপ্ন দেখায় না, মানুষের সামনে বাস্তবতা তুলে ধরে এবং ভালো মন্দের মানদণ্ড বুঝিয়ে দেয়।

পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১. কথাবার্তা বলার সময় স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করো। এমন সন্দেহপূর্ণ শব্দ বলো না যার কোনো খারাপ অর্থও আছে।

২. যে কথা বলা হয় তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং বোঝার চেষ্টা করো।

৩. অত্যধিক প্রশ্ন মানুষকে সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এ জন্য প্রশ্নোত্তরের পরিবর্তে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করো।

৪. নিজের ঈমানের হেফাযত করো। নিজের কোনো ভুলের কারণে যেনো তুমি ঈমান থেকে বঞ্চিত না হও।

৫. দুনিয়াতে কারো ভালো দেখে হিংসা করো না। কারণ এটা তার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও দান। আল্লাহ নিজের ফায়সালায় তার যে বান্দাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন।

সবক : ৪১

মুনাফিক শপথ করে নিজের কথা বিশ্বাস করাতে চায়

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا
فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا
اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ○ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ
اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○ اِنَّ
الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ○ كَتَبَ اللّٰهُ
لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ○

আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না; এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর নিকট এমন কসম করবে যেমন কসম তোমাদের নিকট করে থাকে এবং তারা মনে করে, তারা ভালো কিছুর উপর আছে। জেনে রাখো, এরা মিথ্যাবাদী।

শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে; এরা শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতা করে তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো এবং আমার রসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৪০]

ব্যাখ্যা : স্বার্থ পূজারী ব্যক্তি যখন হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করে, তখন সে মনে করে, এভাবে সে নিজেকে হেফাযত করছে, নিজেকে রক্ষা করছে, আখেরাতে যখন সে দেখবে, যে সব বিষয়ের ওপর সে ভরসা করেছিলো, সেগুলো আজ তার কোনো কাজে আসছে না, সেগুলো তার কোনো উপকার করতে পারছে না, তখন সে নিরাশ হয়ে যাবে।

মুনাফিক ব্যক্তি নিজেকে সাচ্চা মুমিন প্রমাণ করার জন্য আগে বেড়ে কথা বলে। কসম খেয়ে নিজের ইখলাস ও আন্তরিকতা প্রমাণ করতে চায়। মনে মনে তারা ভাবে, তারা খুব চালাক ও কৌশলী, তাদের সাথে মুমিনরা বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না, তারা তাদের ধোঁকা দিতে পারে, সে মুমিনদের চেয়ে জ্ঞানে বুদ্ধিতে উত্তম; কিন্তু কিয়ামতের কঠিন ভয়াবহতা যখন সকল কিছুর বাস্তবতা তুলে ধরবে, তখন সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের সামনে মহিমামণ্ডিত ও সুন্দর করে তুলেছিলো; কিন্তু বাস্তবে তারা কত জঘন্য সব অপরাধ করেছে। তারা আসলে কতো নিকৃষ্ট।

---

[৪০] সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১৭-২১

সবক : ৪২

তারা বুযুর্গদের আসনে বসে, নিজে বুজুর্গ হতে পারে না

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো। তবে কি তোমরা বোঝো না?[৪১]

ব্যাখ্যা : কোনো জাতির ওপর আল্লাহ তাআলার সবচে বড় অনুগ্রহ হলো তাদের কাছে নিজের প্রতিনিধি অর্থাৎ নবী রসূল পাঠানো। নবী রসূল পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ ওই জাতির সামনে চিরস্থায়ী সফলতার রাজপথ খুলে দেন। শেষ নবীকে প্রেরণের পূর্বে এই বিশেষ নেয়ামত বনী ইসরাঈলকে প্রদান করা হয়েছিলো। কিন্তু কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের ধর্ম তাদের কাছে পূর্বপুরুষের কিছু প্রথা ও রসম পালনের মতো হয়ে গিয়েছিলো; আল্লাহর দীন ও ইবাদতের মতো আর ছিলো না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। তাদের সামনে তাদের বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরেছিলেন। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ছিলো তারা নবীজির সত্যতা উপলব্ধি করেছিলো এবং তার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যারা বাপ-দাদার স্মৃতি ও ঐতিহ্য হিসেবেই ধর্মকে দেখতো, তারা হকের দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। বরং তারা তাদের ভোগবাদী জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লেগে যায় এবং তার চরম শত্রু হয়ে ওঠে। যদিও তার নবুওয়াতের বর্ণনা ও আলামত তাওরাতে এত স্পষ্টভাবে বর্ণিত ছিলো যে, ইহুদিদের জন্য তার সত্যতা উপলব্ধি করা কঠিন ছিলো না। তবুও পার্থিব স্বার্থে এবং নিজেদের দুনিয়াবী ইজ্জত-সম্মান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী যারা সর্দার, ধর্মীয় নেতা হয়ে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করছিলো, বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলো তারাই। তারা বুযুর্গদের আসনে বসার কারণে জনগণ তাদেরকে ভক্তি করতো। ধর্মের নামে বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া-তোহফা তারা সারাবছর লাভ করতো। নবীজির দাওয়াত তাদের সামনে এই বিপুল সুযোগ সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার আশংকা তৈরি করেছিলো। তারা ভেবেছিলো তারা যদি নবীয়ে

[৪১] সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪

আরাবীকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। হাদিয়া তোহফা আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। লোকজন ইহুদি আলেমদেরকে নবীজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট কথা বলতো, মানুষকে ইসলাম ও নবীজি সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতো। তারা নিজেদের ওয়াজ নসীহতে লোকদেরকে বলতো, সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, সত্য পথে চলো, সত্যের সঙ্গ প্রদান করো, কিন্তু বাস্তবে যখন তাদের নিজেদের সত্যকে সঙ্গ দেয়ার সময় এলো, তখন তারা নিজেরাই সত্যের সঙ্গ দেয়নি। তাদের অবস্থা ছিলো ওই সমস্ত লোকদের মতোই- যারা অন্যকে ভালো কাজের উপদেশ দেয়, অথচ নিজেরা তা পালন করে না, অপরকে খোদাভীতির শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজেরা শিক্ষাগ্রহণ করে না, অন্যকে পবিত্র হতে নির্দেশ দেয় কিন্তু নিজেরা পবিত্রতা অর্জন করে না, অপরকে নামাযের কথা বলে, কিন্তু নিজেরা নামায পড়ে না, যারা অন্যকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা রোযা রাখে না।

আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার মানে যেহেতু আল্লাহর হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা, নিজের জীবন যাপনের ভ্রান্ত গতিপথ পাল্টে আল্লাহর আনুগত্য ও তার নবীর অনুসরণে জীবনকে সাজানো এবং দুনিয়াবী অহমিকা ও ঠুনকো সম্মানের আসন থেকে নিজেকে নামিয়ে এনে আল্লাহর সামনে তার বান্দার মতো মাথা নত করা, তাই এটা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য খুবই কঠিন কাজ; যারা দুনিয়ায় নিজের জন্য মর্যাদার আসন তৈরি করেছে, বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়েছে। বিপরীতে যারা বিনয়ী, সৎ পথে থেকে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করে, তারা খুব সহজেই হকের দাওয়াতে সাড়া দিতে পারে। তাদের অন্তর কালিমামুক্ত ও পরিশুদ্ধ হওয়ায় তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে, আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা অবনত করে এবং আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণ করে এমন অপ্রার্থিব আনন্দ লাভ করে, অবিশ্বাসীরা দুনিয়ার তামাশা ও ভোগ বিলাসে কখনেই সেই আনন্দ পায় না। তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে, এই দুনিয়ায় ভয় করার মতো জিনিস শুধু আল্লাহর ক্রোধ। দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তিকে, অন্য কারো প্রতাপকে তারা ভয় করে না।

সবক : ৪৩

মানুষের সূচনা এক তুচ্ছ শুক্রকিট থেকে

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুক্র থেকে; অথচ দেখো, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী![৪২]

ব্যাখ্যা : মানুষের সূচনা এক তুচ্ছ শুক্রকিট থেকে, কিন্তু এই মানুষই বড় হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেয়। আল্লাহর পৃথিবীতেই সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বসবাস করতে চায়। মানুষ যদি তার সৃষ্টির সূচনা লগ্নের কথা মনে রাখতো, তাহলে সে অহংকার করতে পারতো না। হঠকারিতা ও অবাধ্যতার পথে যেতে পারতো না। মানুষকে আল্লাহ তাআলা যতো নেয়ামত দান করেছেন, এর মধ্যে অন্যতম একটি নেয়ামত হলো চতুষ্পদ জন্তু। এটা যেনো আল্লাহ তাআলার কুদরতের জীবন্ত মেশিন, যা মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। এই চতুষ্পদ প্রাণী ঘাস এবং চারাগাছ খেয়ে সেগুলোকে মানুষের খাদ্যের জন্য গোশত এবং দুধে পরিবর্তন করে দেয়। তাদের শরীরে পশম গজায় যার দ্বারা মানুষ নিজের পোষাক তৈরি করে। তারা মানুষ এবং মানুষের আসবাবপত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়; মানুষের অন্য সব সম্পদ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ফুরিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু জন্তু জানোয়ার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা জানো না'। এই আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের আবিস্কৃত বিভিন্ন যন্ত্র ও সামগ্রী। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ বিভিন্ন যন্ত্র আবিস্কার করেছে। এ ছাড়াও পৃথিবীতে মানুষের জন্য অগণিত নেয়ামত রয়েছে, যা মানুষ নিজে কখনো আবিষ্কার করতে পারতো না কোনো দিন পারবেও না। পৃথিবীর বিপুল নেয়ামতরাজি প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা এক মেহেরবান স্রষ্টা। তাই মানুষের উচিত নিজের প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযতভাবে পালন করা।

এক স্থান হতে অন্যত্র যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা থাকে; যা সোজা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। সওয়ারিও নিজের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সোজা রাস্তায় চলে। কোনো স্থানে পৌঁছার এই সোজা রাস্তার আশেপাশে আরো অনেক রাস্তা ও সংকীর্ণ আঁকা বাঁকা পথ থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি সোজা রাস্তা ছেড়ে আশেপাশের

---

[৪২] সূরা নাহল, আয়াত: ৪

রাস্তাগুলোকে সঠিক রাস্তা মনে করে চলতে শুরু করে, তাহলে সে কখনো নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না; বরং উদভ্রান্তের মতো মূল জায়গার ডানে বামে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, পরকালীন মুক্তি লাভ ও দুনিয়া আখেরাতের সফলতার ক্ষেত্রেও মানুষ সরল ও প্রশস্ত রাজপথে চললেই সহজে তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মানুষকে বলে দিয়েছেন কোন রাস্তায় চললে আল্লাহর কাছে পৌঁছা যাবে। কোন রাস্তা মানুষকে চিরকালীন জীবনে জান্নাতবাসী করবে। সেই রাস্তাটি হলো, তাওহীদ-একত্ববাদ, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির রাস্তা। যে ব্যক্তি এই রাস্তা ধরে চলবে, সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর যে ব্যক্তি আশে পাশের গলি ঘুপচিতে ঢুকবে, সে শুধু ঘোরাঘুরি করতে থাকবে, কখনও নিজের স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চলে। আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে মানুষকেও নির্দিষ্ট একটি রাস্তায় চলতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আর অন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক নয়। অন্য সৃষ্টি সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহর অনুগত। তাদেরকে অবাধ্যতা করার শক্তিই দেওয়া হয় নি। কিন্তু মানুষের কাছে আল্লাহ চান স্বেচ্ছা আনুগত্য। মানুষকে নিজের ইচ্ছায় চলার শক্তি দেওয়া হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় মানুষ সঠিক রাস্তায় চলে অথবা তা ছেড়ে দিয়ে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী অন্য রাস্তায় চলে, এ কারণেই সে পুরস্কার বা শাস্তির হকদার হয়।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ 'নূর' অর্থাৎ আলো বা হেদায়াতের পথ বোঝাতে এক বাচক শব্দ এনেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা শুধু একটি। আর 'যুলুমাত' অর্থাৎ অন্ধকার বা শয়তানের পথ বোঝাতে বহুবাচক শব্দ এনেছেন। অর্থাৎ বিপথে যাওয়ার রাস্তা অনেক। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এইটুকু ইশারাই যথেষ্ট।

সবক : ৪৪

দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ধ্বংস ডেকে আনে

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ○

এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন।[৪৩]

ব্যাখ্যা : পৃথিবীতে কোনো গোত্রকে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস করে দেয়া হয় কিংবা পরাজিত করা হয়, তাহলে এর কারণ হলো, সীমা অতিক্রম করে শাস্তির উপযুক্ত হওয়া। এরকম শাস্তিপ্রাপ্ত গোত্রগুলো পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ লাভের ক্ষেত্র। কিন্তু খুব কম লোকই এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে।

যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে নি এবং রসূলের শরীয়তকে অস্বীকার করেছে, তাদের তো এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিলো যে, তাদের পূর্বে যারা এরূপ আচরণ করেছিলো, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারা কি খেয়াল করে না যে, যাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে- তারা আজ তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। তাদের মুক্ত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। আজ তাদের কিছু বলার শক্তিও নেই।

তাদের সুবিশাল, সুন্দর এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলোর ধ্বংসাবশেষই শুধু রয়ে গেছে। সেই এলাকায় বর্তমানের লোকেরা চলাফেরা করে। তাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকতো, তবে তারা তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো। তারা যে যমীনে বাস করে তারা যদি তা নিয়ে চিন্তা ভাব না করতো, তাহলে তারা তা থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো।

ইসলামে তসবীহ পাঠ ও নামাযের যে বিধান দেওয়া হয়েছে, মক্কী জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে তা পালন করা ছিলো খুবই দুষ্কর; কিন্তু তারপরও তা পালন করার জন্য বলা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, শত্রুতা ও বিরোধিতার মুখেও নামায ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। এগুলো মু'মিনের জন্য ঢাল স্বরূপ। বালা মসিবতে আল্লাহর স্মরণ মানুষের সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

---

[৪৩] সূরা তোয়া হা, আয়াত: ১২৮

সবক : ৪৫

ভ্রান্ত নেতা ও সাধারণ মানুষ

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ○ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ○

আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের আগে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরাও দোজখে প্রবেশ করো।' যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিশাপ দেবে, এমন কি যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিলো; সুতরাং এদেরকে দিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জানো না।'

তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, 'আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করো।'[৪৪]

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে 'প্রবেশকারী দল' দ্বারা উদ্দেশ্য গোমরাহকারী ভ্রান্ত নেতারা। আর 'অভিসম্পাতকারী দল' দ্বারা উদ্দেশ্য, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ। পরকালে যখন প্রত্যেক যুগের পথভ্রষ্ট নেতা এবং তাদের সঙ্গ দানকারী বিপদগামী সাধারণ মানুষগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন এরকম ঘটনাই ঘটবে। দুনিয়াতে তো তারা একে অপরের খুব প্রিয় ও একে অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলো। নেতারা তাদের অনুসারীদের সকল চাহিদা পূর্ণ করতো আর অনুসারীরাও তাদের নেতাদেরকে হিরো মনে করতো। কিন্তু জাহান্নামের আগুন যখন তাদেরকে পাঁকড়াও করবে তখন তাদের চোখের সামনে থেকে সমস্ত কল্পনার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে তার আসল রূপে দেখতে পাবে।

অনুসরণকারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমাদের ওপর আল্লাহর লানত

---

[৪৪] সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৩৮-৩৯

হোক। তোমাদের নেতৃত্ব কতো নিকৃষ্ট নেতৃত্ব ছিলো! তোমরা কয়েকদিনের জন্য আমাদের মিথ্যা তামাশায় ডুবিয়ে রেখেছিলে। আর আজ আমরা কত বড় ধ্বংসের মুখে পড়েছি। এর উত্তরে নেতারা তাদের অনুসরণকারীদেরকে বলবে, তোমরা নিজেদের পছন্দমতো একটি ধর্মের অনুসন্ধান করছিলে, আমরা তেমন ধর্ম তৈরি করে তোমাদের দিয়েছি আর তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে দৌড়ানো শুরু করেছো। অন্যথায় সে যুগে আল্লাহর এমন বান্দারাও ছিলেন যারা তোমাদেরকে সফলতা ও সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেছিলো। তোমরা তাদের আহ্বানও শুনেছো; কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তি-পূজার কারণে তাদের আহ্বানে সাড়া দাও নি। তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর নি।

নেতারা তাদের অনুসারীদের বলবে, তোমরা কোনো দিক দিয়েই আমাদের চেয়ে উত্তম নও। আমরা নিজের প্রবৃত্তি-পূজায় অন্ধ হয়েই নেতা সেজেছিলাম আর তোমরাও তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আমাদের সঙ্গ দিয়েছিলে, আমাদের অনুসরণ করেছিলে। বাস্তবতা হলো, আমরা উভয় দলই সমান অপরাধী। তাই আজ তোমাদেরও সেই শাস্তি দেয়া হবে যা আমাদেরকে দেওয়া হবে। আমরা আমাদের আমলের কারণে এবং তোমরা তোমাদের আমলের কারণে শাস্তি ভোগ করবে।

অনুসরণকারীরা তাদের নেতাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে বলবে, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদেরকে আমাদের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। তারা উত্তর পাবে, তোমাদের নেতাদের প্রত্যেককেই দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হচ্ছে; কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না।

জাহান্নামে যাকে যে শাস্তি দেয়া হবে তার কাছে তা এতো কঠিন ও ভয়ানক মনে হবে যে, সে ভাববে, আমার থেকে বেশি কষ্টে আর কেউ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি যে কষ্টে থাকবে, ওই কষ্টই তার কাছে সবচে বেশি মনে হবে।

পৃথিবীতে প্রবৃত্তিপূজারী নেতা এবং তাদের স্বার্থপূজারী ভক্তরা একে অপরের বন্ধু ছিলো। তারা একে অপরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতো। একে অন্যকে ভালো ও উত্তম বলে জানতো। একে অপরের কল্যাণকামীও ছিলো। কিন্তু আখেরাতে তারা একে অপরকে ঘৃণা করবে। একজন অন্যজনকে তার চেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত দেখতে চাইবে।

সবক : ৪৬

শয়তানকে ভাই বানিয়ো না

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَه شَيْطٰنًا فَهُوَ لَه قَرِيْنٌ○ وَ
اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ○

আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।

আর নিশ্চয় তারাই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।[৪৫]

ব্যাখ্যা : সত্যকে যারা মানে না, তারা আসলে সত্যকে সত্য হিসেবে চেনে কিন্তু মানে না। তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে এমন প্রমাণাদি উপস্থিত হয়, যা সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তারপরও সে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য, নিজের খেয়াল খুশি মতো জীবন যাপন করার জন্য এসব প্রমাণাদিকে এড়িয়ে যায়।

এমন ব্যক্তি নিজের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা বলে বেড়ায়। এ সুযোগে শয়তান তার উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ পায়। শয়তান তার মস্তিষ্ককে ভুল পথে পরিচালিত করে। ধারণাপ্রসূত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাঝে ব্যস্ত রেখে তাকে এটা বিশ্বাস করায় যে, তুমি সত্যের ওপর আছো। সঠিক পথে আছো। এভাবেই শয়তান তাকে প্রতারিত করে। বিশেষত মানুষের মৃত্যুর সময় শয়তান মানুষকে ধাঁকায় ফেলে দেয়। শেষ মুহূর্তে মানুষ বাতিলের ওপর অটল থেকে ঈমান হারা হয়ে আল্লাহর কাছে যায় ।

দুনিয়াতে এরকম মানুষজন এমন ব্যক্তিকেই নিজের বন্ধু ও সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে, যে তার মিথ্যার সঙ্গ দেয়, মিথ্যাকে সমর্থন করে। কিন্তু আখেরাতে তারা এসব সাথীদের ওপর লা'নত করবে। দুনিয়ার প্রিয় বন্ধুদের থেকে এত দূরে পালাতে চাইবে, যেনো সে তার চেহারাও না দেখতে পায়, তার আওয়াজও না শুনতে পায়।

---

[৪৫] সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬-৩৭

সবক : ৪৭

মুনাফিক ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়টি বরবাদ

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَه خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِـه وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَة انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِه خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَة ذٰلِك هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ○

মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তার কোন কল্যাণ হয়, তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর যদি তার কোন বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটি হল সুস্পষ্ট ক্ষতি।[৪৬]

ব্যাখ্যা : মুমিন দুই ধরনের হয়। এক. যে দীনকে পূর্ণ সততা ও বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তার মন-মস্তিষ্ক পুরোটা জুড়েই দীন ছেয়ে আছে, কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই সে নিজেকে দীনের কাছে সঁপে দিয়েছে, তার দৃষ্টিতে দীনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, দুনিয়ার বাকি সব কিছুই দীনের সামনে গুরুত্বহীন; এই ব্যক্তিই আল্লাহর দৃষ্টিতে সত্যিকারের মুমিন বান্দা।

দুই. ওই ব্যক্তি যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে দীনকে অনুসরণ করে। তার মূল লক্ষ নিজের স্বার্থ উদ্ধার। নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে নিজেকে দীনের সঙ্গে জুড়ে রাখে। দীনের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দীন মানার কারণে তার কোনো ক্ষতি না হয়। তার স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা না হয়। যখন সে দেখে যে, দীন এবং তার স্বার্থ একসঙ্গে হাসিল হচ্ছে না, তখন তারা দীনকে ছেড়ে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের পেছনে লেগে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকেই মুনাফিক বলা হয়। দুনিয়া পেয়ে গেলে তারা দীনের ওপর খুশী হয়। আর দুনিয়া না পেলে বা কোনো পরীক্ষায় নিপতিত হলে তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এরা বড়ই দুর্ভাগা। ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই তাদের হাতছাড়া হয়। এর চেয়ে বড় ধ্বংস ও ক্ষতি আর কী হতে পারে?

তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিতেই সফলতা লাভ করার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত একটিই আর তা হলো, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। মুনাফিকের মধ্যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা থাকে না। সে দ্বিমুখী হওয়ার কারণে না পরিপূর্ণভাবে পরকালের প্রতি একনিষ্ঠ হতে পারে আর

---

[৪৬] সূরা হজ, আয়াত: ১১

না পরিপূর্ণভাবে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকতে পারে। উভয়টির কোনোটিরই পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারে না সে; ফলে উভয় দিক থেকেই বঞ্চিত হয়।

সবক : ৪৮

শুধু মুখে মুখে তওবা করলেই তওবা হয় না

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○ وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى ○ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের ওপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখো যতোক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ তৈরি করে দেন।

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন অপকর্ম করবে, তাদেরকে তোমরা শাস্তি দাও, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের শুধরে নেয় তবে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু ।

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। এরাই তারা, যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে,

> 'আমি এখন তাওবা করলাম' এবং তাওবা তাদের জন্যও নয়, যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। [৪৭]

ব্যাখ্যা : কোনো নারী অথবা পুরুষ যদি শরীয়ত বহির্ভূত গর্হিত কোনো গুনাহের কাজ করে বসে তারপরও তার সঙ্গে নিয়ম বহির্ভূত কোনো কিছু করা যাবে না। বরং যা কিছু করা হবে শরীয়তের নিয়মমাফিকই করা হবে। আইন অনুযায়ী কেউ অপরাধী না হলে তাকে অপরাধী বলাও ঠিক নয়। কারো অপরাধী হওয়ার মানে এই নয় যে কেউ তার উপর নিজের খুশি মতো জুলুম করবে বা শরীয়ত তার উপর জুলুম করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। শাস্তির উদ্দেশ্যই হলো, ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা আর ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা জুলুম এবং অত্যাচারের মাধ্যমে করা যায় না।

যদি গুনাহকারী তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন তাকে ক্ষমা করা, তার প্রতি দয়া ও উদারতা প্রদর্শন করা আবশ্যক। অতীত কৃতকর্মের কারণে কারো বদনাম রটানো অনুচিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই যেখানে তাওবাকারীর তাওবাকে কবুল করেন এবং তার প্রতি দয়াদ্র হন, সেখানে মানুষের কি অধিকার আছে তাকে ভৎসনা ও তিরস্কার করার? এমন কোনো ব্যক্তিকে ভৎসনা ও অবজ্ঞা করার নিশানা বানিয়ে মানুষ নিজেই নিজেকে অপরাধী বানিয়ে ফেলে।

শুধু মুখ দিয়ে 'তাওবা' শব্দ উচ্চারণের নামই তাওবা নয়। মুখে মুখে ক্ষমা চাইলেই সেটা তওবা হয় না। তাওবা বলা হয়, নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াকে। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে তাওবা করে অর্থাৎ নিজের গুনাহের জন্য সত্যিকারভাবেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তাহলে তার এই অনুতাপ ও লজ্জাই শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এটা নিজেই নিজেকে শাস্তি প্রদান করার মতো। আল্লাহর ভয়ে মানুষের মধ্যে এই লজ্জা ও অনুতাপ সৃষ্টি হলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

কিন্তু ওই সমস্ত লোকদের তাওবা আল্লাহর নিকট একেবারেই মূল্যহীন যারা জেনে বুঝে আল্লাহর নাফরমানি করে। সর্তক করার পরও গুনাহের ওপর অটল থাকে। যখন দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় আসে, তখন বলে যে, 'আমি তাওবা করছি।' কিন্তু তার এ তাওবা তখন আর কোনো কাজে আসবে না। একইভাবে ওই সব লোকদের তওবাও কোনো উপকারে আসবে না, যারা পরকালের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর নিজের অপরাধ স্বীকার করবে।

---

[৪৭] সূরা নিসা, আয়াত: ১৫-১৮

সত্যিকার তওবা বান্দাকে আপন প্রতিপালকের অভিমুখী করে দেয়। ফলে প্রতিপালকও তার প্রতি দয়াদ্র হন। তাওবা ওই ব্যক্তির জন্য যে সাময়িক ভ্রান্তিতে পড়ে বা কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে কোনো খারাপ কাজ করেছে, অতঃপর মনে দ্রুতই অনুতাপের অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ওই কাজ দ্বিতীয় বার না করার প্রতিজ্ঞা করে। এমন ব্যক্তিই তাওবা করতে পারে। যে ব্যক্তি এভাবে তাওবা করে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই পথিকের মতো যে পথিক বাড়ির রাস্তা ভুলে কোনো গলি ঘুপচিতে ঢুকে পড়েছিলো দ্বিতীয়বার নিজের বাড়ির রাস্তা খুজে পেয়েছে।

সবক : ৪৯

কিতাবী জাতি যখন পথভ্রষ্ট হয়

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا○

বরং তারা কি আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে কাউকে যা দিয়েছেন তার কারণে তাকে হিংসা করে? তাহলে তো আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব।[৪৮]

ব্যাখ্যা : আসমানি কিতাবের বাহক কোনো জাতি যখন পথভ্রষ্ট হয়, তখন তারা আমল করার চেয়ে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কথিত বড়াইকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে নিজেদের ধারণা নির্ভর ধর্মপালন করে। যেমন কাজের মাধ্যমে যা লাভ করা যায়, তা তারা ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ কবজের মাধ্যমে লাভ করতে চায়। তারা দীনকে শুধু কিছু 'পবিত্র কথাবার্তা' এবং 'বরকতময় নিসবত'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থা এই হয় যে, তারা মুখে দীনের নাম উচ্চারণ করে বটে; কিন্তু নিজেদের আমলী যিন্দেগী শয়তানের কাছে সঁপে দেয়। মুখে যাই বলুক, কাজ করে কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের ইচ্ছা অনুযায়ী। নিজেদের কুপ্রবৃত্তির চাহিদার ওপর দীনের লেবেল লাগিয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, তারা যা করছে তাই আল্লাহর দীন। এমতাবস্থায় যখন তাদের কাছে প্রকৃত দীনের দাওয়াত পৌঁছে, তখন তারাই সবচে বেশি এর বিরোধিতা করে। কেননা তারা ভাবে, নতুন দীন তাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা ধ্বংস করে দেবে।

---

[৪৮] সূরা নিসা, আয়াত: ৫৪

অবিশ্বাসী ও কাফেরদের অস্বিত্বও তারা নিজেদের জন্য এতটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে না, যতোটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে সত্যিকারের দীন ও দীনদারকে। এ জন্য তারা কাফেরদের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করে। কাফেরদের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে চলে। কিন্তু হকের পথে আহ্বানকারীদের জন্য তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দয়া মায়া থাকে না। ছাড় দেয়ার কোনো মন মানসিকতাও থাকে না। তাদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তারা বলতে থাকে যে, দীনের ঠিকাদার হলাম আমরা, অন্য সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি কীভাবে দীনের প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা লাভ করে। তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে কাউকে দীনের মুখপাত্র নিযুক্ত করতে পারেন। বাহ্যিক মর্যাদা, সম্প্রদায় ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

কিতাবী হওয়ার পরও তাদের এমন হঠকারিতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে লানত দিয়েছেন। আল্লাহর লানতের ফলে তারা আল্লাহর রহমত এবং সাহায্য থেকে দূরে চলে যায়। খাবার এবং পানি বন্ধ হওয়ার দ্বারা যেমন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যায়, মানুষ মারা যায়, তেমনিভাবে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মানুষ হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তিই তার থাকে না। প্রকাশ্য নিদর্শন সামনে আসার পরও তার স্বীকার করার তাওফিক হয় না। বাস্তব ও অনর্থক প্রমাণাদির মাঝে পার্থক্য করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে।

সবক : ৫০

মানুষ অবাধ্য হলে প্রথম তার জন্য সতর্কবার্তা আসে

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ
اَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ○ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ
اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ○ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ○ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا
اٰلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ○

যদি তুমি দেখতে পেতে ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে আর বলছে, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ করো'।

তোমরা আগে যা প্রেরণ করেছো, সে কারণে এ পরিণাম। আর নিশ্চয় আলাহ বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন।

ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্বের লোকদের স্বভাবের মতো তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে, ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

তা এ জন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্বের লোকদের অভ্যাসের মতো তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের পাপের কারণে এবং ফেরাউনের স্বজনদের ডুবিয়েছি এবং তারা সকলেই ছিলো জালিম।[৪৯]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মধ্যে যারা যতটুকু নেয়ামত প্রাপ্তির অধিকার রাখে, তাদেরকে ততটুকু নেয়ামতই দান করেন। বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি করেন না। কোনো জাতি যদি কোনো নেয়ামত লাভ করে, তাহলে তা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারের কারণেই হয়ে থাকে। এ কথাটাকে অন্য শব্দে এভাবে বলা যায় যে, সামগ্রিক নেয়ামতও জাতির সদস্যদের অবস্থা ও কাজ অনুযায়ী আসে। জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের আলাদা আলাদা যোগ্যতার কারণেই কোনো জাতি বড় নেয়ামত পায়।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায় যদি আল্লাহর নেয়ামত লাভ করতে চায়, তাহলে তাদের উচিত প্রতিটি ব্যক্তির সংশোধনের চেষ্টা করা। একইভাবে কোনো জাতি যদি দেখে তাদের সকলের কাছ থেকে কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাহলে তারা যেনো চিন্তা করে দেখে তার সদস্যরা কী অন্যায় করেছে? তাদের কী ত্রুটি আছে? অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির উচিত নিজেকে সংশোধন করা। কারণ জাতির সদস্যদের ত্রুটির কারণেই তাদের থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ব্যক্তির সংশোধনের মাধ্যমে তারা পুনরায় সেই নেয়ামত লাভ করতে পারবে।

---

[৪৯] সূরা আনফাল, আয়াত: ৫০-৫৪

যখন কোনো গোত্র ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম এবং বিনয়ের স্থলে অহংকার করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সামনে হকের দাওয়াত পেশ করা হয় যাতে সে সতর্ক হয়ে যায়। হকের দাওয়াত আল্লাহর একটি নিদর্শন। এটাকে মানা আল্লাহকে মানার নামান্তর। আর এটাকে অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহর নিদর্শন মানুষের সামনে আসার পরও যখন মানুষ তা অস্বীকার করে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহর এই শাস্তির সূচনা দুনিয়া থেকেই শুরু হয়। কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি মৃত্যুর পরের শাস্তির তুলনায় অনেক কম। পরকালের শাস্তি যেমন, ফেরেশতাদের আঘাত, কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনের লাঞ্ছনা এবং জাহান্নামের আগুনের জ্বলন –এগুলো এতো মারাত্মক কঠিন শাস্তি যে, দুনিয়াতে তা কল্পনাও করা অসম্ভব।

মানুষ যখন জুলুম ও অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন সর্বপ্রথম তার কাছে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। যদি সে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করে, তাহলে সে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিতে নিপতিত হয়।

সবক : ৫১

ভণ্ড দুনিয়াবিরাগীরা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে যেতে বাধা দেয়। আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।[৫০]

ব্যাখ্যা : অন্যের ধন-সম্পদ শুধু ন্যায়সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করা বৈধ। অর্থাৎ সত্যিকারার্থে অন্যের লাভ হয় এমন কোনো কাজ করে এর বিনিময়ে তার সম্পদ নেয়া বৈধ। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রহণ অর্থাৎ তাকে ধোঁকায় ফেলে, মিথ্যে আশা দেখিয়ে বা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সম্পদ নিয়ে নেয়া সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

অবৈধ পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রাস করাকে আধুনিক আরবি পরিভাষায়

---

[৫০] সূরা তওবা, আয়াত: ৩৪

'ইসতিগলাল' বলা হয়। অর্থ হলো, নিজের জন্য লাভজনক শর্তে বিনিয়োগ করে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা। ইহুদি পণ্ডিতদের মাঝে এটিও মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

তারা জনসাধারণের মাঝে অনেক মিথ্যা কল্পকাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিলো। ফলে লোকেরা বুযুর্গদের থেকে অনেক কিছু আশা করতো। তাদের কাছ থেকে এমন কিছুও পাওয়ার আশা করতো, যা শুধু আল্লাহই দিতে পারেন। তারা এই ধর্মব্যবসায়ীদের বুযুর্গ মনে করে তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করার জন্য আসতো। তাদের সামনে হাদিয়া-নজরানা পেশ করতো। বুযুর্গরা আল্লাহর দীনের খেদমতের নাম করে লোকদের থেকে টাকা-পয়সা গ্রহণ করতো। এভাবে তারা জনগণের মাল আত্মসাৎ করতো।

জাহেলিয়াতের যুগে কাফেররাও ইহুদি আলেমদের খুবই মর্যাদাবান মনে করতো। তাদের জন্য উপঢৌকন নিয়ে তাদের কাছে যেতো। কিছু মানুষ ফকির দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালাতে যেতো, সেখানেও নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করার রীতি ছিলো। এগুলো তাদের চেয়েও নিতে হতো না; জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দিতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বিরত রেখেছিলো। কিন্তু সত্যের মুকাবিলা করার কারণে তাদের দুনিয়া-আখেরাত দুটোই ধ্বংস হয়ে যায়। তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হয়। দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়। পরকালেও তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে।

হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করে জনগণকে তারা সত্যের পথ থেকে বিরত রাখতো। মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলতো, জনগণকে আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি। এটা ছিলো স্পষ্ট প্রতারণা। অথচ তারা মানুষের মাঝে যে দীন প্রচার করছিলো, তা ছিলো তাদের আবিষ্কৃত দীন। আল্লাহর পাঠানো প্রকৃত দীন নয়। তারা ইহুদি ধর্মকে পুনর্জীবিত করার কথা বলে বড় বড় চাঁদা আদায় করতো। অথচ ইহুদি ধর্মকে পুনর্জীবিত করার নামে তারা যা কিছু করছিলো, তার লক্ষ ছিলো শুধু মানুষকে সুধারণার ফাঁদে ফেলে রেখে নিজেদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, তাদের এসব কাজের উদ্দেশ্য ছিলো পদ ও মর্যাদা লাভ এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

তারা তাবিজ কবজের বিভিন্ন ফায়দা ও রহস্যের কথা বর্ণনা করে লোকজনের কাছে তা বিক্রি করতো; অথচ স্বয়ং তাদের নিজেদের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা নিজেদের নাজুক মুহূর্ত ও সংকটময় অবস্থাতে কখনো এসব

তাবিজ কবজের ওপর ভরসা করতো না।

মানুষের কাছে যে সম্পদ আসে তা দুই ভাবে খরচ করা বৈধ। এক. নিজের বাস্তবিক প্রয়োজনে যতোটুকু লাগে ততোটুকু নিজের জন্য খরচ করা। দুই. প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। এ ছাড়া সম্পদ ব্যয়ের সব সুরতই মানুষের জন্য আযাবের কারণ হবে; যেমন অহেতুক কাজে খরচ করা অথবা তা পুঞ্জিভূত করে রাখা।

যারা ইহুদিদের মতো নিজে ধর্ম বানিয়ে কিছু মানুষের নেতা হয়ে বসে এবং আল্লাহর দীনের নামে মানুষকে প্রতারিত করে, তারা সর্বদাই হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করবে। তারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবিক উদ্যোগ সহ্য করতে পারে না। আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠাকে তারা নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। কেননা তারা জানে সত্য দীন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ভণ্ডামি মানুষ ধরে ফেলবে। তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ধোঁকাবাজির বারোটা বেজে যাবে।

সবক : ৫২

মুমিন ও মুনাফিকের লক্ষ্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হলে? আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো খুবই সামান্য।[৫১]

ব্যাখ্যা : এই আয়াত নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। মুসলমানদেরকে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হলে মদিনার মুনাফিকরা যে আচরণ করেছিলো, তা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে বলা হলে মুনাফিকদের অবস্থা কী হতো। সুসময়ে নিজেকে সাচ্চা ঈমানদার জাহির করলেও নাযুক পরিস্থিতিতে তাদের আসল চেহারা সামনে এসে পড়তো।

---

[৫১] সূরা তওবা, আয়াত: ৩৮

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু দূরের সফর তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবিদেরকে এমন সময় নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, যখন প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো। গাছের ফল পেকে গিয়েছিলো। গাছের ছায়াও বেড়ে গিয়েছিলো। এই অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ছিলো খুবই কঠিন। কয়েকজন দুর্বল ঈমানদার এবং মুনাফিকরা সাহাবীদের সাথে সফরে না বের হয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলো। আয়াতে তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হয়, তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকো কেনো? তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে ভুলে গেছো? জেনে রেখো পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোনো মূল্যই নেই।

ইসলামের সাথে মানুষের সম্পর্ক দু' ধরনের হয়ে থাকে। এক. তারা যা করে সবকিছুই ইসলাম অনুযায়ী করে। ইসলামের সঙ্গেই তার সবকিছুর সম্পর্ক থাকে। ইসলামই হয় তার জীবন মরণের ফায়সালা। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সে বোঝে না। দুই. তারা নিজের মন অন্য কোথাও বেঁধে রাখে কিন্তু উপরে উপরে নিজেকে মুসলমান জাহির করে।

প্রথম প্রকারের লোকজন সত্যিকারের মুমিন। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোকজনকে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মুনাফিক বলা হয়। মুমিনের অবস্থা তো হলো যে, সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়েও সে ইসলামকে অনুসরণ করে। ছোটো থেকে ছোটো বিষয়ের ক্ষেত্রেও সে ইসলামকে মেনে চলে। কঠিন সময়ে ইসলামের জন্য ত্যাগ এমন কি আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হলেও সে ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকে। বিপরীতে মুনাফিকের অবস্থা হলো যে, লোক দেখানো দীনদারির ক্ষেত্রে সে সবার আগে আগে থাকে। কিন্তু যখন কুরবানীর মাধ্যমে ইসলামের দাবী পূর্ণ করার সময় আসে, তখন সে পেছনে সরে যায়।

এই পার্থক্যের কারণ হলো, মুমিনের মূল লক্ষ্য হয় আখেরাত আর মুনাফিকের মূল লক্ষ্য হয় দুনিয়া। মুমিন আখেরাতের সীমাহিন নেয়ামতের তুলনায় দুনিয়াকে একদমই মূল্যহীন মনে করে। তাই দুনিয়ার কোনো জিনিস যখন তার আখেরাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে তাকে এড়িয়ে দীনের দিকে অগ্রসর হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক এমন ইসলাম পছন্দ করে, যার মাধ্যমে সে দুনিয়া অর্জন করতে পারবে। দুনিয়ার জন্য তার আখেরাতকে জলাঞ্জলি দিতে হলে সে তাই করে। আখেরাতকে সে দুনিয়া অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হতে দেয় না। দুনিয়া অর্জনকেই সে নিজের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মনে করে। তাই ইসলামকে ধরার জন্য দুনিয়াকে ছেড়ে দিতে হলে সে দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। দুনিয়ার জন্য যদি ইসলামের রশি তার হাত থেকে পুরোপুরি ছুটে যায়,

তবুও সে পরোয়া করে না।

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের যে দ্বন্দ চলছে, বাহ্যত তা দেখতে দুটি দলের দ্বন্দ্বের মতো মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে হক বাতিলের দ্বন্দ্ব। এরকম পরিস্থিতিতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইসলামের পক্ষে দাঁড়ান। মুসলামনদেরকে এরকম পরিস্থিতিতে ফেলা হয় পরীক্ষার জন্য। যাতে সেই সব নিষ্ঠাবান লোকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করা যায়; যারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছায় সোপর্দ করে দিয়েছে।

সবক : ৫৩

মুনাফিক আল্লাহকে ভয় না করে বান্দাদের ভয় করে

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ○

তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

যদি তা নিকটলভ্য হতো আর সফর হত সহজসাধ্য, তবে তারা অবশ্যই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের জন্য দূরত্ব দীর্ঘ হলো। অচিরেই তারা আল্লাহর কসম করে বলবে, 'যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম'। তারা তাদের নিজদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।[৫২]

ব্যাখ্যা : মদিনায় যে সকল মুনাফিক রয়ে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের একটি দলও ছিলো। তারা ইসলামকে হক বুঝেই ঈমানের স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। তারা ইসলামের ওই সমস্ত বিধি-বিধানের ওপর আমল করতো যার সাথে তাদের ইহলৌকিক স্বার্থের বিরোধ নেই। কিন্তু যখন ইসলামের

---

[৫২] সূরা তওবা, আয়াত: ৪১-৪৬

হুকুম-আহকামের সঙ্গে তাদের পার্থিব চাহিদার বিরোধ হতো তখন তারা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার চাহিদা পূরণ করতো। মদিনায় হিজরতের পরও মুসলমানদের অনেক কিছু বির্সজন দিয়ে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়েছে। যারা হাসি মুখে ইসলামের জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলো, তারা মুমিন। মুনাফিক হলো ওই মুসলিম নামধারীরা যারা ইসলামের জন্য কোনো কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলো না, কোনো কষ্টও সহ্য করতে তৈরি ছিলো না।

তাবুক যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিন এবং মুনাফিক হওয়ার মানদণ্ড কি? মুমিন কে আর মুনাফিক কে? মুমিনের গুণ কী আর মুনাফিকের গুণ কী?

তাবুকের ঘটনায় মুসলমানরা বের হয়েছিলো রোমের মতো বিশাল পরাশক্তির মোকাবিলা করার জন্য। তখন প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। ফসল পেকে কাটার উপযোগি হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো কাছে কিছু কিছু অর্থকড়ি থাকলেও বেশিরভাগই ছিলেন নিঃশ্ব, তাদের কাছে কিছুই ছিলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো, যে যে অবস্থায় আছো ওই অবস্থায়ই বেরিয়ে পড়ো। কোনো কিছুই ওজর হিসেবে দাঁড় করা যাবে না আর তা গ্রহণও করা হবে না।

আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছুর পরিমাণ ধর্তব্য হয় না; বরং মানুষ দীনের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করলো এটাই মূল বিষয়। দীনের জন্য মুমিনের জীবনসহ সর্বস্বই জান্নাতের মূল্য। বাহ্যত তা দেখতে যতো কমই হোক না কেনো।

মুনাফিকরা যখন দেখতো, কোনো ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই সফর করে ইসলামের খেদমতের বিরাট কৃতিত্ব অর্জন করা যাবে, তখন তারা সাথে সাথে সফর করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো। বিপরীতে যখন এমন সফরের দাওয়াত আসতো, যাতে কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে এবং সবকিছু করেও দুনিয়া লাভের আশা নেই, তখন তারা সেই সফরে যেতে আগ্রহী হতো না। নানা ওজর পেশ করে পেছনে রয়ে যেতো।

দীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যারা বিভিন্ন ওজর আপত্তি পেশ করে দীনি কাজ থেকে দূরে থাকতে চায়, তাদের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহর দীনকে নিজের পার্থিব স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দিতে পারেনি, আখিরাতকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানাতে পারেনি। দীনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেনি।

ওজর পেশ করার মানে হলো, ইসলামের তুলনায় তার দুনিয়ার স্বার্থই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে কেউ এমন উজর-আপত্তি পেশ করবে, সে আল্লাহর নিকট মূল্যহীন হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকট তার কোনো গুরুত্ব থাকবে না। সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে।

মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে বান্দাকে পরোয়া করে। মানুষ যদি আল্লাহর ক্ষমতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারতো, তাহলে সে কখনো এমনটি করতো না।

সবক : ৫৪

মুনাফিক স্বার্থে আঘাত এলেই পেছনে হটে যায়

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ○

আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি তাদেরকে কেনো অনুমতি দিলে, যতক্ষণ না তোমার কাছে স্পষ্ট হয় তারা যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে।[৫৩]

ব্যাখ্যা : মুনাফিক মুসলমানরা লাভজনক সুবিধাগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার আগে আগে থাকতো, কিন্তু যখন তার স্বার্থে আঘাত আসতো, তখন সে পেছনে হটে যেতো। বিভিন্ন টালবাহানা করতে থাকতো। নানা রকমের ওজর আপত্তি ও অজুহাত তুলে ধরতো। তারা নিজেদের পিছিয়ে থাকার অপরাধটিকে সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতো।

তাদের এই ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতো। কারণ তারা ভাবতো, নিজেদের বাকপটুতার মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তারা নিজেদের মিথ্যে ওজর বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। এই বিপদজনক সফর থেকে নিজেদের দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

তারা বুঝতে পারতো না যে, মানুষের সঙ্গে আসল মু'আমালা নয়; বরং আসল মু'আমালা তো হলো আল্লাহর সঙ্গে। তিনি সকল মানুষের হাকীকত ও অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের রহস্য কখনো দুনিয়াতে প্রকাশ করে দেন, আবার কখনো প্রকাশ করেন না, কিন্তু আখেরাতে তো সকলের রহস্যই প্রকাশ করা হবে।

---

[৫৩] সূরা তওবা, আয়াত: ৪৩

কারো ছেলে অসুস্থ হলে সে স্থির থাকতে পারে না। কন্যার বিবাহের সময় কোনো বাবা বসে থাকে না। নিজেকে বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে আলাদা করে রাখতে পারে না। নিজের সম্পদ আগলে রেখে ছেলেকে কষ্ট পেতে দেয় না, যতো অর্থের বিনিময়েই হোক মেয়েকে বিবাহিত জীবনে সুখী করতে সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে না। সে ভাবে, তার জীবন এবং সম্পদ তো এ জন্যই যে, এমন কোনো সময় আসবে আর সে নিজের সবকিছু উজাড় করে খরচ করবে। এমনকি নিজের সবকিছুও যদি কুরবানী করে দিতে হয়, তা-ও সে করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না। কোনো ওজর তালাশ করে না।

দীনের ক্ষেত্রেও এমনটি করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজের দীনকে আপন করে নিতে পারবে, সে দীনের জন্য যখন কুরবানীর সুযোগ আসবে, তখন কোনো অজুহাত তালাশ করবে না; বরং সবকিছু উজাড় করে দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার মনে হবে তার সব সম্পদ তো এ দিনেরই অপেক্ষায় ছিলো। তার জীবন তো এ জন্যই যে, যখন কোনো সুযোগ আসবে তখন নিজেকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণ করবে। তাহলে এমন সুযোগ আসার পরও ওজর আপত্তি বা টালবাহানা করার প্রশ্নই আসে না।

মুমিন বান্দা আল্লাহকে ভয় করে। ভীতি খুবই শক্তিশালী। মানুষের অন্য সব আবেগের ওপর ভয় জয় লাভ করে। মানুষে যে জিনিসকে বেশি ভয় করে, তার ব্যাপারে সদাসর্বদাই সতর্ক থাকে। সাবধান থাকে। এই কারণে যখন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে ভয় করবে, তখন তার এটা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবে না যে, কোন সময় তাকে কী করতে হবে। তাকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে না যে, এখন তাকে কী করতে হবে আর কাল তাকে কী করতে হবে।

পরকালের ফায়দা দ্রুতলভ্য না হওয়ায় এবং সামনে না থাকায় মানুষ নিজেকে এবং নিজের অর্থকড়িকে কুরবানী দিতে সংশয়ে পড়ে যায়। মূলত সংশয়ের এই পর্দা ছিন্ন করাই এ পৃথিবীতে মানুষের মূল পরীক্ষা।

সবক : ৫৫

কেউ সত্যিই দীন মানে আর কেউ মুনাফেকি করে

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَا اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ○ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ○

যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করতো। তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা শোনার লোক আছে। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

ইতোপূর্বে তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তোমারক বহু কাজ ওলট-পালট করে দিয়েছিলো, অবশেষে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এলো এবং আল্লাহর আদেশ বিজয়ী হলো।[৫৪]

ব্যাখ্যা : কেউ সত্যিই দীন মানে আর কেউ মুনাফেকি স্বভাব নিয়ে দীন মানে। সত্যিকারভাবে দীনকে মানার মানে হলো, দীনকে নিজের জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো। দীনের চাহিদাকে নিজের জীবনের চাহিদা হিসেবে গ্রহণ করা। নিজের জীবন এবং সম্পদের ওপর দীনের হককে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এর বিপরীতে মুনাফেকি করার মানে হলো, দীনের সঙ্গে শুধু প্রথাগত সম্পর্ক রাখা। বাহ্যত দীনের সঙ্গে জুড়ে থাকা। বাস্তবে দীনকে আপন করে না নেওয়া। দীনকে নিজের জীবনে সবকিছু উজাড় দেওয়ার মতো এবং দীনের পথে আগত সব ধরনের ক্ষতিকে বরণ করে নিয়ে দীনের পথে অটল থাকার মতো গুরুত্ব না দেওয়া।

নিজের ভুল স্বীকার করা, অন্যের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বাস্তবেই মানুষের জন্য খুব কঠিন কাজ। মানুষ সর্বদা যে কোনো উপায়েই হোক না কেনো, নিজের অবস্থানকে সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টায় থাকে। মুনাফেকি নিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী সর্বদা এই অনুসন্ধানে থাকে যে, কোনো সুযোগ পেলেই মুখলিস মুমিনদেরকে কলঙ্কিত করে দেবো। তাদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সঠিক বলে প্রমাণ করবো।

মদিনার মুনাফিকরা সারাক্ষণই এই চেষ্টায় থাকতো। যেমন, উহুদ যুদ্ধে

---

[৫৪] সূরা তওবা, আয়াত: ৪৭-৪৮

মুসলমানরা পরাজিত হওয়ার পর মদিনায় অবস্থানকারী মুনাফিকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করলো যে, তারা নিজেদের সামর্থ্য যাচাই না করে আবেগে অগ্রসর হয়েছে এবং আমাদের গোত্রের নওজোয়ানদের শুধু শুধু হত্যা করিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এবং জাদ ইবনে কায়েস ছিলো মদিনার বড় নেতা ও প্রভাবশালী মুনাফিক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে রেখেছিলেন। তারা মুসলমানদের সঙ্গে বের হলে তাদের অনুগত লোকজন সুযোগ বুঝে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতো। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দিতো। মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করতো, তাই কিছু কিছু মুসলমান তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারতো না। তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও বাকপটুতার কারণে তাদের ভালোবাসতো। এটা সত্য যে, তাদের ভালোবাসা ছিলো মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই। আর তাদের মনের অবস্থা না জানা দোষের ব্যপারও ছিলো না। পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। একমাত্র তিনিই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই রাখেন, মানুষের বাইরের অবস্থার মতোই ভেতরের অবস্থাও দেখতে পান। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ জানেন বলেই মুসলমানদেরকে বলে দিয়েছিলেন, হে মুসলমানরা! এই মুনাফিকদের যুদ্ধে না যাওয়াটাকে তোমরা তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করো। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে থাকতো, তবে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতো। তারা নিজেরাও ভালো কাজ করতো না এবং তোমাদেরকেও করতে দিতো না।

মানুষের মাঝে দূরদর্শী খুব কম লোকই হয়; যারা কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই সব বিষয়কে ওপর থেকে দেখে। তলিয়ে দেখতে পারে না। তারা বুঝতে পারে না যে, কারো মুখ থেকে কোনো একটা কথা বের হলেই সেটা প্রমাণিত সত্য হয়ে যায় না। তাই তারা মুনাফিকদের সুন্দর সাজানো গোছানো কথা শুনে প্রভাবিত হতো। এ কারণেই কোনো মুসলিম দলে মুনাফিকরা কম সংখ্যায় থাকলেও তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো। তাদের উপস্থিতিই হতো মুসলমানদের জন্য বড় দুর্বলতা। মুনাফিকরা ছোট নির্দোষ কোনো ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, তিলকে তাল বানিয়ে সরল মুসলমানদের বলতো। তাদের বাকপটুতার কারণে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতো। ফলে সরল মুসলমানরা প্রভাবিত হতো এবং তাদের মনে নানা সন্দেহ ও সংশয় জেগে উঠতো।

মুনাফিকদের হাজারো বিরোধিতা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করলো, তখন তারা হতবাক হয়ে গেলো। বদরের বিজয়

তাদের ইসলাম বিরোধিতার উৎসাহে পানি ঢেলে দিলো। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথী-সঙ্গীরা বললো, এই লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যে, আমরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করবো না, নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেবো, অন্তরে যা আছে তাই থাকবে। প্রকাশ করার মতো সময় সুযোগ আসলে তখন দেখা যাবে।

তারপর যতোই ইসলাম এগিয়ে যেতে থাকে, তাওহীদের দাওয়াত দিক বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততোই তারা হিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হতে থাকে। তাদের পেটের কথা পেটেই ফুলতে থাকে। পেটের কথা বাইরে আনার সুযোগ তারা পায় নি।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, আরবে আল্লাহর কালেমা বিজয়ী হলো, তখন তাদের উচিত ছিলো ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা। কিন্তু তারপরও তারা হিংসায় জ্বলেছে এবং নেফাকের ওপরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

সবক : ৫৬

অধিকাংশ মুনাফিকই ছিলো সম্পদশালী

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ○

বলো, তোমরা খুশি হয়ে দান কর অথবা বাধ্য হয়ে, তোমাদের থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয় তোমরা হচ্ছ ফাসিক কওম।[৫৫]

ব্যাখ্যা : মদিনাবাসী যখন ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলো, তাদের অধিকাংশই ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলো, যারা পরিস্থিতির চাপে যদিও ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলো; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্য করার মতো মন-মানসিকতা তাদের মাঝে তখনও জন্মায়নি; যা হাকীকি ঈমানের দাবি। এই লোকদেরকেই মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকদের অধিকাংশই ছিলো সম্পদশালী। সম্পদশালী হওয়াটাই ছিলো তাদের নেফাকীর মূল কারণ। যাদের কাছে কিছু ছিলো না, তারা খুব সহজেই ইসলামকে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। নিজের স্বল্প

[৫৫] সূরা তওবা, আয়াত: ৫৩

সম্পদের পুরোটাই ইসলামের জন্য ব্যয় করতে চেয়েছে।

পক্ষান্তরে যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য ছিলো, তারা নিজেদের স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় ইসলাম গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলো। ইসলামের কষ্টহীন বিধানগুলো তারা পালন করতো; কিন্তু ইসলামের দাবি পূরণের জন্য জান ও মালের কুরবানী দিতে তারা এগিয়ে আসতো না। এটাই মুমিন আর মুনাফিকের মধ্যে প্রার্থক্য তৈরি করে দিতো।

ইসলামের জন্য কুরবানী করতে যদি কেউ পিছিয়ে থাকে, তা তার নামায রোযাকেও মূল্যহীন করে দেয়। মসজিদের ইবাদতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে মসজিদের বাইরের ইবাদতের সঙ্গে। যদি মসজিদের বাইরে মানুষের যিন্দেগী দীনশূন্য হয় তাহলে মসজিদের ভেতরেও তার যিন্দেগী দীনশূন্য হয়ে যায়। তার আমল শুধু ওঠা বসা হয়, আল্লাহর ইবাদত হয় না। আল্লাহর কাছে এরকম রূহ হীন আমলের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষের সত্যিকারের আমল কবুল করেন, মিথ্যা আমল নয়।

কোনো মানুষের কাছে যদি ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকে আর তার ভক্ত অনুরক্তরা তার কাছে ভিড় করে, তাহলে জনসাধারণ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ লোকগুলোই সবচেয়ে বেশি হতভাগা। সম্পদ ও ইজ্জত সম্মান রক্ষার চিন্তায় তারা আল্লাহর দীনের দিকে অগ্রসর হয় না। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভুলে গিয়ে তার ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে তাদের মৃত্যু চলে আসে। মৃত্যু অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদেরকে তাদের ইজ্জত-সম্মান ও ধন-সম্পদ থেকে চিরতরে আলাদা করে দেয়।

সবক : ৫৭

মুনাফিক মানুষের ভয়ে দীনদার সাজে

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ○

আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে কর্ণপাতকারী।' বলো, তার কান তোমাদের জন্য যা কল্যাণের তাই শোনে।' সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং মুমিনদের বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের

জন্য সে রহমত আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।[৫৬]

ব্যাখ্যা : মদিনার মুনাফিকরা তাদের গোপন বৈঠকে ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতো। কিন্তু যখন তারা মুসলমানদের সামনে যেতো এবং মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হতো, তখন শপথ করে করে তারা তাদের বিশ্বাস করাতে চাইতো যে, আমি একজন খাটি ঈমানদার, পরিপূর্ণ দিয়ানত ও আমানতদার।

এর কারণ হলো, মদিনায় মুসলমানরাই ছিলো শক্তিশালী। মুনাফিকের সংখ্যা ছিলো হাতেগোনা। মুসলমানরা মুনাফিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের মদিনা ছেড়ে পালানো ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। তাই মুনাফিকরা অন্তরের কুফর গোপন করে নিজেদের মুসলমান দাবি করতো এবং মুসলমানদের তোয়াজ করে খুশি করতে চাইতো।

মুনাফিকের দীনদারি ছিলো মূলত মানুষের ভয়ে; আল্লাহর ভয়ে নয়। মুনাফিকরা মানুষের ভয়েই দীনদারির বেশ ধারণ করতো; আল্লাহকে ভয় করে নয়। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে কোনো বাঁধা বা প্রতিবাদ আসার ভয় থাকতো, তারা সেখানে খুব চরিত্রবান ও ইনসাফপ্রিয় সাজতো। কিন্তু- যেখানে এ ধরনের কোনো আশংকা না থাকতো, সেখানে তাদের উল্টো রূপ দেখা যেতো।

মুনাফিকরা নিজেদের ইজ্জত-সম্মান টিকিয়ে রাখার জন্য সত্যিকার মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। লোকজনের সামনে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করতো। আহলে হকের ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতো। নানানভাবে তাদের কুৎসা রটনা করার ফন্দি আঁটতো।

এই লোকগুলো ভুলে গিয়েছিলো তাদের এই বিরোধিতা শুধু ঈমানদারদেরই বিরোধিতা নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহর বিরোধিতা। তারা আল্লাহর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই লোকগুলো যদি নিজেদেরকে নেককার মা'ছুম প্রমাণ করার পরিবর্তে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিতো আর শুধু মনে মনেও ইসলামের দাওয়াতের কল্যাণকামী হতো, তাহলেও তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো। কিন্তু হঠকারিতা এবং বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে তারা নিজেদের নাম আল্লাহর শত্রুদের নামের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছিলো। তাই লাঞ্ছনা ও অপমানই ছিলো তাদের চূড়ান্ত পরিণতি।

আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরকে নরম করে দেয়। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, সে লোকজনের ভিত্তিহীন কথাকেও নিরবে সহ্য করে নেয়। মূর্খ

---

[৫৬] সূরা তওবা, আয়াত: ৬১

অবিশ্বাসীরা ভাবে এরা বোকা কিসিমের মানুষ; কথার মারপ্যাচ বোঝে না।

সবক : ৫৮

মুনাফিক ও মুরতাদ ভিন্ন রূপে অভিন্ন দল

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ○

মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বলো, 'তোমরা উপহাস করতে থাকো; তোমরা যা ভয় করো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন'।[৫৭]

ব্যাখ্যা : তাবুক যুদ্ধের সময় যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো তারা ইসলামের মূল বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ইসলামের চাহিদা মুতাবিক আমল করেছে। যারা নিজেদের ঘরে বসে ছিলো, তারা ছিলো মুনাফিক এবং কাপুরুষ।

তাবুকের ঘটনায় মুনাফিকরা যুদ্ধ থেকে দূরে তো ছিলোই, উপরন্তু তারা রসূল সা. এবং তার সাহাবাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে শুরু করলো। মুনাফিকদের কেউ কেউ বললো, এই কুরআন পাঠকারী লোকজন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেটুক, সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত, সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদি এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাপুরুষ এবং ভীতু।

কেউ কেউ বললো, তোমরা কি মনে করেছো, রোমক খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আরবদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার মতো? এরকম মনে করাটা তাদের চরম ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহর কসম! আগামীকালই আমরা এই লোকগুলোকে বন্দি অবস্থায় দেখতো পাবো এবং তাদের মার খাওয়ার দৃশ্য দূর থেকে দেখে দেখে আনন্দ উপভোগ করবো।

মুনাফিকদের একজন রসূল সা.-কে তাচ্ছিল্যের সাথে উল্লেখ করে বলেছিলো, এই ব্যক্তি মনে করে, সে রোমের প্রাসাদ ও দূর্গ জয় করার জন্য যাচ্ছে! তার জন্য খুব আফসোস হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে তাদের এই কথাগুলো জানতে পেরে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এমন কথা বলেছো?

---

[৫৭] সূরা তওবা, আয়াত: ৬৪

তারা উত্তর দিলো, আমরা তো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।

তাদের প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছিলে?

হে মুনাফিকরা! তোমরা মুসলমানদের নিয়ে মন খুলে যতো পারো উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখো যে, তোমাদের মনের সমস্ত গোপন কথা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দেবেন। আরও স্মরণ রেখো যে, একদিন তোমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবেই হবে। এটাই আল্লাহর ফায়সালা।

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, অন্তরে ব্যাধিযুক্ত এই লোকগুলো কি ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে কখনো প্রকাশ করবেন না? হে নবী আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তোমাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন তুমি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতে। তবে তুমি তাদেরকে তাদের কথার ধরনে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলের সকল কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত আছেন।

এভাবেই আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে মুনাফিকদের জবাব দেন যে, এখন আর তোমরা কোনো বাজে ওযর পেশ করো না। যদিও তোমরা মুখে ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন মুখেও তোমরা কাফের হয়ে গেলে। আল্লাহ, তার রসূল সা. এবং কুরআনে কারীম নিয়ে হাসি-তামাশা করা কুফুরি। আমি যদি অনেককে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখো যে, সবাইকে ক্ষমা করা হবে না। তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য পাপ এবং কুফরীর শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

আল্লাহ এবং তার রসূলের কথা সর্বদা কোনো না কোনো ব্যক্তির যবান থেকে উচ্চারিত হয়েই থাকে। মানুষ অনেক সময় তাকে সাধারণ মানুষ মনে করে তাকে নিয়ে উপহাস করতে থাকে; কিন্তু এই উপহাস ওই ব্যক্তিকে নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহকে উপহাস করার নামান্তর। যে এমনটি করে, সে এটাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে মুখলিস নয়। এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে কঠিন অপরাধী। তাদের মিথ্যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ওজর-আপত্তি তাদের হাকীকত আল্লাহর কাছে গোপন করতে পারে না। মুনাফিক এবং মুরতাদ একই হাকীকতের দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম। কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে আবার তা অস্বীকার করে তাহলে সে মুরতাদ। আর যদি এমন হয় যে, মন-মস্তিস্ক ও অন্তরে সে ইসলাম থেকে অনেক দূরে; কিন্তু মানুষের সামনে সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করে, তাহলে সে মুনাফিক। পরকালে মুনাফিকদের পরিণতি হবে মুরতাদদের পরিণতির মতোই। তবে হ্যাঁ, তারা যদি মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের ভুল স্বীকার করে

নিজেদেরকে সংশোধন করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে হয়তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

সবক : ৫৯
মুনাফিকরা দুনিয়াদারের প্রতি ঝোঁকে

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়, ভাল কাজ করতে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা হচ্ছে ফাসিক।[৫৮]

ব্যাখ্যা : পূর্বের অনেক জাতিকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মান উভয়টিই দান করেছিলেন। তারা এই সম্পদ ও শক্তি নিজেদের যোগ্যতাবলে অর্জিত মনে করে অহংকার করেছিলো। পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদের পরবর্তীকালে আগত মানুষ তাদের এই ভয়ানক পরিণতি থেকে কোনো শিক্ষা লাভ করেনি। তারা যেমনিভাবে নিজেদের জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও শান-শওকত পছন্দ করতো, তাদের পরবর্তীরাও নিজেদের জন্য তা-ই পছন্দ করতে লাগলো। তারা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে ডুবে ছিলো, পরবর্তীরাও মিথ্যা এবং বাতিলই পছন্দ করতে লাগলো। হকের আহ্বানকে তারা কোনো গুরুত্ব প্রদান করে না। হকের চাহিদা পূরণ অবহেলার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই তাদের স্বভাব। পক্ষান্তরে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চাহিদা সব সময় তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটাকেই তারা সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মুনাফিকের অবস্থাও এমনই। সে বাহ্যত মুসলমানের বেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়ালেও অন্য আট-দশটা দুনিয়াদারের মতই সে জীবনযাপন করে। ইসলামের কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আমলকেও সে সাধারণ দুনিয়াদারদের মত ছেড়ে দেয়। মুনাফিকের অন্তর সব সময় দুনিয়াদারদের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। তাদের কাজ, তাদের সংস্কৃতি ও আচরণই তার বেশি পছন্দ হয়।

---

[৫৮] সূরা তওবা, আয়াত ৬৭

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য

- মুনাফিক আখেরাতের ব্যাপারে খরচ করতে কৃপণতা করে; দুনিয়াদারির পেছনে অনেক টাকা খরচ করলেও আখেরাতের জন্য পকেট থেকে কিছু বের করতে তার অনেক কষ্ট হয়; মু'মিনের স্বভাব হয় এর বিপরীত।

- মুনাফিক দুনিয়ার অহেতুক কাজেকর্মে অঢেল সম্পদ খরচ করে; কিন্তু মু'মিনের স্বভাব হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

- হকের উন্নতি মুনাফিকের পছন্দ হয় না। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা ছড়ানোর সুযোগ পেলে মুনাফিক হকের বদনাম করতে অতি উৎসাহী হয়ে উঠে পড়ে লেগে যায়।

- মুমিন ভালো কাজের আদেশ দেয় আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে।

- মুমিন দানশীল হয় আর মুনাফিক হয় কৃপণ।

- মুমিন আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে এবং মুনাফিক আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকে।

- বাহ্যত দীনদার হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিক আল্লাহ এবং আখেরাতকে এভাবে ভুলে থাকে যেনো আল্লাহ এবং আখেরাতের কোনো মূল্য নেই তার কাছে। কিন্তু মুমিন আল্লাহ ও আখেরাতকে তার জীবনের সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

মুনাফিক নিজের ইসলাম প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লা'নত আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পরকালেও। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের বলবেন– আজ আমি তোমাদেরকে ঐরূপই ভুলে যাবো যেরূপ তোমরা দুনিয়ায় আজকের দিনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে তা ভুলে গিয়েছিলে।

মুনাফিকরা সরল ও সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আল্লাহর সঙ্গে যার সম্পর্ক যত গভীর হবে তার আমলও ততো মূল্যবান হবে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন কেউ যতো বেশি দীনি আমলই করুক না কেনো, কিয়ামতের দিন তার সব আমল তেমনই মূল্যহীন হয়ে যাবে, যেমন রূহ ছাড়া শরীর মূল্যহীন।

সবক : ৬০

মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা থাকে

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَـأْمُرُوْنَ بِـالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُـوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ○

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫৯]

ব্যাখ্যা : মুনাফিকি স্বভাব নিয়ে যারা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, আখেরাতের ব্যাপারে তারা উদাসীন হয়। পার্থিব স্বার্থ হাসিলের ক্ষেত্রে তারা হয় খুব সতর্ক। ভালো কাজে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে তারা সবসময় পেছনে থাকে। তবে লোকদেখানো কাজে সর্বদাই তাদের অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায়। বৈশিষ্ট্যে এক হওয়ার কারণে তারা একে অন্যের সাথে খুব মিলেমিশে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তারা একই মতামত দেয়।

বিপরীতে সত্যিকারের মু'মিনের অন্তরে সবসময় আল্লাহর ভালোবাসা জাগরুক থাকে। তাদের সবচাইতে বেশি ফিকির থাকে আখেরাতের জীবন নিয়ে। তারা দুনিয়ার আসবাবের সঙ্গে শুধু প্রয়োজন পূরণ হওয়া পরিমাণ সম্পর্ক রাখে। দুনিয়াকে তারা তাদের মূল লক্ষ্য বানায় না। আল্লাহর পছন্দনীয় কোনো কাজ হতে দেখলে তৎক্ষণাতই তারা তাতে অংশগ্রহণ করে। তাদের যিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্যই থাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, অন্য কিছু নয়। তারা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

ঈমানদারদের এই গুণগুলো তাদের একজনকে অপরজনের নিকটবর্তী করে দেয়। তারা সকলে একসাথে ছুটে চলে আল্লাহর দিকে। তাদের সকলের অনুসরণীয় মানুষ হলেন আল্লাহর রসূল সা.। যখন তারা পরস্পরে মিলিত হয়, তখন একে অপরকে সম্মান করে। তাদের গুণাবলীর মাধ্যমে তারা একে অন্যের পরিচয় লাভ করে। এর উপর ভিত্তি করেই তাদের পরস্পরের সম্প্রীতি বজায় থাকে। এর মাধ্যমেই তাদের ওই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যার জন্য তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে। এর মাধ্যমেই তারা ওই গন্তব্যে পৌঁছে যায়,

---

[৫৯] সূরা তওবা, আয়াত: ৭১

যে গন্তব্যের দিকে তারা সকলে মিলে অগ্রসর হচ্ছে।

দুনিয়াতে ঈমানদারদের জীবন তাদের পরকালের জীবনের দৃষ্টান্ত মাত্র। দুনিয়াতে ঈমানদাররা এমনভাবে জীবনযাপন করে, যেনো একটি বাগানে অনেকগুলো সবুজ-শ্যামল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেই অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। এই গাছগুলোকে আল্লাহর ভয়ে বেরিয়ে আসা অশ্রু তাজা রাখছে। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের এতো কল্যাণকামী যে, পুরো পরিবেশটাই সুন্দর, শান্ত ও নিরাপদ বাগানের মতো হয়ে গেছে। এভাবে চলতে চলতে একদিন আল্লাহ ওয়ালাদের যিন্দেগী আখেরাতের যিন্দেগীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেখানে তারা নিজেদের রোপনকৃত ফসলই কাটবে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতে এমন এমন পুরস্কার পাবে, যেগুলো দুনিয়ায় তার কল্পনাতেও ছিলো না।

সবক : ৬১

মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ○ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○

আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ তার অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করবো এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তার অনুগ্রহে দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করলো এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো।[৬০]

ব্যাখ্যা : ছা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেনো আমাকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অনেক সম্পদের মালিক হয়ে শুকরিয়া আদায় করলে না, এর চেয়ে অনেক উত্তম সামান্য সম্পদের মালিক হওয়া এবং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকারী হওয়া। তারপরও ছা'লাবা বারবার একই আবেদন করতে লাগলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ছা'লাবাকে আপনি সম্পদ দান করুন।

ছা'লাবা বকরী পালতো। এর পর তার বকরী এতো পরিমাণ বাচ্চা দিতে লাগলো যে, মদিনার যমীন তার বকরীর বাচ্চায় ভরপুর হয়ে গেলো। ছা'লাবা

---

[৬০] সূরা তওবা, আয়াত: ৭৫-৭৬

মদিনার বাইরে একটি পাহাড়ে বসবাস করতে শুরু করলো। এরপর ছা'লাবা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। প্রথম তার জামাতে নামায আদায় করা ছুটে গেলো। তারপর জুমার নামায ছুটতে থাকে। এক সময় ছা'লাবার এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমেল[৬১] যখন ছা'লাবার নিকট যাকাত উসূল করার জন্য যায়, তখন ছা'লাবা যাকাত আদায় করলো না। বরং বললো, আমার কাছে তো যাকাতকে ট্যাক্সের মতো মনে হচ্ছে।

ওই ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে মুনাফিক, যার অবস্থা এই হবে যে, সে সম্পদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে আর যখন আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদশালী বানিয়ে দেবেন, তখন সে নিজের সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহর হক আদায় করতে ভুলে যাবে।

এই লোকগুলো নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করতো। কেউ যদি তুলনামূলক একটু বেশি পরিমাণে দান করতো তাহলে তারা বলতো, মানুষকে দেখানোর জন্য সে এতো বেশি দান করেছে। আবার যদি কেউ নিজের অবস্থার তুলনায় একটু কম দিতো, তাহলে তারা বলতো, আল্লাহ কি এই ব্যক্তির সদকার মুখাপেক্ষী?

সবক : ৬২

মুনাফিক সম্পদ ও সম্মান চায়

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ○ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ○ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ○

পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতে পেরে খুশি হলো, তারা অপছন্দ করলো তাদের মাল ও

---

৬১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি।

জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বললো, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'। বলো, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম', যদি তারা বুঝতো।

অতএব তারা অল্প হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে; তারা যা অর্জন করেছে তার বিনিময়ে।

যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায়, তবে তুমি বলো, 'তোমরা আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং আমার সাথে কোনো দুশমনের বিরুদ্ধে কখনও লড়াই করবে না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছো, সুতরাং তোমরা বসে থাকো পেছনে থাকা লোকদের সাথে।

তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তার জন্য তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।[৬২]

ব্যাখ্যা : তাবুক যুদ্ধ প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে হয়েছে। মদিনা থেকে রওয়ানা হয়ে শামের সীমানা পর্যন্ত প্রায় তিনশ মাইল সফর করতে হয়েছিলো। মুনাফিক মুসলমানরা বলেছিলো, গরমের মৌসুমে এতো দীর্ঘ সফর করা যাবে না। তারা ভুলে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর আহ্বান শোনার পর কোনো বিপদে পড়ার ভয়ে বের না হওয়া মানে নিজেকে আরও কঠিন বিপদে ফেলা। এটা রৌদ্র থেকে পলায়ন করে অগ্নিকুণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করার মতো।

যারা আল্লাহকে দূরে সরিয়ে নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে বেশি ভালোবাসে, তারা যখন নিজেদের কৌশলে এরকম কোনো পন্থা বের করতে পারে যে পন্থায় তারা মুসলমানদের দলভুক্ত থাকবে কিন্তু তাদের জীবন ও সম্পদ কোনোটাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, তখন তারা খুব আনন্দিত হয়। তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করে। আর ওই লোকগুলোকে নির্বোধ ভাবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীর্ণশীর্ণ করে রেখেছে।

কিন্তু এটা তাদের মূর্খতা। এটা এমন হাসি যার পরিণাম কান্নার মাধ্যমে শেষ হবে। কেননা মৃত্যুর পরের জগতে এ ধরনের গা বাঁচানোর পন্থাগুলো সবচে বড় মূর্খতা ও বোকামি হিসেবে প্রমাণিত হবে। তখন মানুষ আফসোস করবে যে, তারা তো জান্নাত কামনা করতো, কিন্তু তারা তাদের জমাকৃত সম্পদ দুনিয়ায় রেখে খালি হাতে পরপারে চলে এসেছে। জান্নাতের মূল্য তারা আদায় করেনি।

---

[৬২] সূরা তওবা, আয়াত: ৮১-৮৪

এ ধরনের মুনাফিক হয় ওই সমস্ত লোকজন; যারা নিজের আশেপাশে ভোগ বিলাসের সব ধরনের উপকরণ জমা করে রাখে এবং সমাজে নিজেদের শান শওকতের প্রদর্শনী করে। তাদের শান শওকত দেখে সাধারণ মুসলমানরা প্রভাবিত হয়। তাদের জাকজমকপূর্ণ জীবনযাপন এবং সুন্দর সুন্দর কথা মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

তাদের ব্যাপারে ঠিক মতো খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে, তারা বাহ্যত মুসলমান সেজেছে; কিন্তু বাস্তবে তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ পার্থিব উন্নতি নিয়েই ভাবে। ইসলামী সমাজে তাদের বিশেষ সম্মান বা মর্যাদা পাওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তারা পেছনের কাতারে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থ সম্পর্কিত কার্যাবলির মাঝে তাদের অংশগ্রহণ বা নাক গলানোর অধিকার না থাকা উচিত; তারা সেসব কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ধর্মীয় যে কোনো পদের জন্য তারা অযোগ্য বিবেচিত হবে। যে সমাজে এ ধরনে লোকগুলো ইজ্জত সম্মান লাভ করে সেই সমাজ কখনো আদর্শ ইসলামী সমাজ বা আল্লাহর পছন্দনীয় সমাজ হতে পারে না।

সবক : ৬৩

দীনি কাজে পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আসবে

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ○

তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর এক বার কিংবা দু'বার বিপদগ্রস্ত হয়? এর পরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।[৬৩]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা এ লোকগুলোকে বারবার বিভিন্ন ধরনের বিপদে নিমজ্জিত করেন; যাতে তাদের অন্তরে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কালাম ও সতর্কবার্তা গভীরভাবে অনুধাবন করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন সব বুঝেও না বোঝার ভাণ করে, নিজে থেকে নসীহত গ্রহণ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়, তখন অন্য কোনো জিনিস তার নসীহতের জন্য যথেষ্ট হয় না। নসীহত গ্রহণ করার মতো বিভিন্ন বিষয় যদি সামনে আসে আর মানুষ তা এড়িয়ে যেতে থাকে, তাহলে সে নসীহত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বেশি অনুভূতিহীন হয়ে যেতে থাকে।

---

[৬৩] সূরা তওবা, আয়াত: ১২৬

তাদেরকে প্রতি বছরই একবার অথবা দু'বার পরীক্ষায় নিপতিত করা হয়, কিন্তু তারা না তাওবা করে আর না তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

এখানে পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দূর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, অভাব, অনাহার ইত্যাদি বিপদে ফেলা। এ ধরনের বিপদ-আপদ মানুষের জীবনে বারবার আসতে থাকে; কিন্তু তারা তাদের অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না। তাওবা মূলত উপদেশ গ্রহণ করারই আরেক নাম। প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই এমনটি হয়ে থাকে, বছরে এক দু'বার অবশ্যই তার সঙ্গে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই। এ ঘটনাগুলো মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা এবং নসিহত। কখনো এ ঘটনাগুলো মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া তোমার জীবন অসহায়, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তুমি এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। কখনো তা আখেরাতের বিপরীতে মানুষের দুনিয়ার জীবনের মূল্যহীনতাকে প্রকাশ করে দেয়। অনেক সময় এ ধরনের ঘটনাবলী মানুষের জন্য পরীক্ষা হিসেবে আসে। আল্লাহ দেখতে চান বিপদে পড়লে তার আচরণ ও কাজ কেমন হয়। মানুষের উচিত বিপদকে উপদেশের খোরাক হিসেবে গ্রহণ করা।

উপদেশ গ্রহণ করার উপকরণ থেকে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করতে না পারার কারণ হলো, তারা একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে না। দুনিয়ার ঘটনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য একটি বিষয়কে অপর বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। মানুষের উচিত বাহ্যিক ঘটনাকে আভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, আগত বস্তুর আয়নায় অনাগত বস্তুকে দেখা।

সবক : ৬৪

অহংকার হককে মানার ক্ষেত্রে সবচে বড় প্রতিবন্ধক

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِیْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰی وَلْیَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنَكُمْ اَوْ اَنْ یُّظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ○ وَ قَالَ مُوْسٰٓی اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ○

ফেরাউন বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।'

মূসা বললো, 'আমি আমার রব ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয়

প্রার্থনা করছি প্রত্যেক অহঙ্কারী থেকে, যে বিচার দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।'[৬৪]

ব্যাখ্যা : 'তোমাদের দীন পরিবর্তন করে দেবে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের ধর্মের মাঝে পরিবর্তন ঘটাবে। অর্থাৎ তোমরা নিজেরা যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে যে ধর্ম চলে আসছে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার সমাপ্তি ঘটবে আর মানুষের মাঝে নতুন ধর্মের প্রচলন ঘটবে।

বিশৃঙ্খলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য আমাদের গোত্রের কিছু লোক তৈরি হয়ে যাবে আর সে তাদেরকে নিয়ে দেশের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের উচিত এখনই তাকে হত্যা করে ফেলা।

হককে মানার ক্ষেত্রে সবচে বড় প্রতিবন্ধক হলো, মানুষের অহংকার। সে নিজেকে উঁচু রাখার উদ্দেশ্যে হককে নিচু করে দিতে চায়। নিজেকে মর্যাদাবান প্রমাণের মানসে হককে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। কিন্তু হকের সাহায্যকারী তো হলেন মহামহিম রাব্বুল আলামীন। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও হকের শত্রুরা বাহ্যত হককে পরাজিত করে ফেলে; কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, শেষ সফলতা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেনো, তা হকই লাভ করবে।

সবক : ৬৫

দীনের মূল শিক্ষা তাওহীদ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○ وَ اٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ○

আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদের রিয্ক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তু থেকে এবং তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

আমি তাদেরকে দীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি

---

[৬৪] সূরা মুমিন, আয়াত: ২৬-২৭

> দিয়েছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও কেবল পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষবশত তারা মতবিরোধ করলো। তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে তোমার রব কিয়ামতের দিন সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন।[৬৫]

ব্যাখ্যা : 'বনী ইসরাঈলকে আমি তৎকালীন যুগের জগৎবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' কথাটি উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেও ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত'। কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহর কিতাবের ধারকবাহক বানানোর মানেই হলো তাদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াতের জিম্মাদার নিযুক্ত করা। এটাই হলো তাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বা সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার উদ্দেশ্য।

রসূল সা.-এর আগমণের পর মুসলিম উম্মাহকে যেমন সব সম্প্রদায়ের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, একইভাবে বনি ইসরাঈলকেও আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল নিজেদের কিতাব তাওরাতের মাঝে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে। নবী সা.-এর আগমণের পর তার অনুসরণ না করাও ছিলো আল্লাহর অবাধ্যতা। আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে তারা চিরদিনের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান হারিয়েছে।

দীনের মূল শিক্ষা হলো, একত্ববাদের শিক্ষা; কিন্তু ইহুদিদের বড় বড় আলেম ও পণ্ডিতরা ছোটো খাটো নানা রীতি রেওয়াজ তৈরি করে তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিলো। মানুষকে নানা দল উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছিলো। প্রত্যেক আলেমই নিজের পছন্দ অনুযায়ী দীনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাড়িয়ে নিয়েছিলো। এরপর প্রত্যেক আলেম এবং তার অনুসারীরা নিজেদের বর্ধিত অংশকে সঠিক আর অন্যের বর্ধিত অংশকে ভুল প্রমাণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো। এভাবেই দীনের অনুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরি হয়। মতবিরোধ বাড়তে বাড়তে অবস্থা এমন হয়েছিলো যেনো একটি ধর্ম কয়েকটি ধর্মে বিভক্ত হয়ে গেছে।

বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মকে পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া ধর্মে বানালো, তখন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে কুরআন পাঠালেন। যেহেতু তার পরে আর কোনো নবী আসবে না, তাই আল্লাহ তাআলা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কুরআনে কারীমকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিলেন। যেনো পুনরায় আল্লাহর নাযিলকৃত দীন মানুষের পরিবর্তনের কারণে নষ্ট না হয়ে যায়।

---

[৬৫] সূরা জাসিয়া, আয়াত: ১৬-১৭

সবক : ৬৬

সৃষ্টিজগতের এক নিরব ঘোষণা

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন।

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের রব! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।'[৬৬]

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিজগত নীরবে আল্লাহর অস্তিত্ব ঘোষণা করে যাচ্ছে। মানুষ নিজের কান এবং চোখ থেকে যখন মিথ্যা ও কল্পনার পর্দাকে দূরে সরাবে, তখন সে সব দিক থেকে এই নীরব ঘোষণা শুনতে পাবে। তার কাছে অসম্ভব মনে হবে যে, এমন একটি সৃষ্টিজগত, যেখানে তারকারাজি ও গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কত হাজার কোটি বছর যাবত নিয়মিত একই সময়ে জ্বলে উঠছে, একই সময়ে নিভে যাচ্ছে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা পৃথিবীবাসীকে আলো দিয়ে যাচ্ছে, তারপরও বিলীন হয়ে যাচ্ছে না, ধ্বংস হচ্ছে না। তাদের আলো নিষ্প্রভ হচ্ছে না। অথচ মানুষ নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ও কল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য মাত্র পঞ্চাশ থেকে একশ বছর সময় পেয়ে থাকে। এর মধ্যেই তার সবকিছু নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। এমন এক পৃথিবী; যাকে গাছের সৌন্দর্য, ফুলের সৌরভ, বাতাস, পানি এবং সূর্যের মতো অসংখ্য অর্থবহ জিনিস দিয়ে সাজানো হয়েছে, সেখানে মানুষের জন্য চিন্তা আর পেরেশানী ছাড়া কিছু নেই কেনো?

এটাও তার কাছে অসম্ভব মনে হবে যে, ছোট একটা বীজ যদি পৃথিবীর যমীনে রোপন করা হয়, তাহলে তার ভেতর থেকে সবুজ শ্যামল বিশাল বৃক্ষ বেরিয়ে আসে। অথচ এই পৃথিবীতে মানুষ ভালো পথে জীবনযাপন করেও, অনেক ভালো কাজ করেও তার কোনো ফল সে লাভ করে না।

এমন এক পৃথিবী যেখানে প্রতিদিন রাতের নিকষ কালো অন্ধকারের পর

---

[৬৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১

দিনের দীপ্তিমান আলো আসে। সেই পৃথিবীরই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অথচ এখনো তাতে ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার আলো চমকে উঠতে পারেনি।

এটা এমন এক পৃথিবী যার বুকে ভূমিকম্প ও তুফান শুয়ে আছে আর সেখানেই মানুষ জুলুমের ওপর জুলুম করছে। কিন্তু তাকে বাধা প্রদান করার জন্য কেউ সামনে আসছে না।

যারা ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করছে এবং গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করে, তাদের কাছে এটা অবিশ্বাসযোগ্য যে, একটি অর্থবহ পৃথিবী কিভাবে অর্থহীন পরিণামে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারা জানে যে, হকের আহ্বানকারী যে বাণী শোনাচ্ছে, তা সরবে ওই কথারই ঘোষণা যা নীরব ভাষায় গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যেদিন সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং ন্যায়ের সূর্য উদিত হবে, সেদিন তারা ব্যর্থ ও অসফল হবে না। তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকতে ডাকতে তার দিকে ছুটে যাবে। তারা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের সকল সীমা ও গণ্ডিকে ভেঙ্গেচুরে হকের আহ্বানকারীর সাথী হয়ে যায়। যাতে যখন পৃথিবীর 'আলো' এবং 'অন্ধকার' একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা হবে, তখন বিশ্বচরাচরের মালিক তাদেরকে যেনো তার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত.দের দলে জায়গা দেন। তিনি যেনো তাদেরকে অন্ধকারে ছুড়ে না ফেলেন।

আয়াতের মর্মার্থ এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টি, ভূমণ্ডলের মত কঠিন ও বিশাল সৃষ্টি, তারকারাজি, পাহাড়, জঙ্গল, বৃক্ষ, জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফল ইত্যাদি মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার নিদর্শন। এগুলো কি বিবেকসম্পন্ন মানুষকে আল্লাহর পরিচয় প্রদান করে না? তার আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে না?

দিন-রাত্রির গমনাগমন এবং হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সেই মহান পরাক্রান্ত আল্লাহর ক্ষমতারই নিদর্শন। এ জন্যই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যক জিনিসের দিকে চিন্তাশীল দৃষ্টিতে তাকায় এবং যারা অন্ধ ও বধির নয়। যেমন অন্য জায়গায় অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারা আকাশ ও পৃথিবীর বহু নিদর্শন পদদলিত করে চলে যায় এবং কোনো চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আল্লাহকে মান্য করা সত্ত্বেও শিরক থেকে বাঁচতে পারে না।

মানুষের বানানো সর্বজন স্বীকৃত মানদণ্ড অনুযায়ীই জ্ঞানী ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করেছে। নির্বোধ ওই ব্যক্তি যে নিজের মন-মস্তিষ্ককে অকেজো করে রেখেছে, যে এই পৃথিবীতে অন্ধ ও বধিরের মতো জীবনযাপন করে, ত্রিভূবনের মালিক এবং তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় না জেনেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সবক : ৬৭

নামায মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ○

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি অসুস্থ হও, সফরে থাকো অথবা যদি তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে, অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করো অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

ব্যাখ্যা : নামাযের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা। অযু হলো নামাযের পূর্বের প্রস্তুতি। মানুষ যখন নামায পড়তে চায়, তখন সে সর্বপ্রথম পানির নিকটবর্তী হয়। পানি অনেক বড় নেয়ামত, এটা মানুষের সকল প্রকার দুর্গন্ধ ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার মাধ্যম। অনুরূপভাবে নামাযও আল্লাহ প্রদত্ত ঝরণা; যাতে গোসল করে মানুষ নিজেকে খারাপ আবেগ-অনুভূতি ও ধ্যাণ-ধারণা থেকে পবিত্র করে।

মানুষ অযু শুরু করে নিজের হাতে পানি ঢেলে। তখন যেনো সে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমার হস্তদ্বয়কে মন্দকাজ করা থেকে রক্ষা করুন এবং এর দ্বারা আমার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, এগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিন। তারপর সে নিজের চেহারা ধৌত করে। সাথে সাথে তার রূহ বলে ওঠে যে, হে আল্লাহ! আমি আমার মুখ দিয়ে যে হারাম খাবার খেয়েছি, যে মিথ্যা ও মন্দ কথা

বলেছি, আমার চোখ যে সকল খারাপ জিনিস দেখেছে, তার খারাপ প্রভাব আপনি আমার থেকে দূর করে দিন এবং আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর সে নিজের হাত মাথার উপর ফিরিয়ে নেয়, তখন তার সারা শরীর দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমার মন-মস্তিষ্ক যে অন্যায় ও অপকর্মের কথা চিন্তা করেছে, যেসব অন্যায়ের পরিকল্পনা করেছে, সেগুলো আপনি আমার থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার মস্তিষ্ককে পাক পবিত্র বানিয়ে দিন।

অতঃপর যখন সে নিজের পা ধৌত করে তখন তার আমল তার জন্য আপন রবের সামনে এই আবেদন করে, তিনি যেনো তার পা দ্বারা সংঘঠিত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন আর তাকে এমন বানিয়ে দেন, সত্য এবং ইনসাফের রাস্তা ব্যতিত অন্য কোনো পথে সে যেনো না চলে। এভাবেই মানুষের পূর্ণ অযু তার জন্য দোয়া করে হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে পাক-পবিত্র করে দিন।

যে কোনো অবস্থায় পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য অযুই যথেষ্ট। কিন্তু জানাবাতের[৬৭] অবস্থা এর ব্যতিক্রম। এ জন্য জানাবত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরো শরীর ধৌত করতে হয়। অযু যদি হয় ছোট গোসল তাহলে গোসল হবে বড় অযু। আল্লাহ তাআলা এটা কখনোই পছন্দ করেন না যে, তিনি বান্দাকে অযথাই কষ্টে নিপতিত করবেন। এ জন্য অপারগতার অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করার জন্য তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। অযু এবং গোসলের যে সাধারণ নিয়ম আছে এটা আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। আল্লাহ শরয়ী পবিত্রতাকে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। অপারগ অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতিও আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত।

---

৬৭. সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত ইত্যাদির মাধ্যমে যে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় তাকে জানাবাত বলে।

সবক : ৬৮

দুনিয়ায় অবিশ্বাসীরাই বেশি দাপুটে ও শক্তিশালী হয়

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الثَّوَابِ○ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ○

অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবো এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে; যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।[৬৮]

যারা কুফুরি করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ তোমাকে যেনো ধোঁকায় না ফেলে।

এসব স্বল্পকালীন ভোগ্যসামগ্রী; এরপর তাদের আবাস জাহান্নাম; আর তা কতইনা মন্দ বিছানা!

ব্যাখ্যা : ঈমানদাররা নিজেদের যিম্মাদারির কারণে প্রবৃত্তির স্বাধীন জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত থাকে। হকের প্রতি আহ্বান করার কারণে তাদের সঙ্গে অনেক লোকের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা তাদের শত্রু হয়ে যায়। এই অবস্থাটা কখনো এমন কঠিন আকার ধারণ করে যে, নিজের দেশ থেকে পর্যন্ত তাদেরকে বিতাড়িত হতে হয়। কষ্ট সহ্য করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও মুমিনরা মাধ্য হয়। এরপর হকের বিরোধীদের জুলুমের বিরুদ্ধে

---

[৬৮] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫-১৯৭

তাদের রুখে দাঁড়াতে হয়। আল্লাহর দীনের জন্য তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদ সবই উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে ঈমানদার যেনো দুনিয়ার কল্যাণের পেছনে পড়ে আখেরাতের কল্যাণ ভুলে না যায়। জটিল ও কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করে। নিজেদের ভেতরের কুপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখে এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে যেনো কোনো কাজ না করে।

তাদেরকে ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় অটল অবিচল থাকতে হবে। এই অটলতা এবং দৃঢ়প্রত্যয় এমন জিনিস যা আল্লাহর সাহায্য টেনে নিয়ে আসে। ঈমানদারদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য থাকাও জরুরি। দীনি কাজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য তাদের উচিত মিলেমিশে থাকা। সকলে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে সম্মিলিত শক্তিতে বিরোধি শক্তির মোকাবিলা করা। ঈমান মানেই হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় ওই ব্যক্তিই উত্তীর্ণ হয় যে আল্লাহকে ভয় করে।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে না, অহরহ গুনাহের কাজ করে এবং আখেরাতের ব্যাপারেও উদাসীন ও বেপরোয়া থাকে, তাদেরকেই বেশি প্রভাবশালী ও শক্তিমান মনে হয়। তারাই পৃথিবীতে দাপুটে ও ক্ষমতাশালী। সকল ইজ্জত-সম্মান তাদেরই পদচুম্বন করে।

অন্যদিকে ঈমানদারদের অধিকাংশই হতদরিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থায় জীবনযাপন করে। শান-শওকত ও ইজ্জত সম্মান কোনো কিছুই তাদের থাকে না। কিন্তু এই অবস্থাটা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। কিয়ামত আসামাত্রই অবস্থা একেবারে পাল্টে যাবে। দুনিয়ায় যার কাছে ইজ্জত সম্মান দৌড়ে আসতো, পরকালে তা লাঞ্ছনায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে। আর আল্লাহকে ভয় করার কারণে যারা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবমূল্যায়িত হয়েছিলো, পরকালে তারা চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান এবং সফলতার মালিক হবে। তারা আল্লাহর মেহমান হবে। আর আল্লাহর মেহমানদারির চাইতে বড় কোনো নেয়ামত আসমান ও যমীনের মধ্যে নেই।

সবক : ৬৯

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সমাজের বড় শত্রু

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ○

এ কারণেই, আমি বনী ইসরাইলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেনো সব মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে তাকে বাঁচালো, সে যেন সব মানুষকে বাঁচালো। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।[৬৯]

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যখন কাউকে হত্যা করে তখন সে শুধু একজন মানুষেরই হত্যাকারী নয়; বরং সকল মানুষের হত্যাকারী। কেননা সে মানুষের জীবনের সম্মান নষ্ট করেছে। ওই কানুন ভেঙ্গেছে যা সকল মানুষের জীবনকে নিরাপত্তা দেয়। এই কানুন ভঙ্গ করে সে সব মানুষের জীবনকেই হুমকির মুখে ফেলেছে। একইভাবে যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে জুলুম থেকে মুক্তিদান করে, তখন সে শুধু এক ব্যক্তিকেই মুক্তিদান করে না; বরং সমস্ত মানুষকে মুক্তিদান করে। কেননা সে ওই কানুনের হেফাযত করলো যা সমস্ত মানুষের প্রাণকে সম্মানিত করে। আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান। কারো ওপর হাত উঠানোর অধিকার অন্য কারো নেই।

যখন কোনো ব্যক্তি কারো ইজ্জত-সম্মান, সম্পদ অথবা তার প্রাণের উপর হামলা করে, তখন সে আসলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। মুসলমানদের উচিত এরকম কোনো ঘটনাকে অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখা। কেননা এই এক ব্যক্তির ক্ষতিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখলে সকল মানুষের জান মাল এবং ইজ্জত হুমকির মুখে পড়বে। কোনো সমাজে একজন অপরজনকে সম্মান করার সংস্কৃতি দীর্ঘ সময়ের মেহনতের পর তৈরি হয়। যদি এ সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আবার তা তৈরি করতে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও

---

[৬৯] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩২

সাধনা লাগবে। যে ব্যক্তি সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে, সে সমাজের সবচে বড় শত্রু।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজের ফরয কাজ আঞ্জাম দেওয়া। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। কোনো ব্যক্তির উচিত নয় অন্যের সীমানায় ঢোকা বা অন্যের কাজে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা।

পৃথিবীর সমস্ত তৃণলতা, উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই নীতি মেনে চলছে। মানুষকেও পয়গম্বরদের মাধ্যমে এই নীতি মেনে চলতে বলা হয়েছে। অন্য সৃষ্টিজীবের সাথে মানুষের প্রার্থক্য হলো, মানুষকে কিছু দিনের জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ অহংকার করে, হঠকারিতায় লিপ্ত হয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। স্বাধীনতা পেয়ে যারা এমন করে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে কঠিন অপরাধী।

ওই লোকগুলো আরো বেশি কঠিন অপরাধী যারা আল্লাহ এবং রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের হকের পথে ডাকেন যেনো তারা সুশৃঙ্খল জীবনে ফিরে আসে। সব মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে পৃথিবীতে কোনো অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা থাকতো না। যারা পৃথিবীতে জুলুমের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, তারাই হকের দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নামে এবং হককে ধ্বংস করার জন্য যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত হয়। এমন মানুষদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পরকালে প্রজ্জ্বলিত আগুন।

সবক : ৭০

সকল মানুষ জন্মগতভাবে এক

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا○ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا○ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا○ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا○

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও। অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।

আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই, তিন অথবা চার। যদি ভয় করো যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো দাসীকে। এটাতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিকতর।

তোমরা নিজ উদ্যোগেই নারীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও, এরপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে ভোগ করো।[৭০]

ব্যাখ্যা : সকল মানুষ জন্মগতভাবে এক ও অভিন্ন। একজন নারী ও একজন পুরুষই সকলের মা ও বাবা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরি হলো, প্রতিটি মানুষ অপর মানুষকে আপন মনে করবে। একে অপরের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে। দুর্বলদের সহায়তা করবে এবং তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। সবাই এক যৌথ পরিবারের সদস্যদের মতো মিলে মিশে বসবাস করবে। অতঃপর তাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক আছে, তাতে বংশীয় এই সম্পর্ক আরো অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। আত্মীয়তার সম্পর্কের মাঝে সদ্ব্যবহারের গুরুত্বও তাই বেশি।

দুনিয়ায় নিজেদের মধ্যে ভালো আচরণ যেনো আল্লাহর সাথেই ভালো আচরণ। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরকালে আল্লাহ তার বান্দার সাথে কৃত উত্তম আচরণকে তার সাথে কৃত উত্তম আচরণ হিসেবে বিবেচনা করবেন। বান্দার সাথে কৃত খারাপ আচরণকে তার সাথে কৃত খারাপ আচরণ হিসেবে বিবেচনা করবেন। তাই আমাদের উচিত মানুষের সাথে নিজের আচরণকে

---

[৭০] সূরা নিসা, আয়াত: ১-৪

গুরুত্ব দেওয়া। দুনিয়ার আমল অনুযায়ী আখেরাতে তার চিরস্থায়ী ভবিষ্যতের ফায়সালা করবেন।

হাদীসে কুদসিতে আছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখবে, আমি তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় রাখবো। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সঙ্গে আমার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেবো।

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে সম্পর্ক ও মু'আমালার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যার সম্পর্ক যেমন হবে, আল্লাহর সঙ্গেও তার সম্পর্ক তেমন হবে। ওই ব্যক্তিই আল্লাহভীরু যে বান্দাদের হকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। ওই ব্যক্তিই আল্লাহকে ভালোবাসে যে আল্লাহর জন্য বান্দাদের ভালোবাসে। হাদীসে কুদসিতে যদিও আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ কথাটা সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব বেশি। আল্লাহ নিজের সম্পর্কের পরই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলেছেন।

এতিম ছেলে মেয়ে কোনো গোত্র অথবা সমাজের মধ্যে সবচে দুর্বল ও অসহায় হয়ে থাকে। এ জন্য তাকওয়ার সবচাইতে বেশি কঠিন পরীক্ষা হয় এতিম ছেলে মেয়ের ব্যাপারে। মানুষের উচিত এতিমের ব্যাপারে তারা সেটাই করবে যা ইনসাফের দাবি। যৌথ সম্পদ এমনভাবে বণ্টনের সময় ভালো অংশটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে এতিমদের ভাগে খারাপ অংশ দেওয়া ইত্যাদি গর্হিত অন্যায় কাজ।

সবক : ৭১

অধিক সম্পদ জবাবদিহিতা বাড়িয়ে দেয়

মানুষ কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে যা উপার্জন করে, সব সময় তার চেয়ে বেশি উপার্জন করার স্বপ্ন দেখে। তার যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে অধিক ভোগের উপকরণ নিজের কাছে জমা করা মানুষের অভ্যাস। সে সর্বদা এই ধান্দায়ই থাকে। সম্পদ উপার্জনের চিন্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় তার মৃত্যু চলে আসে। তখন তার উপলব্ধি হয় যে, আসল জমা করার জিনিস তো অন্যকিছু; আমি কোন জিনিস জমা করার পেছনে পড়ে রয়েছি!

নিজের মালিকানায় দুনিয়ার জিনিসপত্র বৃদ্ধি মানুষের জবাবদিহীতা বাড়িয়ে

দেয়। অথচ মানুষ নিজের নিবুর্দ্ধিতার দরূণ ভাবে সে খুব লাভবান হয়েছে। তার জীবন সফল হয়ে গেছে।

আমার একটি উপদেশ খুব মনোযোগ সহকারে শুনুন! নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য যে যতো বেশি বাড়াবে, সে ততো বেশি নিজের আবেগ ও অনুভূতিশূন্য হতে থাকবে। তবে হ্যাঁ! কেউ যদি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. অথবা ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহ. এর মতো হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

সবক : ৭২

দুনিয়ার জীবন কয়েকদিনের তামাশা মাত্র

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছুই না। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?[৭১]

ব্যাখ্যা : যখন কোনো মানুষ হককে অস্বীকার করে অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, সে এটা ভেবে দুনিয়াতে বসবাস করে না যে– মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় উঠানো হবে, মালিকের সামনে হিসাব নিকাশের জন্য দাঁড় করানো হবে। দুনিয়াকেই সে শুরু এবং শেষ ভাবতে থাকে। দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছামতো চলার অধিকার দান করেন। তার লাগাম তার হাতে দিয়ে দেন। সে যেভাবে খুশি সেভাবে চলতে পারে, নিজের ইচ্ছাকে নির্বিঘ্নে বাধাহীনভাবে পূরণ করতে পারে। পৃথিবীতে তার ধন-সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধব অনেক কিছুই থাকে। অনেক সাহায্যকারী থাকে। আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং তাকে তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষ সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে অবাধ্যতার কথাবার্তাও চিন্তা করতে পারে এবং নিজের মন্দ আমলের সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যাও করতে পারে।

শয়তান তাকে ধোঁকায় ফেলে রাখে। আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের উপর মিথ্যা ভরসা করে সে বসে থাকে। সে ভাবে যে, আজ আমি যেমন আছি সারাজীবন তেমনই থাকবো। সে ভুলে যায়, দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দান করা হয়েছে তা শুধু পরীক্ষা মাত্র। এগুলো তার প্রাপ্য হিসেবে তাকে দেয়া হয়নি। সে

---

[৭১] সূরা আনআম, আয়াত: ৩২

নিজের বুদ্ধিবলে বা শক্তিবলে এগুলো লাভ করেনি।

বিলাসী ও উদাসীন জীবন যাপন করা মানুষের জীবনের সবচে বড় ভুল ও অপরাধ; চাই সে আখেরাতকে অস্বীকার করুক বা না করুক। মানুষ সবকিছু বোঝার পরও দুনিয়ার আসবাবের উপর ভরসা করছে। কিসের ভিত্তিতে সে এমনটি করছে? মানুষ যে আলোতে চলাফেরা করে, যে বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করে, এর কোনো বিনিময় সে আদায় করেনি। সে যে যমীন থেকে নিজের রিযিক গ্রহণ করছে, তার কোনো একটা অংশই সে তৈরি করেনি। মানুষ যে সকল পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য ছুটোছুটি করে, তার কোনোটাই নিজের বানানো নয়।

যেহেতু তার নিজের তৈরি নয়, তাহলে যিনি এ সকল জিনিসের মালিক তার কি মানুষের ওপর কোনো অধিকার নেই? মানুষ দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী ব্যবহার করে, কিন্তু এগুলো যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তার শোকর আদায় করে না। তার অনুগ্রহের কথা চিন্তা করে না। অবিশ্বাসীরা তো তার অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

যারা দুনিয়াকে আল্লাহর দুনিয়া মনে করে জীবন কাটাবে তাদের জীবন হবে মুমিনের অর্থপূর্ণ জীবন। এই জীবন তাদের পরকালে মুক্তির পাথেয় হবে। যারা এটাকে আল্লাহর দুনিয়া মনে করবে না, তাদের জীবন খেল তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। এটা শুধুই কয়েকদিনের তামাশা; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যার অবসান ঘটবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্বাধীনতার সময় শেষ হয়ে যাবে। সে তখন তার স্রষ্টাকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যদিও সেই ঈমান তখন কোনো কাজে আসবে না।

সবক : ৭৩

আল্লাহ মানুষকে কান, চোখ এবং অন্তর কেনো দিয়েছেন

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ○

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখো, কীভাবে আমি বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, তারপরও তারা এড়িয়ে চলে।[৭২]

---

[৭২] সূরা আনআম, আয়াত: ৪৬

ব্যাখ্যা : মানুষকে কান, চোখ এবং অন্তরই প্রকাশ করে দেয় যে, তার সৃষ্টিকর্তা তার থেকে কী চান? সৃষ্টিকর্তা চান, মানুষ যেনো তার কথা শোনে, দেখে এবং যুক্তির আলোকে তা বুঝে মেনে নেয়। মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত এ যোগ্যতার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে সে নিজেই নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করলো। তাকে এ নেয়ামতের অযোগ্য বিবেচনা করে একদিন তার কাছ থেকে এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হবে।

যাদেরকে অন্ধ, বধির এবং অজ্ঞ বানানো হয়েছে, তারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং মূল্যহীন অবস্থায় জীবনযাপন করে। কিন্তু আসলে তার চেয়েও হতভাগা ওই ব্যক্তি যার বাহ্যত কান আছে অথচ সে হককে শোনার ক্ষেত্রে বধির, যার বাহ্যত চোখ আছে; কিন্তু সে হককে দেখার ক্ষেত্রে অন্ধ, যার অন্তর আছে; কিন্তু তার হক বোঝার যোগ্যতা নেই।

এই প্রকারের মানুষ প্রথম প্রকারের মানুষের চেয়ে বেশি হতভাগা। কেননা সে দুনিয়ার স্বল্পকালীন জীবন ভোগ বিলাসে কাটালেও চিরকালীন জীবনে সে লাঞ্ছিত ও মূল্যহীন। তার চেয়ে বেশি হতভাগা আর কে আছে?

মানুষকে যখন হক অস্বীকার করার পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন নির্বোধ ও অবাধ্য ব্যক্তিরা নিজেকে খুব নির্ভিকতা প্রদর্শন করে। দুনিয়াতে তার কাজকর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আপন গতিতে চলছে দেখে সে ভাবে, আল্লাহর পাকড়াও করার এই ভয়ভীতি আমার জন্য নয়। এরকম অবাধ্য ও অহংকারীরা হকের দাঈকে বলে যে, তুমি যদি সত্যবাদি হয়ে থাকো তাহলে শাস্তি এনে দেখাও। তারা বোঝে না, আল্লাহর শাস্তি যদি চলে আসে, তাহলে তা তাদের ওপরই পতিত হবে। অন্য কারো ওপর নয়।

আল্লাহর দাঈ সুসংবাদবাহী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবেই আগমন করেন। আল্লাহ চান, মানুষ সতর্ককারীর মাধ্যমে হকের পরিচয় লাভ করুক এবং নিজের সংশোধন করুক। যদি সে হককে না মানে তাহলে সে যেনো নিজের অন্ধত্ব প্রমাণ করলো। এরকম অন্ধদের জন্য ধ্বংস ও বরবাদিই অপেক্ষা করছে।

সবক : ৭৪

প্রত্যেকেই নিজের নেতাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি চান তোমাদের ওপর রহম করবেন অথবা যদি চান তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন; আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে প্রেরণ করিনি। যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছি; দাউদকে আমি যাবূর দিয়েছি।[৭৩]

ব্যাখ্যা : অনেক দাঈ আছেন, কাউকে একবার দীনের দাওয়াত দেওয়ার পর সে মেনে না নিলেই বিরক্ত হয়ে যান। ভাবেন, এ লোকটি এমন কেনো! এতো স্পষ্ট সত্য মানতে রাযি নয়! বিরক্তিতে কখনো কখনো আগ বাড়িয়ে এ ঘোষণা করে বসেন যে, এ লোকটি জাহান্নামি। এ ধরনের কথা বলা একজন দাঈর জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

হকের বাণী পৌঁছানো দাঈর কাজ। হকের দিকে আহ্বান করার পর অস্বীকার করলে সে অনুযায়ী কাউকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর কাজ। দাঈর কখনো এ ভুল করা উচিত নয় যে, সে নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আল্লাহর গণ্ডিতে প্রবেশ করবে।

কখনো এমনও হয় যে, দাঈ এবং যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় দু'জনই নিজেদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও তর্ক শুরু করে। প্রত্যেকেই নিজের নেতাকে অন্যের চেয়ে ভালো এবং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। তার ফলাফল এই যে, যে আলোচনা দাওয়াতের বিষয় নিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, তা ব্যক্তিগত আলোচনায় পরিণত হয়। ফলে যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তার মনে নিজের দল বা গোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা মাথা চাড়া দেয় এবং তার হক গ্রহণের রাস্তা আরো সংকীর্ণ হয়ে যায়।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ নিজের ফয়সালায় প্রত্যেকের স্তর এবং মর্যাদা নির্ধারণ করবেন। আমাদের উচিত এ ধরনের অহেতুক আলোচনা বা তর্কে না জড়িয়ে দীনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে থাকা।

---

[৭৩] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৪-৫৫

সবক : ৭৫

আল্লাহর জন্য নিজের বড়ত্ব মিটিয়ে দাও

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

আমার আয়াতসমূহ কেবল তারাই বিশ্বাস করে, যারা এর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকার করে না।[৭৪]

ব্যাখ্যা : হেদায়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক গুণ হলো, সত্য স্বীকার করার মানসিকতা। হেদায়াত শুধু ওই সমস্ত ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকে যাদের সামনে সত্য চলে এলে সাথে সাথে মেনে নেয়।

সত্য হতে পারে কোনো ছোট ব্যক্তির মাধ্যমে সামনে আসবে। কিন্তু সত্য সামনে এলে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে নিজের জীবন যাপন পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এই সৎসাহস যাদের থাকে, তারাই দ্রুত হেদায়াত লাভ করে।

যারা সত্যকে নিজের বড়ত্ব ও অহমের কোনো ক্ষতি না করে মানতে চায়, তারা কখনো দীনের সত্যিকার অনুসারী হতে পারে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের বড়ত্ব ও আমিত্যকে মিটিয়ে দিলো সেই সম্মান লাভ করলো। তার জীবনে আল্লাহ তাআলা এভাবে শামিল হয়ে যান যে, সে আল্লাহকে স্মরণ করেই শয়ন করে আবার তাকে স্মরণ করেই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। তার ভয় এবং আশা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অধীন হয়ে যায়। সে নিজের সহায় সম্পত্তি এভাবে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয় যে, দুনিয়ার কোনো সম্পদই আর তার নিজের থাকে না। সব কিছুই আল্লাহর হয়ে যায়। এরাই ওই সমস্ত লোক যাদের চোখ জান্নাতের চিরস্থায়ী বাগানে গিয়ে শীতল হবে।

---

[৭৪] সূরা সিজদা, আয়াত: ১৫

সবক : ৭৬

মানুষ দুনিয়ার জন্য দীন ছেড়ে দেয়

أُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا○

এরা ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।[৭৫]

ব্যাখ্যা : এক শ্রেণীর মানুষ ত্যাগ স্বীকারের সময় পেছনে থেকে গেলেও পরে লজ্জিত হয়। লজ্জায় তার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। আরেক শ্রেণীর মানুষ নিজেও পেছনে থাকে এবং অন্যকেও আল্লাহর পথে যেতে বাধা দেয়। এটা হলো গাফলতির ওপর নির্লজ্জতা। গাফলতি ক্ষমাযোগ্য; কিন্তু এরকম নির্লজ্জতা ক্ষমাযোগ্য নয়।

যাদের মাঝে হঠকারিতার প্রবৃত্তি রয়েছে, তারা যদি কোনো ভালো আমলও করে, তারপরও তা মূল্যহীন। কেননা আমলের আসল রূহ হলো, ইখলাস। আর এটাই তার মাঝে নেই। দীনের জন্য কুরবানী না দেয়াটা সর্বদা দুনিয়ার মহব্বতেই হয়ে থাকে। মানুষ নিজের দুনিয়াকে রক্ষা করার জন্য দীন ছেড়ে দেয়। এরা যখন দেখে, দীনের কোনো কাজের মাঝে দুনিয়ার ফায়দাও আছে, সেই কাজে তারা সবার আগে আগে থাকে; যেনো নিজেকে পাক্কা দীনদার হিসেবে জাহির করে বেশি ফায়দা হাসিল করা যায়। কিন্তু যখন দীনের জন্য কুরবানীর ডাক আসে, তখন তারা পিছিয়ে যায়।

সবক : ৭৭

সত্যিকার দীন খুঁজে বের করা কঠিন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا○ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا○ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا○ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا○

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা কর কর।

তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারা

---

[৭৫] সূরা আহযাব, আয়াত: ১৯

তোমাদের জন্য দো'আ করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য; তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু।

যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের অভিবাদন হবে: 'সালাম' আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।[৭৬]

ব্যাখ্যা : যখন দীনের মাঝে ভেজালের মিশ্রণ ঘটে তখন সত্যিকার দীন খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যায়। যখন সত্য ধর্ম ব্যতিত অন্য ধর্ম প্রভাবশালী হয়ে যায়, তখন সত্য ধর্ম মানা খুব কঠিন হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ঈমানদারদের অন্তরে হতাশা আসতে থাকে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো, বাহ্যিক নিরানন্দের পেছনে যে আনন্দ লুকায়িত আছে সেদিকে তাকানো।

মানুষ মনের শক্তিতে বেঁচে থাকে। মুমিনকে চিন্তা ভাবনায় শক্ত থাকতে হয়। আল্লাহর স্মরণ মুমিনকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার বর্ণনাও মুমিনকে শক্তিশালী করে। এই দুনিয়া তো আসলে ক্ষণকালীন তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। তাই এই দুনিয়ায় অবিশ্বাসীরা যতো প্রবলই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। পরকালীন জীবনেই মুমিনের সফলতা পুরোপুরি বোঝা যাবে। দুনিয়া বিলীন করে দিয়ে আখেরাতে এর বিনিময়ে এতো বিরাট প্রতিদান সে পাবে, যার কল্পনাও সে কখনো করে নি।

সবক : ৭৮

দাওয়াতে দূরদর্শিতা ও কল্যাণকামিতা জরুরি

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ ছেড়ে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদেরও তিনি খুব ভাল করেই জানেন।[৭৭]

ব্যাখ্যা : দাওয়াতের মেহনত বাস্তবায়নে চাই দূরদর্শিতা এবং অন্যের

---

[৭৬] সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১-৪৪

[৭৭] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫

কল্যাণকামনা। আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে এই চিন্তাই মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের সামনে দাঈ হিসেবে দাঁড়াতে বাধ্য করে। সে অন্যকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কারণ সে ভাবে, যদি আমি এমনটি না করি তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে পাঁকড়াও করা হবে।

আল্লাহ দাওয়াতি কার্যক্রমকে হেকমত, সদুপদেশ এবং উত্তম পন্থায় চালাতে বলেছেন। আয়াতে হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য, দলিল প্রমাণ। দাওয়াতি কাজ তখনই সুন্দর ও সফল হয়, যখন দাঈ যাকে দাওয়াত দিচ্ছে তার মন-মেজাজের দিকে লক্ষ রেখে দলিল ও প্রমাণ পেশ করে। এটাকেই হেকমতপূর্ণ দাওয়াত বলা হয়। যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তার মন-মেজাজ ও চিন্তা-ভাবনার দিকে লক্ষ্য না রেখে দাওয়াত দেওয়া হলে তা হেকমতশূন্য দাওয়াত হবে। এরকম দাওয়াত যে দেয়, তাকে দাঈ বলা যায় না। সে প্রকৃত দাঈর মর্যাদা পায় না।

সদুপদেশ ও নসিহত মানুষের অন্তর থেকে বের হতে হয়। যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তার প্রতি কল্যাণকামিতা ও নিজের দাওয়াতের ওপর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের ছাপ তার কথায় থাকতে হয়। যে দাঈ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব যথাযথভাবে অনুভব করে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে বা তাঁর কথা স্মরণ করলেই তার হৃদয় কেঁপে ওঠে। আল্লাহর কথা বলার সময় তার কথায় আল্লাহর বড়ত্বের দ্যুতি চমকে ওঠে। যে দাঈ জান্নাত এবং জাহান্নাম চোখের সামনে দেখতে পায়, সে অন্যদেরকে তা দেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার কথায় জান্নাতের সৌন্দর্য এবং জাহান্নামের ভয়াবহতার ছাপ ফুটে ওঠে। এ সকল বৈশিষ্ট্যই দাঈর কথাকে প্রভাব সৃষ্টিকারী বানায়। তা মানুষের অন্তর বিগলিত করে, চোখ থেকে অশ্রু বের করে।

দাওয়াতি কথাবার্তায় হেকমত থাকা জরুরি। এমন কিছু লোক থাকে যারা অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সামনে এনে মানুষকে উত্তেজিত করে। বন্ধু বানানোর পরিবর্তে মানুষকে শত্রু বানিয়ে ফেলে। দাঈর স্বভাব কখনো এমন হয় না। একজন প্রকৃত দাঈর অন্তরে তার বিরোধী শিবিরের লোকদের প্রতিও ভালোবাসা থাকে। তাদের পরকালীন পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকে। তাদেরকে সত্যের পথে আনার জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তাদেরকে আঘাত না করেই সে সত্যের বাণী তাদের সামনে তুলে ধরে । আল্লাহ যেমন বলেছেন

جِدَالُ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَن

অর্থাৎ তারা বাঁকা কথার উত্তরেও সোজা কথা বলে। কঠিন কথা শোনার পরও নিজের কথায় নম্র শব্দ ব্যবহার করে। তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর পরও তারা উত্তেজিত না হয়ে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের পথ গ্রহণ করে। তারা ক্রুদ্ধ কথায় উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে।

হকের দাঈর দৃষ্টি তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তির দিকে থাকে না; বরং ওই মহান মালিকের দিকে থাকে যিনি সবার ওপরে। এ জন্য তারা এরকম কথাই বলে যা আল্লাহর মিযানে নেকি হিসেবে উঠবে।

সবক : ৭৯

দাঈর সবচে বড় হাতিয়ার হলো ধৈর্য

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ○ وَ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ○ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ○

আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে আর যদি তোমরা সবর করো, তবে তাই সবরকারীদের জন্য উত্তম।

তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[৭৮]

ব্যাখ্যা : এখানে দাঈর ওই গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা বিরোধিতাকারীদের মোকাবেলার সময় তার মধ্যে প্রকাশ পায়। বলা হয়েছে, যদি বিরোধিতাকারীদের পক্ষ থেকে এমন কোনো কষ্ট দেয়া হয় যা তোমরা সহ্য করতে পারো না, তাহলে তোমাদেরও ততটুকু কষ্ট দেওয়ার অধিকার আছে যতটুকু কষ্ট তোমাদের দেওয়া হয়েছে। এ অনুমতি শুধু মানুষের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রেখে দেয়া হয়েছে। দাঈর আসল গুণ এমন হওয়া উচিত, যাকে সে দাওয়াত দেবে তার পক্ষ থেকে যত কষ্টই আসুক, সে ধৈর্য ধারণ করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে তার সঙ্গে সদাচরণ করবে। সব অভিযোগ আল্লাহর কাছেই করবে এবং তার কাছেই প্রতিদান লাভের আশা করবে।

যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে সে যদি হককে না মানে, হকের শত্রু হয়ে হককে আঘাত করে এবং হকপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চক্রান্ত করে, তখন

---

[৭৮] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬-১২৮

দাঈকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রতিক্রিয়া দেখানো অথবা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে সে হকের বাণী পৌঁছাতে থাকবে।

দাঈকে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহভীরু হতে হবে। মানুষ দুনিয়ার পর্দা অতিক্রম করে আল্লাহকে তার প্রকৃত ক্ষমতার সঙ্গে দেখার পর তার ভেতর যে ভয়ের সৃষ্টি হবে, দাঈর ভেতর সেই ভয় পৃথিবীতেই সৃষ্টি হতে হবে। দাঈ যদি এমন খোদাভীতি অর্জন করতে পারে, তাহলে সব বিষয়ে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। এরপর হকের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদের কোনো কৌশলই দাঈর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেনো কোনো লাভ হবে না।

পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ রয়েছে। এক. যাদের দৃষ্টি মানুষের পৃথিবীতেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। যারা শুধু মানুষের কর্মপন্থা, শক্তি ও ক্ষমতাই দেখে। দুই. যাদের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে থাকে। যারা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। প্রথম প্রকারের লোকজন ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের লোকজনের পক্ষেই ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হয়। যারা সব ধরনের কটুকথা শুধু আল্লাহর জন্য সহ্য করে নেয় এবং তার কাছেই প্রতিদানের আশা করে। তারা মানুষের কাছে কিছু আশা করে না। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ভরসা তাদের অন্তর থেকে মানুষের ভয় বা মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাকে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেয়।

দাঈ বিরোধীদের ক্রুদ্ধ ও উত্তেজক কথায় কোনো উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। কিন্তু সে তাদের কথার বিপরীতে যুক্তি ও দলিল পেশ করবে এবং হকের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করবে। বিরোধীদের চক্রান্ত এবং কুটকৌশলে কিছু মানুষ ভয় পেয়ে বলাবলি করে যে, তারা দাওয়াত এবং দাঈকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু একজন দাঈ সবসময়ই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। তার এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। তিনি নিশ্চিতই হকের দাওয়াতকে বিজয়ী করবেন এবং বাতিল ও ভ্রান্তদের পরাজিত করবেন।

সবক : ৮০

প্রকৃত নেককাজ খোদাভীতি কমায় না

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْـقَ اَثَامًـا○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا○ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○ وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّه يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا○

যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে তা এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে।

তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং সৎকাজ করে, সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।[৭৯]

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে তিনটি গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

২. অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

৩. ব্যাভিচার করা।

এই তিনটি গুনাহ আল্লাহ এবং বান্দার হকের মধ্যে সবচে বড় গুনাহ। আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে ঈমান আনার একটি প্রধান আলামত এই তিন গুনাহ থেকে দূরে থাকা। যে ব্যক্তি এই গুনাহসমূহে লিপ্ত হবে, সে দুনিয়াতে তাওবার মাধ্যমে এগুলোর পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এ সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ব্যতিত মারা যায়, তার জন্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত

---

[৭৯] সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৮-৭১

কঠিন শাস্তি রয়েছে, যা থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

প্রকৃত নেককাজ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বাড়িয়ে দেয়। যে নেককাজ আল্লাহর ভয় কমিয়ে দেয় তা আসলে নেককাজ নয়।

যদি কোনো মানুষ কোনো অন্যায় করে ফেলার পর অনুতপ্ত হয়, আল্লাহর দরবারে কৈফিয়তের কথা চিন্তা করে তার মন কেঁপে ওঠে, তাওবা ও ইসতেগফার করে সে আল্লাহর দিকে দৌড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহের মাধ্যমে তার গুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। কেননা তা তার ক্ষেত্রে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ হয়েছে।

সবক : ৮১

প্রকৃত দাঈ ব্যক্তিগত আক্রমণ করে না

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا○ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا○

এবং যারা মিথ্যার সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অনর্থক ক্রিয়াকর্মের মুখোমুখি নিজের সম্মানের সাথে তা পরিহার করে চলে যায়।

এবং যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মতো আচরণ করে না।[৮০]

ব্যাখ্যা : বর্তমান দুনিয়াতে যে সকল গুনাহের কাজ আছে এগুলোর দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়। কারণ শয়তান এগুলোকে বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। সব প্রবৃত্তি পূজারীই নিজের মতাদর্শকে সুন্দর শব্দে উপস্থাপন করে। বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে লোকজন এসব মতাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী হয়, অনেকে এগুলো গ্রহণও করে। যদি এই মতাদর্শগুলোর বাহ্যিক আবরণ দূর করে দেয়া হয়, তাহলে কেউ এগুলোর কাছে যেতেও রাযি হবে না।

এ হিসেবে সব ধরনের অন্যায়, অপকর্ম ও অশ্লীলতা এক প্রকারের মিথ্যা যার মাঝে মানুষ লিপ্ত হয়। মানুষের দায়িত্ব মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে জেনে পরিত্যাগ করা।

নসীহত শুনে যারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অন্ধ ও বধির। কেননা সে তার চোখকে হাকীকত দেখানোর কাজে ব্যয় করে না। সে তার কানকে সত্য শোনার কাজে ব্যবহার করে না। দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেভাবে

---

[৮০] সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭২-৭৩

নসীহত গ্রহণ করে সে তাদের মতো নসীহতকে অভ্যর্থনা জানায় না; বরং শোনা ও দেখার যোগ্যতা থেকে সে বঞ্চিত ব্যক্তির মতো নসিহত শুনে রেগে যায়।

আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রবণকারী ও দৃষ্টিসম্পন্ন ওই ব্যক্তি, যে অবৈধ কাজ দেখে অবৈধ হিসেবে চিনতে পারে এবং সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকে। যখন তার সামনে নসীহত আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে তা কবুল করে।

প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সে নিজের পরিবারের নেতা। যদি তার পরিবারভূক্তরা মুত্তাকী হয় তাহলে সে মুত্তাকীদের নেতা। আর যদি তার পরিবারের সদস্যরা আল্লাহভোলা হয় তাহলে সে আল্লাহভোলাদের নেতা।

সবক : ৮২

হকের জন্য লাঞ্ছিতরাই মূলত সম্মানিত

أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ○
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ○ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ
لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ○

তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে যেহেতু তারা সবর করেছিলো। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা।

সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কতইনা উৎকৃষ্ট!

বলো, 'যদি তোমরা না-ই ডাকো, তাহলে আমার রব তোমাদের কোন পরওয়া করেন না। তোমরা অস্বীকার করেছো, ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।[৮১]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের উঁচু অট্টালিকায় ওই সমস্ত ব্যক্তিরা স্থান পাবে যারা দুনিয়াতে নিজের অধিকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলো। যারা দুনিয়াতে বিনয় অবলম্বন করেছিলো, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবেন। আখেরাতে তাদেরকে সকলের মাথার মুকুট বানিয়ে দেবেন। এটাই সেই কথা যা হযরত ইসা আ. এভাবে বলেছেন, 'হকের জন্য লাঞ্ছনা সহ্যকারীরা আখেরাতে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে'।

ওই সমস্ত গুণ যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, সেগুলো অর্জন করা এমন

---

[৮১] সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭৫-৭৭

ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। জান্নাত এমন আলীশান জায়গা, যেখানে মানুষের সকল চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হবে। তবে এমন ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা জান্নাত লাভ করবে যে দুনিয়াতে নিজের কামনা-বাসনার ওপর পরিপূর্ণভাবে লাগাম লাগিয়েছিলো। জান্নাত হলো মানুষের ধৈর্য্যের প্রতিদান। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ধৈর্য ধারণ করতে পারে নি সে জাহান্নামী হবে।

সবক : ৮৩

হঠকারিতা মানুষকে সুপথে ফিরতে দেয় না

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও পরিশুদ্ধ হলে তাদের প্রতি তোমার রব অবশ্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮২]

ব্যাখ্যা : যখন অন্যায় ও অপকর্মের সঙ্গে অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং গোঁড়ামি একত্র হয়ে যায়, তখন মানুষ তা থেকে সরতে পারে না। তার কাজ ভুল প্রমাণ করার জন্য হাজারো দলীল সামনে এলেও সে হেদায়াত পায় না। মূর্খতা অথবা প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে যারা কোনো ভুল করে ফেলে, তাদের সাধারণত কোনো ঔদ্ধত্য বা জিদ থাকে না। যখন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার ভুল স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে এবং নিজেকে সংশোধন করে দীনের ওপর দৃঢ় থাকে।

প্রথম শ্রেণীর লোকরা ক্ষমা পাবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকরা ক্ষমা পাবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের রহমতের ছায়ায় নিয়ে নেবেন। কেননা তিনি নিজের বান্দার উপর অত্যধিক মেহেরবান।

---

[৮২] সূরা নাহল, আয়াত: ১১৯

সবক : ৮৪

যারা বাকপটুতায় মানুষকে প্রভাবিত করতে চায়

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ○

তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, 'তুমি যদি তাদের আদেশ করো তবে তারা বের হবেই। তুমি বলো, 'তোমরা কসম করো না। তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত'।

বলো, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। যদি তোমরা তার আনুগত্য করো তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে, আর রসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।[৮৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলার দীনের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য গভীরভাবে থাকে, সে দীনের জন্য বড় বড় কুরবানী করেও অহংকার করে না। নিজের কুরবানীকে তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

এর বিপরীতে আল্লাহর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক দুর্বল, তারা আওয়াজের ক্ষেত্রে বা নিজেকে জাহির করার ক্ষেত্রে সবার আগে থাকে। তাদের গলা সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সে নিজের আমলের ঘাটতি শব্দের আধিক্য দ্বারা পূরণ করতে চায়। কার্যক্ষেত্রে যেহেতু তার কোনো অবদান নেই, তাই সে নিজেকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার জন্য বড় বড় শব্দ প্রদর্শন করে বেড়ায়।

যারা শব্দের কারুকাজে অন্যকে প্রভাবিত করতে চায়, তারা ভাবে যে, মানুষকে ধোঁকা দিতে পারলেই বুঝি তারা বেঁচে যাবে। তারা জানে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সবচেয়ে বড় অর্জন আর আল্লাহ কথার কারুকাজে ভোলেন না। তাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না।

---

[৮৩] সূরা নূর, আয়াত: ৫৩-৫৪

সবক : ৮৫

হক না মানার জন্য আন্দোলন করা বড় অন্যায়

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا○ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا○ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا○ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا○

তারপর প্রত্যেক দল থেকে পরম করুণাময়ের সর্বাধিক অবাধ্যকে আমি অবশ্যই টেনে বের করবো।

কারা জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবার বেশি উপযুক্ত সে সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভালো জানি।

তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

তারপর আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদের মুক্তি দেবো আর জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো।[৮৪]

ব্যাখ্যা : হক না মানা অন্যায়; কিন্তু হককে না মানার জন্য আন্দোলন চালানো এর চেয়েও বড় অন্যায়। যারা হক বিরোধী আন্দোলনের নেতা, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভয়ানক শাস্তির যোগ্য। তাদেরকে পরকালে সাধারণ অপরাধীদের শাস্তির দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

কুরআনের আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে জাহান্নাম অতিক্রম করাবেন। এ অতিক্রম করাটা জাহান্নামের ভেতর দিয়ে হবে না; বরং জাহান্নামের ওপর দিয়ে হবে; মানুষ যেভাবে পুলের মাধ্যমে নদী অতিক্রম করে। সে নদীর ভয়ানক ঢেউগুলো দেখতে পায়; কিন্তু নদীতে পতিত হয় না। সব মানুষই জাহান্নাম অতিক্রম করবে। নেককাররা জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বদকাররা জাহান্নাম পেরিয়ে যেতে পারবে না। জাহান্নাম তাদেরকে চিনে ফেলবে এবং নিজের দিকে টেনে নেবে।

যাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তারা যেনো উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কতো নিকৃষ্ট জায়গা থেকে রক্ষা করে কত উত্তম জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।

---

[৮৪] সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৬৯-৭২

সবক : ৮৬

আল্লাহর নেয়ামতকে নিজের যোগ্যতায় অর্জিত মনে করে

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ○ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

অতঃপর কোনো বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে নি'আমত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে'। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীরা এটা বলেছিলো। কিন্তু তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

সুতরাং তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। এদের মধ্যেও যারা জুলুম করে তাদের উপরেও তাদের অর্জনের সব মন্দফল শীঘ্রই আপতিত হবে। আর তারা অক্ষম করতে পারবে না।

তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিজিক প্রশস্ত করে দেন আর সঙ্কুচিত করে দেন? নিশ্চয় এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।[৮৫]

ব্যাখ্যা : দুনিয়াতে মানুষ যখন কোনো জিনিস লাভ করে তখন সে এটাকে নিজের যোগ্যতার ফলাফল মনে করে খুশি হয়। অথচ দুনিয়ার নেয়ামত পরীক্ষার হিসেবে আসে, যোগ্যতার পুরস্কার হিসেবে নয়। এই ব্যাপারটি যে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, সে দুনিয়ার ধন সম্পদ নিয়ে বড়াই করবে না। দুনিয়ার সম্পদকে যদি মানুষ নিজের যোগ্যতার ফলাফল মনে করে, তাহলে তা তার অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। এর বিপরীতে যখন মানুষ এগুলোকে আল্লাহর নেয়ামত ও পরীক্ষার সামানা মনে করে, তখন তার ভেতর

---

[৮৫] সূরা যুমুর, আয়াত: ৪৯-৫২

কৃতজ্ঞতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়।

দুনিয়াতে মানুষের রিযিক কম বা বেশি হওয়া মানুষের ক্ষমতার বাইরে। সর্বশক্তিমান আল্লাহই ফায়সালা করেন যে, কে বেশি পাবে আর কাকে কম দেয়া হবে। সুতরাং রিযিকের ফায়সালা মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে হয় না।

দুনিয়া হলো পরীক্ষার কেন্দ্র, পুরস্কার প্রাপ্তির স্থান নয়। এখানে মানুষ যা কিছু পায় তা তার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্নজনকে বিভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রদান করেন। কাউকে এক ধরনের অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা নেন, আবার অন্য কাউকে অন্য ধরনের অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা নেন।

সবক : ৮৭

জীবনের সফলতার মাপকাঠি আখেরাত

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَ رُسُلِىْ هُزُوًا ○

বলো, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাবো, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত?

দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে!

তারা সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখবো না।

তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে।[৮৬]

ব্যাখ্যা : মানুষ দুনিয়াতে কাজকর্ম করে। সে তার কাজকর্মের ফলাফল

---

[৮৬] সূরা কাহাফ, আয়াত: ১০৩-১০৬

ইজ্জত-সম্মান ও সম্পদের আকৃতিতে লাভ করে। তাই তার কোনো কাজই তার কাছে বিফল মনে হয় না। সে ভাবে আমি সফল।

কিন্তু এটা পরিপূর্ণ মূর্খতা বৈ আর কি। আল্লাহর কাছে জীবনের সফলতার মানদণ্ড হলো আখেরাত। পার্থিব জগতের উন্নতিকে সফলতা মনে করা মুর্খতা। আখেরাতকে অস্বীকার করে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না বলেই তারা পার্থিব জগতকে মূল মনে করে। এমন ধ্যান ধারণার মানুষ কখনো সফল হতে পারে না।

আল্লাহর তাআলা নিজের নিদর্শনগুলো স্পষ্ট করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু যারা নিজের মন মেজাজকে দুনিয়ার সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, তারা আল্লাহর নিদর্শন দেখে প্রভাবিত হয় না। এই লোকগুলো হেদায়াতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকেও হেদায়াত কবুল করা থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা আল্লাহর নিদর্শনকে কোনো মূল্য দেয় না। তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোনো মূল্যের যোগ্য মনে করবেন?

সবক : ৮৮

মুসলিম নেতার উচিত কোমল হৃদয় এবং নম্রভাষী হওয়া

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ○ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ○ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ○ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ○

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইরা যখন যমীনে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, 'যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো, তবে তারা মারা যেতো না এবং তাদেরকে হত্যা করা হতো না'। ফলে

আল্লাহ এটাকেই তাদের আক্ষেপে পরিণত করেন; আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

তোমাদেরকে যদি আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।

যদি তোমরা মারা যাও অথবা তোমাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছেই সমবেত করা হবে।

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর ও রূঢ় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজেকর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।

যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের ওপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আল্লাহর ওপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে।[৮৭]

ব্যাখ্যা : এ পৃথিবীতে যা কিছু হয় সবকিছুই আল্লাহর হুকুমে হয়। তবে আল্লাহ সব কিছুর জন্য বাহ্যিক আসবাবও সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের কাছে মনে হয় সব ঘটনাই কোনো না কোনো সববের কারণে হয়। কিন্তু আসল কথা হলো, সেই সববও আল্লাহই সৃষ্টি করেন। মানুষের কর্তব্য বাহ্যিক আসবাবের পেছনে যে মহামহিম ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলা কাজ করছেন তা উপলব্ধি করা। এটাই মানুষের পরীক্ষা।

ওই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে আসবাবকেই মূল মনে করে এবং আসবাবের পেছনে পড়ে থাকে। মুমিন হলো ওই ব্যক্তি, যে আসবাবকে অতিক্রম করে পেছনের মূল শক্তির পরিচয় লাভ করে। আসল হাকীকতের জ্ঞান লাভ করতে পারে।

এক ব্যক্তি মুমিন হওয়ার দাবিদার; কিন্তু তার অবস্থা হলো, সে জীবন-মরণ, সফলতা ও ব্যর্থতাকে কর্মের ফল মনে করে, কৌশল অবলম্বন করার পরিণাম ভাবে, তাহলে তার ঈমানদার হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

গায়রে মুমিনের সঙ্গে যদি কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে তখন সে এই

---

[৮৭] সূরা ইমরান, আয়াত: ১৫৬-১৬০

চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায় যে, আমি যদি অমুক কাজটা করতাম তাহলে আজ আমি এই বিপদ থেকে বেঁচে যেতাম অথবা আমি যদি অমুক কৌশল অবলম্বন করতাম তাহলে আজ আমার এ অবস্থা হতো না। পক্ষান্তরে মুমিন যখন কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়ে তখন সে এটা ভেবে নিশ্চিন্ত হয় যে, যা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার আসবাবকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে নিজের গোটা জীবনটাকেই দুনিয়ার আসবাবপত্র একত্র করার পেছনে লাগিয়ে দেয়। মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকাটা তার কাছে অনেক প্রিয় হয়ে যায়; কিন্তু প্রাপ্তির আসল জায়গাতো আখেরাতে অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাত। জান্নাত এমন জিনিস যা শুধু জীবনের বিনিময়েই লাভ করা যায়। মানুষের জীবনই জান্নাতের একমাত্র মূল্য। মানুষ যদি নিজের অস্বিত্বকে বিলীন করে না দেয়, তাহলে সে আর অন্য কিছুর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে পারবে না।

ঈমানদারদের সঙ্গে পয়গম্বরদেরকে যে রকম সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অন্যান্য মুসলিম নেতাদেরও জনসাধারণের সঙ্গে সেরকম আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নেতা অবশ্যই কোমল হৃদয় এবং নম্রভাষী হবেন। এ নম্রতা শুধু দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রেই কাম্য নয়; বরং মুসলমানরা যদি ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে নেমে নেতার কোনো নির্দেশ অমান্য করে আর এ কারণে বিজয় লাভ করা যুদ্ধ পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তবুও তাদের সাথে নম্র আচরণ করতে হবে। নেতাদের মাঝে এই করুণা ও মহত্ত্ব সৃষ্টি না হলে শক্তিশালী সমাজ ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

অন্যায় যত বড়ই হোক না কেনো, যদি তাকে অন্যায় মনে করা হয় তাহলে তা ক্ষমার যোগ্য। শর্ত হলো, সেই অন্যায়কে অপছন্দ করতে হবে। নেতাদের উচিত এ জাতীয় সকল অন্যায়কে ভুলে গিয়ে জনগণের সঙ্গে নম্র আচরণ করা। সে জনগণের এতটাই কল্যাণকামী হবে যে, তাদের জন্য তার মন সব সময় দোআ করতে থাকবে। সে জনগণকে এতো সম্মান করবে যে, যে কোনো কাজে তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে করবে।

যখন মানুষের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, যা কিছু হয় আল্লাহর নির্দেশেই হয় তখন মানুষ অপরের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সহজে ক্ষমা করতে পারে এবং তার সাথে নম্র আচরণ করতে পারে।

সবক : ৮৯
দীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত বিষয়

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○ وَ الَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْبَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ○

সুতরাং তুমি আহবান করো এবং দৃঢ় থাকো যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছো। তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই কাছে।

আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়ার পর আল্লাহ সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে, তাদের দলীল-প্রমাণ তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।[৮৮]

ব্যাখ্যা : এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সঠিক দীন যা পয়গম্বরদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। খেয়াল-খুশির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের আবিষ্কৃত মতাদর্শ ও বিদআত। পয়গম্বরদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দীনের ওপর দৃঢ় থাকো। মানুষের আবিষ্কৃত দীনের অনুসরণ করো না। তোমাদের কাজ হলো ইনসাফ করা। অর্থাৎ মানুষের মতোবিরোধের ফায়সালা করে বলে দেওয়া এটা হক ওটা বাতিল, দীনের এই অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর ওই অংশ মানুষ দীনের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

'আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোনো ঝগড়া নেই' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা ঝগড়া করলেও আমরা তোমাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হবো না। তোমরা আমাদেরকে শত্রু ভাবলেও আমরা তোমাদের শত্রু ভাববো না। দাঈর

---

[৮৮] সূরা শুরা, আয়াত: ১৫-১৬

দায়িত্ব হকের বাণী পৌঁছে দেয়া। এ ছাড়া সবকিছু আল্লাহর দায়িত্বে ন্যাস্ত, আল্লাহই উত্তম ফয়সালাকারী।

হকপন্থীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা গালমন্দ করা অনেক বড় জুলুম। যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আখেরাতে আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখী হবে এবং তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

সবক : ৯০

ভ্রান্তির পক্ষেও দলিল থাকে

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ○ وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ○

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ করো।

তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেনো এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যাতে তারা তা পছন্দ করে, আর তারা যে অপকর্ম করে তাই যেনো তারা করতে থাকে।[৮৯]

ব্যাখ্যা : ইবনে জারীর হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মজলিসে শরীক হলাম। এটা একটা দীর্ঘ মজলিস ছিলো। হুজুর বললেন, হে আবু যর! তুমি কী নামায পড়ে নিয়েছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! না। তিনি বললেন, ওঠো এবং দু রাকাত নামায পড়ো। হযরত আবু যর রা. নামায পড়ে পুনরায় মজলিসে এসে বসলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু যর! তুমি কি জীন এবং মানুষ শয়তানের মোকাবিলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! না। মানুষের মাঝেও কি শয়তান

---

[৮৯] সূরা আনআম, আয়াত: ১১২-১১৩

থাকে? তিনি বললেন,

نَعَمْ هُمْ شَرٌّ مِّنْ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ

হ্যাঁ, তারা জীন শয়তান থেকেও অধিক খারাপ।[৯০]

এখানে মানুষ শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সমস্ত লোক, যারা হকের দাওয়াতকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার চেষ্টায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। এরা ওইসব লোক যারা নিজের আবিষ্কৃত ধর্ম অনুযায়ী সমাজে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। যখন হকের দাওয়াত আসে, তখন তারা নিজেদের অর্জিত সম্মান ও মর্যাদা হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তারা ভাবে হকের দাওয়াত তাদেরকে বিবস্ত্র করে দিচ্ছে। অর্থাৎ তাদের গোমর ফাঁস করে দিচ্ছে। হক স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের জন্য সোজা রাস্তা হলো হক মেনে নেওয়া। কিন্তু নিজেদের অর্জিত মান-মর্যাদা তারা হারাতে চায় না। তাই তারা দাঈ এবং তার দাওয়াতকে সন্দেহযুক্ত প্রমাণ করার পেছনে লেগে যায়। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা চিত্তাকর্ষক শব্দাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা দাঈ এবং তার দাওয়াতের মাঝে এমন ছিদ্র খুঁজে বের করে, যার যদিও কোনো বাস্তবতা নেই; কিন্তু অনেক লোক তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়।

পৃথিবী মানুষের পরীক্ষার জায়গা। তাই হকের পক্ষে যেমন দলিল থাকে মিথ্যা বা ভ্রান্তির পক্ষেও দলিল থাকে। হকের দাঈ যেমন হককে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করতে পারে, প্রবৃত্তি পূজারীরও হকের বিরুদ্ধে এমন কিছু চমকপ্রদ শব্দ বলতে পারে যেগুলোকে দেখে দলীলের মতো মনে হয়। মানুষের কর্তব্য হলো প্রকৃত দলিল চেনা এবং ভ্রান্তির পক্ষে দলিল হিসেবে যা সামনে আসে তার অসারতা বুঝে সত্যকে গ্রহণ করা। দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা; তাই ভ্রান্তির পক্ষে সব সময়ই কিছু দলিল থাকে, এই অবস্থা কিয়ামত পর্যন্তই বাকী থাকবে।

সারকথা হলো সত্য দলিল প্রমাণ এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তার মাঝে পার্থক্য করতে পারা এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তাকে প্রতিহত করে সত্য দলিল গ্রহণ করা মানুষের দায়িত্ব। এখানেই তার পরীক্ষা হয়।

মানুষ শয়তানগুলো নিজের মেধা-বুদ্ধির বদৌলতে হকের বিপরীতে প্রতারণাপূর্ণ যে সকল কথাবার্তা বের করে তা ওই সমস্ত লোকদেরকেই প্রভাবিত করে যারা আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন এবং পরকালের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত।

পরকালের শাস্তির ভয় মানুষকে সর্তক বানিয়ে দেয়। যে সর্তক থাকে তার থেকে কখনো বাস্তবতা গোপন থাকে না। কিন্তু যারা পরকাল থেকে উদাসীন,

---

[৯০] তাফসীরে ইবনে কাসীর

তারা হক বাতিল চেনার চেষ্টা করে না। গভীর চিন্তা ভাবনা করে না। এ জন্যই তারা অসার কথাবার্তা আর দলীল-প্রমাণের পার্থক্যও বুঝতে পারে না।

সবক : ৯১

আল্লাহ মানুষকে হক ও বাতিল চেনার যোগ্যতা দিয়েছেন

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَه سُوْءُ عَمَلِه فَرَاٰهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে ভালো মনে করে, সে কি তার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন; অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।[৯১]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের এই যোগ্যতা কাজে লাগায়, সে হেদায়াত লাভ করে আর যে ব্যক্তি নিজের এই যোগ্যতা কাজে লাগায় না, সে হেদায়াত লাভ করতে পারে না।

মানুষের সামনে যখন হক আসে তখন তাৎক্ষণিকভাবে তার অন্তরে একটা ধাক্কা লাগে। তার সামনে তখন দুটি রাস্তা থাকে। যদি সে হককে মেনে নেয় তাহলে তার মেধা ও বুদ্ধি সঠিক রাস্তায় চলতে শুরু করে। সে হকপন্থী হয়ে যায়। এর বিপরীতে যদি কোনো স্বার্থ অথবা প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনায় সে হককে স্বীকার না করে, তাহলে তার মেধা ও বুদ্ধি নিজের অস্বীকারকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। নানা অসার দলিল প্রমাণ তার সামনে হাজির করতে থাকে।

নিজের মন্দ আমলকে ভালো আমল হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা একটা মানসিক রোগ। যারা এই রোগে আক্রান্ত হয় তারা কখনো হককে স্বীকার করতে পারে না। বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর কাছে চলে যায়। যাতে তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে পারে।

---

[৯১] সূরা ফাতির, আয়াত: ৮

সবক : ৯২

আল্লাহর দৃষ্টিতে জীবিত কে

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَه نُوْرًا يَّمْشِىْ بِه فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُه فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذٰلِك زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ وَكَذٰلِك جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَة اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ○ وَ اِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَة قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ○

যে ছিলো মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মতো যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করা হয়।

এভাবে আমি প্রতিটি জনপদে সেখানকার অপরাধীদের প্রধানকে চক্রান্ত করার সুযোগ দিয়েছি; তারা শুধু নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে; অথচ তারা বুঝতে পারে না।

যখন তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তারা বলে, আমরা কখনই ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে তার অনুরূপ দেয়া হয়। আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তার রিসালাত অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্তের জন্য অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আক্রান্ত করবে লাঞ্ছনা ও কঠোর আযাব।[৯২]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর দৃষ্টিতে ওই ব্যক্তি জীবিত, যার সামনে হেদায়াতের জ্যোতি এসেছে আর সে তা নিজের রাস্তার আলো হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে আর মৃত ওই ব্যক্তি, যে হেদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে বাতিল অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এরকম মৃত ব্যক্তি কল্পনা-জল্পনা এবং গোঁড়ামির জালে এতটাই ফেঁসে যায়

---

[৯২] সূরা আনআম, আয়াত: ১২২-১২৪

যে, বাস্তবতা কী সে বুঝতে পারে না। সে মূল জিনিস থেকে বেখবর থাকে। অসার দলিল আর শক্তিশালী দলিলের মাঝে সে তারতম্য করতে পারে না। সে নিজের বড়ত্বে কল্পনায় এতটাই ডুবে যায় যে, অন্য কারো পক্ষ থেকে আগত সত্যকে স্বীকার করে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার অন্তরের উপর প্রথাগত ধ্যন-ধারণা এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করে রাখে যে, সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো মানদণ্ডের ওপর সে কোনো কিছুকে যাচাই করতে চায় না। নিজের এ দুর্বলতার কারণে সে অন্ধকারের মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকে। বাহ্যত জীবিত হওয়া সত্ত্বেও সে একজন মৃত মানুষে পরিণত হয়।

এর বিপরীতে যে ব্যক্তি হেদায়াতের জন্য নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়, সে সব ধরনের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকে। সত্যকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। সে বিন্দুমাত্র সময়ও অপচয় করতে চায় না। চমকপ্রদ শব্দমালা তার কাছে বাস্তবতা গোপন করতে পারে না।

সত্যকে গ্রহণ করে নিতে সে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগে না। অলসতা করে না। সে নিজেও হকের আলোতে চলতে শুরু করে এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালানোর চেষ্টা করে।

যারা নিজেদের আবিষ্কৃত মতাদর্শ বা কাজকে আল্লাহর ধর্ম বলে এবং সেই ধর্ম পালন করে সমাজে শ্রদ্ধাভাজন হয়, তাদের কাছে সত্য ধর্মের দাওয়াত এলে তারা সত্য ধর্মের শত্রু হয়ে ওঠে। সত্য ধর্মের প্রতিটি আওয়াজকেই তারা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য বিপদজনক মনে করে।

হকের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা এমন কিছু কথা ছড়িয়ে দেয় যা জনসাধারণকে হক সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। তারা দাঈকে ব্যক্তিগত আক্রমণেরও চেষ্টা করে। তার বিরুদ্ধে বানোয়াট বদনাম ছড়িয়ে তাকে অপদস্থ করতে চায়। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তেমন লাভ হয় না। তাদের আফসোস ও হাহুতাস আরও বেড়ে যায়। দাঈ এবং দাওয়াতের কোনো ক্ষতিই তারা করতে পারে না।

হকের প্রকৃত অনুসারী তারাই, যারা হককে সে সময় গ্রহণ করে যখন হক গ্রহণের সঙ্গে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের কোনো সম্পর্ক না থাকে। যখন হক গ্রহণের সঙ্গে দুনিয়ার শান শওকত অর্জনের কোনো সম্পর্ক না থাকে। পার্থিব স্বার্থে কেউ যদি হক গ্রহণ করে, তাহলে সে তো পার্থিব স্বার্থেরই পুজা করলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্যকে সত্য মেনে আল্লাহর আনুগত্য করলো না।

সবক : ৯৩

পবিত্রাত্মাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّه يَجْعَلْ صَدْرَه ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ○ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষ সঙ্কীর্ণ–সঙ্কুচিত করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন।

আর এ হচ্ছে তোমার রবের সরল পথ। আমি তো বিস্তারিতভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির আবাস এবং তারা যে আমল করতো, তার কারণে তিনিই তাদের অভিভাবক।[৯৩]

ব্যাখ্যা : হক এতটাই সুস্পষ্ট হয় যে, এটা বোঝা মানুষের জন্য কঠিন হয় না। তারপরও প্রত্যেক যুগেই অসংখ্য মানুষ হক গ্রহণ করে না। এর কারণ হলো, কুপ্রবৃত্তি তাকে হক গ্রহণ করতে বাঁধা দেয়। কেউ কেউ সমাজে পবিত্রাত্মা হিসেবে পরিচিত কোনো বুযুর্গের সঙ্গে এতো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে যে তাকে ছেড়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করলে তার কাছে মনে হয়, তাকে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ তার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ওই কথিত পবিত্রাত্মার কারণে সে হক থেকে দূরে থাকে। কেউ কেউ নিজের স্বার্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিন্তায় হকের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ ভাবতে থাকে যে, যদি হককে মেনে নেই তাহলে নিজের মান সম্মানকে নিজের হাতেই ধ্বংস করে দেয়া হবে। আবার কেউ কেউ ভাবে, পুরো সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে যদি আমি হক গ্রহণ করি, তাহলে আমার সমাজে আমাকে অপরিচিতের মতো বসবাস করতে হবে। আমি একা হয়ে যাবো

---

[৯৩] সূরা আনআম, আংাত: ১২৫-১২৭

এভাবে বিভিন্ন ধরনের ধ্যান-ধারণা মানুষের অন্তরে উদয় হতে থাকে। কুপ্রবৃত্তি মানুষকে বোঝায়, হক মেনে নেয়ার মানেই সীমাহীন কষ্টে নিপতিত হওয়া। মানুষের মন তখন সংকীর্ণ হয়ে যায়।

এর বিপরীতে যারা কুপ্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে না, যারা হককে অন্য সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় এবং উত্তম মনে করে, তারা যখন সত্যকে নিজেদের সামনে দেখতে পায়, তখন বিলম্ব না করেই তাকে সত্য হিসেবে চিনে নেয় এবং সকল ওজর, আপত্তি ও শঙ্কা উপেক্ষা করে সত্যকে গ্রহণ করে নেয়।

আল্লাহ তাআলা হককে চেনার জন্য অনেক নিদর্শন মানুষের সামনে পেশ করেন। যারা দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী তারা নিদর্শনগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে। আর যারা হক গ্রহণ করার মতো আত্মিক শক্তির অধিকারী তারা নিদর্শনগুলো দেখে সত্য হিসেবে চিনতে পারে এবং সত্যের ওপর তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। তাদের জীবন ওই সোজা রাস্তায় চলতে থাকে যে পথে আল্লাহ তাআলা চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর এভাবে চলতে চলতে মানুষ চিরস্থায়ী সফলতার জায়গায় পৌঁছে যায়।

আল্লাহর নিকট একমাত্র আমলেরই মূল্য রয়েছে। অন্য কোনো কিছুই তার কাছে মূল্যবান নয়। যে ব্যক্তি আমলীভাবে আল্লাহর আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার সহযোগিতা করবেন এবং তাকে নিজের শান্তির ঘর জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। এই শান্তির ঘর আল্লাহর জান্নাত। আল্লাহর এই পুরস্কার মানুষ নিজের আমল অনুযায়ী মৃত্যুর পরের জীবনে লাভ করবে। মানুষের একটি বিরাট দল দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগত হয়ে গেলে তাদের দুনিয়ার জীবনও শান্তিতে ভরে উঠবে।

সবক : ৯৪
শয়তানের ধ্বনি বেশি আকর্ষণীয়

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَ قَالَ اَوْلِيٰٓـؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ○ وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ○ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ○

আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন, সেদিন বলবেন, হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা পৌঁছে গিয়েছি সে কালে, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলবেন, আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে; যদি না আল্লাহ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চই তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

এভাবেই তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি জালিমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু বানিয়ে দেই।

হে জিন ও মানুষের দল, তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা বলবে, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিলো এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিলো কাফির।

তা এই কারণে যে, তোমার রব জুলুমের কারণে জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না তার অধিবাসীরা গাফিল থাকা অবস্থায়।[৯৪]

---

[৯৪] সূরা আনআম, আয়াত: ১২৮-১৩১

ব্যাখ্যা : কেউ পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে যখন অন্য আরও মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন শুধু এক জনের বিচার হয় না। উভয়েই ভাবে যে, সে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। শয়তান যখন লোভ দেখিয়ে মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং সে নিজের চ্যালেঞ্জকে সঠিক প্রমাণ করতে চায় যা সে সৃষ্টির শুরু লগ্নে আল্লাহকে দিয়েছিলো, 'আমি তোমার সৃষ্টিজীবের এক বড় অংশকে আমার দলের অন্তর্ভূক্ত করে নেবো।'

অন্যদিকে যারা নিজেরা নিজেকে শয়তানের কাছে সোপর্দ করে দেয় তাদের সামনেও স্পষ্ট ফায়দা থাকে। কিছু লোক জিনদের ব্যবহার করে নিজের জাদু বিদ্যার বিক্রি বাড়ায়। কেউ কেউ কাব্যচর্চা এবং ভাগ্য গণনাকে কোনো জিন উস্তাদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জনগণের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এমনিভাবে ওই সমস্ত আন্দোলন যা শয়তানের প্ররোচনায় গড়ে ওঠে, তার সমর্থকরাও ওই সব মতাদর্শকে সমর্থন দেয় জনগণের উপর নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর আহ্বানের বিপরীতে শয়তানের ধ্বনি সর্বদাই বেশি আকর্ষনীয় হয়।

কিয়ামতের দিন যখন বাস্তবতা সামনে চলে আসবে, তখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যে সকল লোক পথহারা হয়েছে অথবা যারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করেছে, তারা কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটি করেনি। তারা জেনে বুঝেই হককে উপেক্ষা করেছে। হক সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে হক গ্রহণ করতে পারে নি এমন নয়।

তারা পার্থিব রঙ তামাশা ছাড়তে চায়নি। তারা সাময়িক নেতৃত্বকে হারাতে চায়নি। আল্লাহ তাআলা নিজের বিশেষ বান্দাদের মাধ্যমে যে হেদায়াতের বাণী প্রচার করেছেন তা এতো সুস্পষ্ট ছিলো যে, কোনো ব্যক্তিই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বেখবর থাকার কথা নয়; কিন্তু তাদের দুনিয়ামুখীতা তাদের চোখের পর্দা হয়েছে। জানা সত্ত্বেও তারা না জানার এবং শোনা সত্ত্বেও না শোনার ভাণ করেছে।

পরকালে ওই সমস্ত কাল্পনিক নির্ভরতা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে যেগুলোর বলে বলিয়ান হয়ে তারা বাস্তবতা থেকে বেপরোয়া হয়ে আছে। তখন তাদের চোখ খুলবে। তারা তখন এগুলো ভেবে আফসোস করবে যে, হক তাদের সামনে এসেছিলো কিন্তু তারা মিথ্যা কথাবার্তা বলে হককে এড়িয়ে গেছে। কতো ভাবে তাদের ভ্রান্তি তাদের সামনে স্পষ্ট করা হয়েছে; কিন্তু সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করে তারা ভেবেছে যে, তারা নিজেদের মনগড়া মতাদর্শকে হক প্রমাণ করতে পেরেছে।

সবক : ৯৫

মু'জিযা দেখিয়ে মুগ্ধ করার নাম দীন নয়

وَ اِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَة قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَة لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○ وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَه وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَة وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ○ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِه وَ يُسَبِّحُوْنَه وَلَه يَسْجُدُوْنَ○

যখন তুমি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না করো, তখন তারা বলে, তুমি কেনো নিজেই একটি নিদর্শন বানিয়ে নাও না? বলো, আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আর তা হিদায়াত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।

যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

তুমি মনে মনে নিজের রবকে স্মরণ করো সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

নিশ্চয় যারা তোমার রবের নিকট আছে তারা তার ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে না; তার তাসবীহ পাঠ করে আর তার জন্যই সিজদা করে।[৯৫]

ব্যাখ্যা : মক্কার লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো , যদি তুমি আল্লাহর পয়গম্বর হও তাহলে আল্লাহর নিকট থেকে কোনো মু'জিযা[৯৬] কেনো নিয়ে আসছো না? আল্লাহর জন্যও তাদের সামনে কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা খুব সহজ ছিলো। কিন্তু এর ফলে দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

---

[৯৫] সূরা আরাফ, আয়াত: ২০৩-২০৬

[৯৬]. অলৌকিক বিষয়, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

যেমন ধরুণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আধুনিক ডিজাইনের একটি মটরগাড়ি যদি নেমে আসতো, সেই গাড়িতে বড় বড় সাউন্ডবক্স সেট করা থাকতো এবং তিনি তাতে করে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে তাবলীগ করতেন, তাহলে দেড় হাজার বছর পূর্বে এমন একটি গাড়ি মানুষের জন্য খুবই বিস্ময়কর মু'জিযা হতো, কিন্তু মানুষের মনোযোগ আসল বিষয় থেকে সরে যেতো। আসল উদ্দেশ্য তো আল্লাহর বাণী মানুষের সামনে পেশ করা এবং মানুষ নসীহত গ্রহণ করে কি না তা পরীক্ষা করা। উল্লিখিত মু'জিযা দেখার পর ভালো মন্দ নির্বিশেষে সব মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো দীন গ্রহণ করতো। পরীক্ষা আর বাকি থাকতো না।

কারামত বা মু'জিযা দেখিয়ে মুগ্ধ করা দাওয়াতের উদ্দেশ্য নয়। দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষ আল্লাহর বাণী বুঝবে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সত্য বুঝেই সত্যকে গ্রহণ করবে। আল্লাহর সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব তার মনে প্রাণে এভাবে বসে যাবে যে, তার মধ্যে বিনয় ও ভীতি সৃষ্টি হবে। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তার হৃদয় প্রকম্পিত হবে।

শেষ আয়াতে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদের সঙ্গ পেতে চাইলে তোমরাও এমন করো। মানুষ যখন নিজেকে হঠকারিতা থেকে পরিশুদ্ধ করে, তখন তার অন্তর সবসময় আল্লাহর স্মরণে জাগরুক থাকে। তখন তারা ফেরেশতাদের থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে চলে যায়। এ পৃথিবীতে কোনো মানুষের সর্বোচ্চ উন্নতি হলো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত হওয়া। তারা দুনিয়াতে থেকেও ফেরেশতাদের মতো সুন্দর ও পবিত্র জীবনযাপন করে।

সবক : ৯৬

অন্তরের আওয়াজ আল্লাহরই আওয়াজ

فَطَوَّعَتْ لَه نَفْسُه قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَه فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَه كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ○

তার নফস তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উত্তেজিত করলো। ফলে সে তাকে হত্যা করলো এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিলো, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বললো, হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করবো। ফলে সে লজ্জিত হল।[৯৭]

ব্যাখ্যা : দুনিয়াতে যার যা আছে সবকিছু আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। এ জন্য কাউকে ভালো অবস্থায় দেখে নিজের অন্তরে জ্বলন সৃষ্টি হওয়া এবং তার ক্ষতির আকাঙ্খা করা যেনো আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিপরীত কিছু করার চেষ্টা। এ ধরনের মানুষ যদিও পরীক্ষার দুনিয়ায় একটা সীমা পর্যন্ত ভোগ বিলাসের সুযোগ পায়; কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে সে জঘন্যতম অপরাধী।

হাবিল নিজের বড় ভাইকে এই বাস্তবতার দিকেই মনোযোগী করার চেষ্টা করেছে। কাবিলের অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে সে অকারণে নিজের ভাইকে হত্যা করতে চাচ্ছে। কিন্তু তারপরও তার বিদ্বেষের আগুন ঠাণ্ডা হয়নি। তার নফস তার সামনে ভ্রাতৃহত্যার বৈধতার পক্ষে নানা যুক্তি হাজির করে। অবশেষে সে তার আভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিজের মনগড়া যুক্তির মাধ্যমে দূর করলো এবং আপন ভাইকে হত্যা করে ফেললো। অন্তরের আওয়াজ আল্লাহর আওয়াজ। অন্তরের মাঝে কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার মানেই হলো মানুষের পরীক্ষার মাঠে দাঁড়ানো। মানুষ যদি নিজের মনের ডাকে সাড়া দেয় তাহলে সে সফল হলো আর যদি সে মিথ্যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে অন্তরের আওয়াজকে চাপা দেয় তাহলে সে ব্যর্থ হয়ে গেলো।

হাদীস শরীফে আছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন গুনাহ যার শাস্তি এ দুনিয়া থেকেই শুরু হয়ে যায়। কাবিল নিজের ভায়ের ওপর যে অত্যাচার

---

[৯৭] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩০-৩১

ও অবিচার করেছিলো তার শাস্তি সে শুধু আখেরাতেই পাবে তাই নয়, বরং এ দুনিয়াতেই তার শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

হযরত মুজাহিদ ও জুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত আছে, হত্যার পর কাবিলের পায়ের গোছা রানের সঙ্গে মিশে যায়। সে নিঃসঙ্গ ও সাহায্যহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতো। অবশেষে এরকম লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় দুঃখ-কষ্ট সয়ে সে মৃত্যুবরণ করে।[৯৮] তার মুখমণ্ডল সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সূর্যের সঙ্গে সে ঘুরতে থাকতো। অর্থাৎ সূর্য যেদিকে যেতো সেদিকেই তার মুখ ঘুরে যেতো।

কাবিলকে কাকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমার ভায়ের মরদেহ মাটির নিচে দাফন করো। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে এ কথাও বোঝা গেছে যে, মানুষ প্রকৃতির নিয়ম কানুন একটা প্রাণীর চেয়েও কম জানে। এতদসত্ত্বেও যদি সে অহংকার করে, নিজেকে মহাজ্ঞানী মনে করে, তাহলে তার চেয়ে জালিম আর কেউ হতে পারে না।

এখানে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যদি অপরাধ করার পূর্বেই অপরাধের ইচ্ছাকে নিজের বক্ষের মাঝে দাফন করে দেয়, তাহলে আর তাকে এর জন্য লজ্জিত হতে হবে না।

মানুষের উচিত অন্তরের অনুভূতিকে অন্তরের মাঝেই দাবিয়ে দেওয়া। ইচ্ছাটাকে অন্তরের বাইরে এনে সংঘটিত হতে না দেয়া। মন্দ চিন্তাকে অন্তরের বাইরে বেরিয়ে আসার পূর্বেই দাফন করতে হয়; সে যদি এটাকে বাইরে বের হতে দেয় তাহলে পরবর্তীতে সে একটি জীবিত মানুষের 'লাশ' দাফন করার সমস্যায় পড়বে। যা দাফন হওয়ার পরও আল্লাহর নিকট দাফন হবে না।

---

[৯৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর

সবক : ৯৭

ক্ষমতা পেয়ে মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُه فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ○ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَه فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الظّٰلِمِيْنَ○ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّة يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَة لَا يُنْصَرُوْنَ○ وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَة وَ يَوْمَ الْقِيٰمَة هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ○ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَة لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ○

আর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিলো এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।

অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখো জালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিলো?

আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম; তারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো; কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

এ যমীনে আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

আর অবশ্যই আমি পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করার পর মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৯৯]

ব্যাখ্যা : হযরত মুসা আ. এর আন্দোলন ছিলো প্রতিটি মানুষের মাঝে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন আনা অর্থাৎ মানুষ যেনো আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে পৃথিবীতে জীবনযাপন করে। তার এই বাণী সকলের জন্য ছিলো; ওই ব্যক্তির জন্যও যে রাজ্যের সিংহাসনে বসে ছিলো।

নেতৃত্ব বা ক্ষমতা পেয়ে মানুষ অহঙ্কারী হয়ে যায়। ফেরাউনও অহঙ্কারী ছিলো। হযরত মুসা আ. ফেরাউনকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন, যদি তুমি

---

[৯৯] সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৯-৪৩

অহঙ্কারীর মতোই জীবন যাপন করে যাও তাহলে তোমার ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। কিন্তু ফেরাউন নসীহত গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়।

সবক : ৯৮
দুনিয়ায় সবারই ভুল হয়

هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا○ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُه عَلٰى نَفْسِه وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا○ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِه بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا○ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُه لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا○

দেখো, তোমরাই তো তারা, যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছো; কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে কে বিতর্ক করবে? কিংবা কে হবে তাদের উকীল?

যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।

আর যে পাপ কামাই করে, সে তো নিজের বিরুদ্ধেই তা কামাই করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কেউ কোন অপরাধ বা পাপ করে অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর তা আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করে।

তোমার ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার দয়া না হতো তবে তাদের মধ্য থেকে একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিলো! আর তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করে না এবং

তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।[১০০]

ব্যাখ্যা : দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। এখানে সব মানুষই ভুল করে থাকে। আল্লাহর সাথে মু'আমালার ক্ষেত্রেও ভুল করে এবং বান্দার সাথে মু'আমালার ক্ষেত্রেও করে। যখন কারো থেকে কোনো ভুল হয় তখন তার উচিত নিজের ভুলের ওপর লজ্জিত হওয়া। আল্লাহর দিকে আরো অধিক আগ্রহের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহর নিকট দরখাস্থ করা, তিনি যেনো তার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন এবং আগামীতে তাকে নেককাজ করার তাওফীক দান করেন। যখন কোনো ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় তখন আল্লাহ তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে দীনি অনুভূতিকে জাগ্রত করে দেন এবং তাকে পূর্বের চেয়ে আরো অধিক সর্তকতার সঙ্গে জীবন যাপনের তওফিক দান করেন।

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ অন্যায় করার পর নিজের অন্যায়কে অন্যায় বলেই স্বীকার করতে চায় না; বরং নিজের ভুলকেই সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু করে। সে নিজের সাথী সঙ্গীদের সহযোগিতায় ওই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে যারা তাকে তার ভুল সম্পর্কে হুশিয়ার করছে। যারা নিজের অন্যায়ের ওপর এভাবে অহংকার করে এবং যারা তার সঙ্গ দেয় তারা সবাই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম অপরাধী। তারা নিজেদের অন্যায় গোপন করার জন্য যে সব জিনিসকে মাধ্যম বানায় তা আখেরাতে একেবারেই অকার্যকর ও অনর্থক প্রমাণিত হবে। যাদের ভরসায় তারা অহঙ্কার করে, কেয়ামতের দিন তারা তাদের কোনো কাজে আসবে না।

- একব্যক্তি কারো সম্পদ চুরি করলো। যখন ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলো, তখন সে তার চুরিকৃত সম্পদ অন্যের ঘরে রেখে এসে বললো যে, অমুক চুরি করেছে।

- একব্যক্তি কোনো নারীর সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করতে চাইলো; কিন্তু ওই সতি-সাধ্বী রমনী তার প্রস্তাবে রাজি হলো না, তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ওই নারীর নামে বদনাম রটাতে লাগলো।

- দু'জন লোক মিলে একটা কাজ শুরু করলো। এরপর একজন ভাবলো যে, তার ব্যক্তি স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে। সে কৌশলে ওই কাজটি বন্ধ করে দিলো। এরপর সে প্রচার করলো যে, এই কাজ তার পার্টনারের কারণে বন্ধ হয়েছে। সে এর

---

[১০০] সূরা নিসা, আয়াত: ১০৯-১১৩

দায়ভার দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিলো।

এ সবগুলোই হলো নিজের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা। এই সকল প্রচেষ্টা শুধু মানুষের অপরাধই বৃদ্ধি করে। কেয়ামতের দিন এসব কৌশল তাকে দায়মুক্ত করতে পারবে না।

আল্লাহর সবচে বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি হেদায়াত ও ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে বুঝিয়েছেন, অপরাধ করার পর নিজের অপরাধ মেনে নাও। নিজের অন্যায় স্বীকার করে নাও। তর্কবিতর্ক করে নিজেকে সাধু প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। সাথী সঙ্গীদের শক্তির উপর গর্ব করে মানুষের সাথে অন্যায় করো না। আল্লাহকে ভয় করে বিনয়ী হও। কারো বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলে নিজেকে সফল ভেবে খুশি হয়ো না; বরং আল্লাহর নিকট দোয়া করো, তিনি যেনো তোমাকে জালিম হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

সবক : ৯৯

নিজের স্বার্থ ও ইনসাফ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا○

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের, পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।[১০১]

ব্যাখ্যা : মানুষের সামনে এমন অনেক মু'আমালা আসে যেখানে একদিকে থাকে তার নিজের জন্য উপকারী ও লাভজনক পথ আর অন্যদিকে থাকে হক এবং ইনসাফের পথ। যারা আল্লাহর থেকে গাফেল হয়ে যায়, যাদের মনে এই বিশ্বাস নেই যে, আল্লাহ তাআলা সর্বদা তাদের দেখছেন, তারা এ সব ক্ষেত্রে

---

[১০১] সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫

নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে ধোঁকার পথে চলতে শুরু করে। তারা ভাবে হকের পরওয়া না করে মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ ও ফায়দা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াই সফলতা। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা সর্বদাই ইনসাফের প্রতি লক্ষ রাখে। হক ও ইনসাফের দাবি অনুযায়ীই তারা কাজ করে। তারা সর্বদাই চেষ্টা করে যেনো তাদের মৃত্যু কারো সঙ্গে বেইনসাফী করার আগে হয়। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে।

তাদের ন্যায় ও ইনসাফ এতোটাই পছন্দ করে যে কোনো অন্যায় দেখেও সহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যখনই কোনো অন্যায় বা বেইনসাফির ঘটনা তাদের সামনে ঘরে, তারা সত্য ও ইনসাফের ঘোষণা দিতে দেরি করে না। এ কারণে যদি তাদের নিকত্মায়ীদের সঙ্গে সম্পর্কে ভাটা পড়ে অথবা তাদের নিজেদের স্বার্থ নষ্ট হয় তবুও তারা ন্যায়ের কথা বলে। তারা মুখ খোলে শুধু আল্লাহর জন্য; তাই ন্যায়ের ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কাউকে পরোয়া করে না।

শক্তিশালী ব্যক্তিকে তার অধিকার দেয়া আর দুর্বলকে অধিকার না দেয়াও জুলুম। মুমিন ওই ব্যক্তি যে সকলের সঙ্গেই ইনসাফ করে। চাই সে শক্তিশালী হোক বা দুর্বল।

যখন কোনো ব্যক্তি অন্যায়ের সহযোগিতা করে তখন সে এ কথা বলে না যে, আমি অন্যায় ও অন্যায়কারীর সহযোগিতা করছি বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছি; বরং সে নিজের বেইনসাফীকেই ইনসাফ হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে। সে নিজের অন্যায়কে এমন ভাষায় উপস্থাপন করে যে, শুনে মনে হয় সে ঠিকই করছে সে ন্যায়ের পক্ষেই আছে। যার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে সে এমন আচরণেরই উপযুক্ত।

কিছু মানুষ জুলুম বা বেইনসাফি দেখে নিরবতা অবলম্বন করে। পাশ কেটে চলে যেতে চেষ্টা করে। কোনো প্রতিবাদ করে না। এ ধরনের কাজ যারা করে তারা আসলে আল্লাহকে নিজের সংরক্ষক মনে করে না।

সবক : ১০০

অন্যের নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত ছিলো না তারা

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا○ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا○ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا○ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا○

কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যা তোমার নিকট তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে। তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দেয়। আর আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তারা চূড়ান্তভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং সীমালংঘন করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাবেন না।

জাহান্নামের পথ ছাড়া; তারা তাতে স্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর জন্য সহজ।

হে মানুষ, অবশ্যই তোমাদের নিকট রসূল এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি কুফরী করো, তবে নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে, তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১০২]

ব্যাখ্যা : রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সময় ইহুদিরা পৃথিবীতে আসমানি ধর্মের প্রতিনিধির মর্যাদায় সমাসীন ছিলো। তারা ধর্মের বড় বড় পদে বসে ছিলো। তারা নিজেরা ছাড়া অন্য কেউ ধর্মীয় নেতা হয়ে যাবে এটা তারা মেনে নিতে পারে নি। তাই তারা এটা মানতে অস্বীকার

---

[১০২] সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৬-১৭০

করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের নিকট তার বাণী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তারা ভাবতো, আমরাই দীনের ঠিকাদার। সুতরাং আমরা তাকে সত্য বলে মেনে না নিলে অন্যরাও তাকে মানবে না। তারা ভুলে গিয়েছিলো যে, এই পৃথিবী আল্লাহর। যার সত্যতার পক্ষে আল্লাহ দলিল প্রমাণ পেশ করেন, তাকে কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে না। আল্লাহ এবং তার পুরো সৃষ্টিজগত আল্লাহর নবীর সঙ্গে থাকে। তাকে সহযোগিতা করে।

যারা আল্লাহর আহ্বান থেকে বিমুখ হয়ে থাকে, আল্লাহর দীন মানতে অস্বীকার করে এবং জনগণকে দীন মানতে বাধা প্রদান করে, তারা সঠিক পথ ও সফলতা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তারা এমন সব কথা বলে, গোটা জগতের কাছে যা প্রত্যাখ্যাত। তারা এমন এক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে যে পরিকল্পনা করেছেন আসমান ও যমীনের মালিক। সেই সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে গিয়ে সফলতা লাভ করার স্বপ্ন দেখার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কী হতে পারে। এই লোকগুলো দীনের নামে সবচে বড় অধার্মিকতার কাজ করে। তারা প্রতিনিয়ত হক থেকে আরও বেশি দূরে চলে যেতে থাকে। এক সময় তারা চিরস্থায়ী অশান্তির গর্তে গিয়ে পতিত হয়।

আল্লাহর দাওয়াত অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আল্লাহর দাওয়াত এত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের সঙ্গে দুনিয়াতে এসেছে যে, তার সত্যতা কারো কাছে গোপন বা অস্পষ্ট থাকে না। তাই যারা আল্লাহর দাওয়াত এবং দলিল প্রমাণ সামনে আসার পরও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তারা আসলে অহংকার ও অহমিকার কারণেই এমন করে। আর অহংকার আল্লাহর নিকট সবচে বড় অপরাধ ও পাপ।

মানুষ যদি নিজের মনের জানালা খুলে রাখে, তাহলে আল্লাহর আহ্বানকে অবশ্যই সে সত্য হিসেবে চিনতে পারবে। সে উপলব্ধি করতে পারবে যে হক মানুষের কথার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। তাই আল্লাহ তাআলা প্রকৃত সত্য ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেছেন। এটা আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। কোনো কোনো ব্যক্তির কারিশমা নয়।

সবক : ১০১

হকের পক্ষে থাকা বর্তমানে সবচেয়ে কঠিন কাজ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○

হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন।

হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানীর পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে পবিত্র গৃহের অভিমুখীদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার করো। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদের সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।[১০৩]

ব্যাখ্যা : মুমিনের জীবন হয় সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী। সে এ পৃথিবীতে স্বাধীন। যা ইচ্ছা করতে পারে। কিন্তু তারপরও সে আল্লাহকে রব এবং বিধানদাতা মালিক স্বীকার করে নিজেকে তার অনুগত বানায়। সে নিজেকে নিজের কৃত অঙ্গীকারের রশিতে বাঁধে। আল্লাহর মু'আমালা হোক বা বান্দার

---

[১০৩] সূরা মায়েদা, আয়াত: ১-২

মু'আমালা, কোনো ক্ষেত্রেই সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত কোনো কিছু করে না; বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে। সে ওই সমস্ত জিনিসকেই নিজের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল করেছেন। আর যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা তার জন্য হারাম করেছেন, সেগুলো খাওয়া থেকে সে বিরত থাকে।

কোনো স্থানে যদি কোনো বৈধ জিনিস থেকেও বাধা দেয়া হয় যেমন ইহরাম অবস্থায় অথবা সম্মানিত মাসসমূহে কিছু বৈধ কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়া এটা কোনো দ্বিধা ছাড়াই মেনে নেয়। কোনো জিনিস যদি দীনের কোনো কিছুর নিদর্শন হয়ে যায় তাহলে তার সম্মান করে। কেননা, এমন জিনিসের সম্মান স্বয়ং দীনেরই সম্মান। আর এ সবকিছু আল্লাহর ভয়েই করে। অন্য কোনো আবেগের বশীভূত হয়ে নয়।

মানুষ সাধারণ অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশের ওপর আমল করে; কিন্তু যখনই কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সে রূপ পাল্টে অন্য মানুষ হয়ে যায়। আল্লাহভীরু একজন মানুষ হঠাৎ করেই আল্লাহর থেকে ভয়হীন হয়ে যায়। কেউ খুব রাগান্বিত হয়ে গেলে অনেক সময় এরকম হয়। রাগের সময় মানুষ ইনসাফের সীমা ভুলে যায়। সে কামনা করতে থাকে, যে কোনো ভাবেই হোক না কেনো সে যেনো নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে লজ্জিত, অপমানিত করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে বৈধ নয়। এমনকি ওই সময়ও নয়, যখন মসজিদে হারামের যিয়ারতের মতো পাক পবিত্র কাজ থেকে কেউ বাধা প্রদান করে। কোনো ব্যক্তি যদি এ ধরনের জুলুম করে, তাহলে তাকে সহযোগিতা করাও গুনাহের কাজে অন্যের সাহায্য করা। আল্লাহভীরু ব্যক্তির উচিত শুধু নেক কাজে অন্যকে সাহায্য করা। যে ব্যক্তি হকের ওপর আছে তাকে সাহায্য করা এবং যে অন্যায়ের ওপর আছে তাকে সাহায্য বা সমর্থন না করা বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু এই কঠিন কাজের ওপরই মানুষের পরকালের পরিণামের ফায়সালা হবে

সবক : ১০২

জালিমকে বাঁধা দেওয়ার কেউ যখন থাকে না

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا○ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا○ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا○ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا○

আল্লাহর জন্যই রয়েছে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি কুফরী করো তাহলে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

যা আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে যমীনে, সব আল্লাহরই আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

হে মানুষ, যদি আল্লাহ চান তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং অন্যদের আনবেন; আল্লহ এটা করতে সক্ষম।

কেউ যদি দুনিয়ার প্রতিদান চায়, তবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১০৪]

ব্যাখ্যা : দুনিয়াতে যারা সৎভাবে জীবনযাপন করে, তারা নিজেদের সততা পুরোপুরি ধরে রাখতে পারে যদি তারা আল্লাহওয়ালা হয়। আল্লাহকে এ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়; শুধু তাকেই ভয় করে তার উপরই ভরসা করে এবং আখেরাতকে আসল মনে করে তার প্রতি মনোনিবেশ করে। এগুলোই একজন মানুষকে পৃথিবীতে সৎভাবে জীবনযাপন করার উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। যা তাকে আখেরাতে ও দুনিয়াতে সফলতা দান করে। এ কারণেই নবীদের শিক্ষায় সব সময় তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহওয়ালা হওয়ার ওপর

---

[১০৪] সূরা নিসা, আয়াত: ১৩১-১৩৪

সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

এই দুনিয়া হলো মানুষকে পরীক্ষা করার জায়গা। এখানে সব মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা হবে যে, কে ভালো আর কে খারাপ। এ উদ্দেশ্যেই দুনিয়াতে মানুষকে সব ধরনের কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে নিজের কালোকে সাদা বলতে পারে, খারাপ কাজকে ভালো কাজও বলতে পারে।

- এখানে একজন মানুষ খারাপ কাজের মধ্যে ডুবে থেকে এটাকে ভালো বলে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারে।
- মানুষ একটি প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করতে পারে আর নিজের এই অস্বীকারের পক্ষে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা হাজির করতে পারে।
- মানুষ চাইলে দুনিয়ার সম্পদ, সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে মানুষকে এ কথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং হক প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই সে কাজ করছে।
- এখানে মানুষ আল্লাহর দীনকে নিজের দুনিয়াবী এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে আরাম আয়েশে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারে।
- এখানে হালাল ছেড়ে হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করে জুলুমের পথে চলার পরও তাকে শাস্তি দেওয়ার মতো কেউ অনেক সময় থাকে না।

অর্থাৎ মানুষ চাইলে নিজেকে হকের অনুসারী বানাতে পারে, আবার চাইলে জুলুম এবং বেইনসাফির পথেও চলতে পারবে।

দীনের সকল আহকামের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো, মানুষ আল্লাহকে ভয় করে কি না তা পরীক্ষা করা। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই মানুষকে দায়িত্বশীল সুন্দর জীবন গড়তে সহযোগিতা করে। যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তাহলে পৃথিবীতে এমন আর কী আছে যা মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে?

- যেখানে অন্যায়কে হকের পোষাক পরিয়ে পেশ করা হয়।
- যেখানে জুলুমই উন্নতির উত্তম পথ।
- যেখানে জুলুমকারীরা নিজের জুলুমকে সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যার মাধ্যমে গোপন করতে পারে।

সবক : ১০৩

অহমিকা সবচেয়ে মারাত্মক ব্যধি

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَه كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِه اِنَّه لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ○ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ○ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ○ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ○

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চিনে যেরূপ চিনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

তার চেয়ে বড় জালিম আর কে যে আল্লহর ওপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে? নিশ্চয় জালিমরা সফলকাম হয় না।

যেদিন আমি তাদের সকলকে সমবেত করবো তারপর যারা শির্ক করেছে তাদেরকে বলবো, 'যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়?'

অতঃপর তাদের এটা ছাড়া বলার কিছু থাকবে না: 'হে আমাদের রব! আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না'।

দেখো, তারা কীভাবে মিথ্যা বলেছে নিজদের ওপর, তারা যে মিথ্যা রটনা করতো, তা তাদের থেকে হারিয়ে গেলো।[১০৫]

ব্যাখ্যা : ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কিতাবে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। শেষ নবীকে চেনার জন্য তার বর্ণনা এমন ভাবে দেওয়া হয়েছিলো যে তারা তাকে নিজেদের সন্তানদের মতোই চিনতো।

কিন্তু তার পরিচয় তাদের কাছে এতো স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তাকে সত্য বলে মেনে নেয়নি এর কারণ হলো, দুনিয়াবি ক্ষতির আশংকা এবং নিজেদের অহমিকা ও বড়ত্ব নষ্ট হওয়ার ভয়। মানুষ আখেরাতের কল্যাণের জন্য কুরবানী দিতেই প্রস্তুত হয় না, তাই তারা হককে কবুল করতে পারে না। ক্ষণিকের

---

[১০৫] সূরা আনআম, আয়াত: ২০-২৪

লাভের জন্য তারা তাদের স্থায়ী লাভকে হাতছাড়া করে। জাহান্নামের আগুনকেই নিজের চিরস্থায়ী আবাস বানিয়ে নেয়।

তারা পরীক্ষার এই জগতে সব কিছুকে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। তারা সত্যের পক্ষে প্রকাশিত দলীল-প্রমাণকে খণ্ডন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এ ক্ষেত্রেও তাদেরকে কেউ বাঁধা দেয় না। এমনকি দুনিয়ায় তাদের এ স্বাধীনতাও রয়েছে যে, হাকীকতকে নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে তারা বলে দেয় যে, সত্য সেটাই যার উপর আমি আছি বা আমিই সঠিক কাজ করছি।

যখন মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কিছুকে তার মনোযোগের কেন্দ্র বানায়, তখন ধীরে ধীরে ওই তার এই মনোযোগ বা সমর্থনকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য কিছু দলিল প্রমাণও জমা করে। তারা কাল্পনিক আশা-আকাঙ্খার ওপর ভিত্তি করে মনগড়া কিছু কাহিনী বানায় যা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত জাগরুক রাখে যে, তারা এক বিশাল ও শক্তিশালী আশ্রয়দাতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন সকল পর্দা উঠে যাবে এবং মানুষ দেখবে আল্লাহ ছাড়া সকল আশ্রয় মিথ্যা ছিলো, তখন তারা নিজেদের পুরনো সব কথা অস্বীকার করবে। নিজেদের সব অপকর্ম পুরোপুরি অস্বীকার করবে এবং মিথ্যা বলবে। দুনিয়াতে তারা যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতো এবং যাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতো, পরকালে তারা তাদের অস্বীকার করবে। তারা ঈমান-আকীদা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যে মিথ্যা দূর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মনে হবে তার কোনো অস্বিত্বই কখনো ছিলো না।

সবক : ১০৪

স্পষ্ট দলীল সামনে আসার পরও তারা মেনে নেয় না

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ○

আর স্মরণ করো, তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত এবং তার অঙ্গীকার, যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন। যখন তোমরা বললে, 'আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি'। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেনো তোমাদেরকে কোনোভাবে বেইনসাফি করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ওয়াদা করেছেন।

আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।

হে মুমিনগণ, তোমরা স্মরণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহর নেয়ামত, যখন একটি কওম তোমাদের দিকে তাদের হাত প্রসারিত করতে মনস্থ করলো; কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত রাখলেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর ওপরই মুমিনরা যেনো তাওয়াক্কুল করে।[১০৬]

ব্যাখ্যা : ঈমান এমন এক অঙ্গীকার যা বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। ঈমান মজবুত হলে বান্দা এবং আল্লাহর সম্পর্কও মজবুত হয়। বান্দা এই অঙ্গীকার করে যে, সে দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করবে আর আল্লাহ তার সব দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। অর্থাৎ তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জিম্মাদার হয়ে যান। নিজের অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য বান্দাকে দু'টি কাজ করতে হয়।

এক. সে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। অর্থাৎ সে আল্লাহর বিধানাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সে সর্বাবস্থায় সকল স্থানে দীনের সকল বিষয় সঠিকভাবে আঞ্জাম দেবে। যা একজন বান্দার নিজের রবের জন্য করা

---

[১০৬] সূরা মায়েদা, আয়াত: ৭-১১

উচিত, ঠিক তেমনটিই সে করবে। সে যখন বিশ্বজাহান দেখবে, তখন তার আকল আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্বের কথা চিন্তা করতে করতে দিশেহারা হয়ে যাবে।

সে যখন নিজেকে দেখবে, তখনও সে তার ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দেখতে পাবে-

- তখন তার আবেগ উচ্ছসিত হলে আল্লাহর জন্যই উচ্ছসিত হবে।
- তার আবেগ উথলে উঠলে আল্লাহর জন্যই উথলে উঠবে।
- কোনো কিছুর দিকে মনোযোগী হলে আল্লাহর জন্যই তা করবে
- তার মহব্বত আল্লাহর জন্য হবে।
- তার সকল ভয় ও আশংকা আল্লাহকে ঘিরে হবে।
- তার স্মরণে আল্লাহ ছায়ানীড়ের মতো থাকবেন।
- সে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করবে।
- সে আল্লাহর রাস্তায় নিজের অর্থ-সম্পদ খরচ করবে।
- সে নিজেকে আল্লাহর দীনের সঙ্গে জড়িত রাখতে পেরে আনন্দিত হবে।

দুই. অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বান্দাদের সঙ্গেও ইনসাফ করা জরুরি। ইনসাফ হলো, মানুষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা এবং মু'আমালার ক্ষেত্রে নিজের খাহেশাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা নিদর্শনের মাধ্যমে নিজের প্রকাশ ঘটান। অর্থাৎ এমন দলীল-প্রমাণের উপস্থিত করেন যা উপেক্ষা করে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যখন মানুষের সামনে আল্লাহর দলীল প্রমাণ আসে আর সে তা মেনে না নিয়ে নানা অহেতুক তর্ক হাজির করতে থাকে, তখন সে আল্লাহর নিদর্শনকে হেয় করে। এই লোকগুলো আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তি পাবে। আর যারা আল্লাহর দলীল নির্দ্বিধায় মেনে নেবে তারা আল্লাহর পুরস্কারের উপযুক্ত হবে।

সবক : ১০৫

আত্মম্ভরিতাই সবচেয়ে বড় স্বার্থপরতা

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ○ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ওই গুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেনো সে শুনতে পায়নি, তার দুই কান যেনো বধির; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত;

সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লহর ওয়াদা সত্য। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১০৭]

ব্যাখ্যা : কথাবার্তা দু'ধরনের। এক. উপদেশমূলক। দুই. বিনোদনমূলক। উপদেশমূলক কথাবার্তা মানুষকে তার যিম্মাদারি সম্পর্কে সচেতন করে। তা মানুষকে কিছু কাজ করার আর কিছু কাজ না করার নির্দেশনা দেয়। এ জন্য খুব কম মানুষই নসীহতমূলক কথাবার্তার প্রতি আগ্রহী হয়। সাধারণত মানুষ বিনোদনমূলক কথাবার্তা পছন্দ করে। উপদেশমূলক 'বই-পুস্তক' ক্রয় করার পরিবর্তে তারা ওই সমস্ত বই-পুস্তক বেশি ক্রয় করে, যাতে তার বিনোদনের খোরাক রয়েছে, যা তাকে কোনো কিছু করার উপদেশ দেয় না।

যে ব্যক্তি মানুষকে হকের দাওয়াত থেকে দূরে রেখে এ ধরনের বিনোদনমূলক কথাবার্তায় মাতিয়ে রাখতে চায়, সে অনেক বড় অপরাধী। কেননা সে মানুষের মস্তিষ্ককে বিপথগামী করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। সে মানুষের মস্তিষ্ককে অহেতুক কথাবার্তায় ব্যস্ত রেখে ভালো কথাবার্তার প্রতি তাদের

---

[১০৭] সূরা লুকমান, আয়াত: ৬-৯

মনোযোগ নষ্ট করেছে।

সবচেয়ে খারাপ প্রবৃত্তি হলো অহংকারী প্রবৃত্তি। যে ব্যক্তি অহংকারী তার সামনে হক এলে সে নিজেকে বড় মনে করার কারণে তা অস্বীকার করে। সে হককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যায়। ঈমানদারের আচরণ হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সত্যের পথেই পরিচালনা করে।

সবক : ১০৬

আল্লাহর কিতাব দেওয়ার মানে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়া

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ○ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে থেকো না। আমি ওই কিতাবকে বনী ইসরাইলের জন্য হিদায়াত বনিয়েছিলাম।

যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা বানিয়েছিলাম, যারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করতো। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।

নিশ্চয় তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।

এটা কি তাদেরকে হিদায়াত করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা চলাফেরা করে? নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না?[১০৮]

ব্যাখ্যা : কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহর কিতাব দান করার মানেই হলো তাদেরকে পৃথিবীর নেতা বানানো। কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব একটি সম্প্রদায় তখনই লাভ করতে পারে-

---

[১০৮] সূরা সিজদা, আয়াত: ২৩-২৬

যখন তারা ধৈর্যের পরিচয় দেয়।

যখন তারা ধৈর্যের প্রমাণ দিতে পারে।

যখন তাদের ধৈর্যের গুণ পূর্ণতা লাভ করবে।

لَمَّا صَبَرُوْا এর ব্যাখ্যা لَمَّا صَبَرُوْا عَنِ الدُّنْيَا করা হয়েছে। অর্থাৎ নেতৃত্বের মর্যাদা তারা তখন লাভ করেছে যখন তারা দুনিয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেছেন।[১০৯]

জনগণ ওই ব্যক্তি বা দলকে নিজের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে যাকে নিজেদের থেকে বড় মনে হয়। যে ওই সময়ও মূলনীতির উপর অনঢ় অবিচল থাকে যখন লোকজন স্বার্থের পেছনে দৌড়াতে থাকে। যে ওই সময়ও ইনসাফের পক্ষপাতিত্ব করে যখন জনগণ নিজেদের জাতিগত স্বার্থের পক্ষপাতিত্ব করে। যে ওই সময়ও নিজেকে বঞ্চিত করার ওপর সন্তুষ্ট থাকে যখন অন্যরা পাওয়ার জন্য দৌড়ঝাপ করতে থাকে। যে ওই সময়ও হকের জন্য উৎস্বর্গিত হতে প্রস্তুত থাকে যখন অন্যরা শুধু নিজের জন্য উৎসর্গিত হতে জানে। এটাই ধৈর্য। যারা এরকম ধৈর্যের প্রমাণ দিতে পারে তারাই নেতা হতে পারে।

দীনের মধ্যে নতুন নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্ভব ঘটিয়ে যারা মতবিরোধ সৃষ্টি করে, তারা লাঞ্ছিত হয়। আল্লাহ তাদের মতবাদকে সবার সামনে ভুল প্রমাণ করেন। চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা ব্যতিত আর কিছু তাদের ভাগ্যে জোটে না। অধিকাংশ মানুষ বিপদ আপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্য অনেকে যে বিপদে পড়েছে, সেই বিপদে সে নিজে যেনো না পড়ে এর জন্যও সে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

---

[১০৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩ : ৪৬৩

সবক : ১০৭

সত্যিকারের মুমিন দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান পছন্দ করে না

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا○ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا○ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا○ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا○

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আনো আল্লহর ওপর, তার রসূলের ওপর এবং সে কিতাবের ওপর যা তিনি তার রসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, এরপর কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লহর।[১১০]

ব্যাখ্যা : 'হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো।' এটা ওই ধরনের বাক্য যেখানে বলা হয়েছে যে, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা মুসলমান হও।' কেউ নিজে নিজেকে মুসলমান বলা অথবা মুসলমান ভাবা যথেষ্ট নয়। আল্লাহর নিকটও মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া জরুরি। আল্লাহর নিকট শুধু ওই ব্যক্তিই মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে- যে আল্লাহকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে; তিনিই তার

---

[১১০] সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৬-১৩৯

একমাত্র বিশ্বাস ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে মানে যে, অন্য সকল পথ, মত ও দর্শন তার কাছে ভিত্তিহীন মনে হবে। যে আসমানি কিতাবসমূহকে এভাবে আপন করে নেয় যে, তার চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্খা ও আবেগ পরিপূর্ণভাবে এর অনুগত। যে ফেরেশতাদের আকীদা-বিশ্বাসকে এভাবে নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয়; সব সময় তার মনে হয় ডানে বামে আল্লাহর চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছে। যে আখেরাতকে এভাবে স্বীকার করে, সে নিজের সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরকালের মিযানের পাল্লায় মাপে।

যে ব্যক্তি এরকম মুমিন হতে পারবে সে-ই আল্লাহর ওই সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যা হেদায়াত ও সফলতার পথ। যে ব্যক্তি এমন মুমিন হতে না পারবে সে নিজে নিজেকে যত বড় মুমিন ও মুসলমান মনে করুক না কেনো, সে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী একজন মানুষ। ।

মানা এবং না মানার এই যুদ্ধ মানুষের জীবনে চলতেই থাকে। যখনই কোনো বিষয় সামনে আসে, তখন মানুষের মস্তিষ্ক দোটানায় পড়ে, এরপর ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কোনো এক দিকে চলতে থাকে। হয়তো সে কুপ্রবৃত্তির দিকে চলে অথবা হকের দাবি পূর্ণ করার দিকে। যদি এমন অবস্থায় কোনো ঈমানদারের চিন্তা-ভাবনা ও জযবা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের দিকে চলতে থাকে, তাহলে সে যেনো তার ঈমানকে অস্বীকার করলো। এর বিপরীতে যদি সে তার চিন্তা-ভাবনা ও জযবাকে হকের অনুসারী বানায় তাহলে সে ঈমানের ওপর অবিচল থাকলো।

মানুষ মুসলমান অবস্থায়ই দুনিয়ায় আসে। এরপর যখন একটি হক কথা তার সামনে আসে, তখন সে বিনয়ী হয়ে হককে স্বীকার করে নেয় অথবা তার মাঝে অহংকারে প্রবৃত্তি জেগে ওঠে আর সে হককে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথম সুরত হলো ঈমানদারের অবস্থা। দ্বিতীয় সুরত হলো ঈমানকে অস্বীকার করার অবস্থা। যে ব্যক্তি সত্যিকারের মুমিন নয়, সে দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান পছন্দ করে। এ জন্য সে ওই সমস্ত লোকদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যাদের দিকে ঝুঁকলে তার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে; যদি তারা পথভ্রষ্টও হয়। এরকম লোকদের প্রতি সে আগ্রহী হয় না যাদের দ্বারা তার ইজ্জত ও সম্মান বাড়বে না; যদিও তারা হকপন্থীও হয়।

সবক : ১০৮

শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়া দুটোই পরীক্ষা

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَه لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَك قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْى نِسَآءَهُمْ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ○ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ○ قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ○

আর ফেরাউনের কওমের সভাসদগণ বললো, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' সে বললো, 'আমরা তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করবো আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর ক্ষমতাবান।'

মূসা তার কওমকে বললো, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তার বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।'

তারা বললো, 'তুমি আমাদের কাছে আসার আগে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তুমি আমাদের কাছে আসার পরেও।' সে বললো, 'শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কী করো।'[১১১]

ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈল তাদের পয়গম্বরের সামনে যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলো, সেই সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে থাকা লোকেরা। কিন্তু মুসা আ. বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, জাতীয় সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে দুনিয়ার নেতাদের ভাবনা আর পয়গম্বরদের ভাবনার মাঝে কতো বিশাল পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়াদার নেতারা ভাবে এ ধরনের সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন। চাই তা

---

[১১১] সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৭-১২৯

সমঝোতার মাধ্যমে হোক বা সংঘর্ষের মাধ্যমে হোক। কিন্তু পয়গম্বর আ. যে সমাধান বলেছিলেন তা হলো, যা কিছু ঘটছে বা হচ্ছে এ সব সহ্য করতে থাকো আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকো। রাষ্ট্র থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।

অতঃপর পয়গম্বর আ. সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিপরীত যে সমাধানের কথা বলেছেন, এটা কেনো বলেছেন সেটাও তিনি উল্লেখ করছেন যে, এ সমস্যা ক্ষমতাশীলদের পক্ষ থেকে আসছে আর ক্ষমতা লাভের মাধ্যমেই এর সমাধান বেরিয়ে আসবে, কিন্তু কেউ নিজে নিজে কি ক্ষমতাবান হতে পারে? ক্ষমতা শুধু নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না; বরং সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো জন্য ক্ষমতা ও রাজত্বের ফায়সালা করা হয়। কারো থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যেহেতু ক্ষমতাশালী হওয়ার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে, সমস্যা সমাধানের পথও নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যমেই হবে।

রাষ্ট্র ক্ষমতা যাদেরই দান করা হয়, তা নিশ্চিতভাবে তাকে পরীক্ষা করার জন্যই দান করা হয়। তবে এই পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী হওয়াটা যেমন পরীক্ষা, ক্ষমতাশালী না হওয়াটাও পরীক্ষা। বর্তমানে যার কাছে ক্ষমতা আছে তাকে পরীক্ষা করার জন্যই ক্ষমতা দান করা হয়েছে। আল্লাহ দেখতে চান, ক্ষমতা পেয়ে সে কি জালেম ও অহংকারী হয় নাকি ন্যায়পরায়ণ ও বিনয়ী হয়?

অনুরূপ যখন তোমাদের কাউকে ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হবে, তখন এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হবে তোমাদের যাচাই করা, তোমাদের পরীক্ষা করা। এক দলের অযোগ্যতার কারণে যেমন তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দলকে দেয়া হয়, একইভাবে দ্বিতীয় দল যদি অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তার থেকেও ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোনো দলকে দেয়া হয়।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ এবং ক্ষমতা যা মানুষ পৃথিবীতে পেতে চায়, বাস্তবে তা পরকালে পাওয়ার জিনিস। দুনিয়াতে তো এগুলো পরীক্ষা স্বরূপ দেয়া হয় আর পরকালে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে।

সবক : ১০৯

তারা নিজেদের নির্বাচিত উম্মত ও নবীদের সন্তান ভাবে

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ○ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' বস্তুত অনুরূপ সামগ্রী যদি আবারও তাদের নিকট আসে, তবে তারা তাও গ্রহণ করবে; তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না? তারা তো এতে যা আছে, তা অধ্যায়নও করে। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আখিরাতের আবাসই তাদের জন্য উত্তম; তোমরা কি তা অনুধাবন করো না?

যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি এমন সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করি না।

স্মরণ করো, যখন আমি তাদের ওপর পাহাড় তুলে ধরলাম, যেনো তা একটি মেঘ এবং তারা মনে করলো, তা তাদের উপর পড়বে। বললাম, 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা শক্তভাবে ধরো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ করো, যেনো তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।'[১১২]

ব্যাখ্যা : হযরত মুসা আ. এর যুগে ইহুদিদেরকে যখন আল্লাহর বিধিবিধান দেয়া হলো, তখন তার আনুষ্ঠানিকতা পাহাড়ের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হতো। তখন একদিন এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো যে, ইহুদিরা মনে করতে

---

[১১২] সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৬৯-১৭১

লাগলো, পাহাড় তাদের উপর পড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করার পর যদি তোমরা তা পূর্ণ না করো, তাহলে স্মরণ রেখো, ওই অঙ্গীকার এমন মহান অধিপতির সঙ্গে করা হয়েছে; যিনি ইচ্ছা করলে পাহাড়কে তোমাদের উপর নিপতিত করে সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

তখন অধিকাংশ ইহুদিই আল্লাহকে ভয় করতো এবং নেক আমল করতো। কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তারা দুনিয়াকে নিজেদের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত করে ফেলে। তারা বৈধ অবৈধের ভেদাভেদ না করে সম্পদ জমা করার পেছনে পড়ে যায়। তখনও তারা আসমানি কিতাব অধ্যয়ন করতো; কিন্তু নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এটাকে তারা এমন বানিয়ে নিয়েছিলো যে, আল্লাহকেই তাদের এ অবাধ্যতার সমর্থনকারী মনে হচ্ছিলো। তাদের উদাসিনতা এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা এ কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতো, 'আমরা নির্বাচিত উম্মত, আমরা নবীদের সন্তান।' আল্লাহ তাআলা নিজের প্রিয় বান্দাদের কারণে আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

সকল নবীর উম্মতের অবস্থাই এরকম। প্রাথমিক অবস্থায় যারা নবীকে সরাসরি দেখে তার দাওয়াতে মুসলমান হতো, তারা আল্লাহকে ভয় করতো এবং নেক আমল করতো। কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও আমলের এই সজীবতা থাকতো না। তারা অন্য দুনিয়াদার লোকদের মতো হয়ে যেতো। অথচ তাদের মাঝে আল্লাহর দীন রয়েছে। আল্লাহর কিতাবও তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়। তবে এই সবকিছু গোত্রীয় উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের কারণে তারা করে। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের কারণে নয়। তারা আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়া পূজারীদের পথে চলে। তারা সঠিক ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। এর সাথে সাথে তারা গর্বও করে যে- তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত, আল্লাহর প্রিয়জন, আসমানি কিতাবধারী। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো, মানুষ আল্লাহর কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, নামায কায়েম করবে। আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরা এবং নামায কায়েম করার অর্থ হলো, মানুষের সংশোধন হয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আল্লাহর ইবাদত মানুষকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধিত করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বানায় না।

সবক : ১১০

মানুষ নিজের ভ্রান্তি সুন্দর শব্দে উপস্থাপন করে

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ○ وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

আর আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ দ্রুত করতেন যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ দ্রুত করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের মৃত্যু ঘটতো। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ছেড়ে দেই। যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেনো তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তাদের আমল শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।[১১৩]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর বিধান হলো, কোনো ব্যক্তি যদি পুরস্কার পাওয়ার আমল করে তাহলে তার আমল তৎক্ষণাত তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ছাড় দেন। যাতে সে কোনো না কোনোভাবে সতর্ক হয়ে নিজেকে সংশোধন করে। আল্লাহর এই কর্মপদ্ধতি মানুষের জন্য অনেক বড় রহমত। অন্যথায় মানুষ এতো জালিম যে, সে সর্বদা খারাপ কাজের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। যদি মানুষকে তাদের অপকর্মের কারণে সাথে সাথে পাকড়াও করা হতো, তাহলে তারা অতিদ্রুতই ধ্বংস হয়ে যেতো। পৃথিবীতে কোনো মানুষই থাকতো না।

দুনিয়াতে তারাই অবাধ্য হয় যারা ভাবে, মৃত্যুর পর তাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে না। তারা পরকালের পাকড়াও থেকে আশঙ্কামুক্ত থাকে। যারা ভাবে তারা স্বাধীন। তাই তারা সবসময় দুনিয়ার ধান্দা নিয়ে ঘোরাফেরা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

---

[১১৩] সূরা ইউনুস, আয়াত: ১১-১২

করে। অন্যায় করতে তারা ভয় পায় না।

মানুষের মাঝে সততা সৃষ্টি করে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ভয়। মানুষ যখন ভাবে, সকল শক্তিশালীর ওপর একজন শক্তিশালী আছেন, সকল মানুষই তার সামনে অক্ষম, তিনি একদিন সকল মানুষকে পাকড়াও করবেন আর সকলেই সেদিন নিজের ব্যাপারে তার ফায়সালা মেনে নিতে বাধ্য হবে, তখন সে কোনো কাজ করার আগে ভেবে চিন্তে করে। তার শাস্তিকে ভয় করে, তার পুরস্কারের আশা করে।

দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, মানুষ বারবার কোনো না কোনো কষ্ট অথবা দুর্ঘটনাতে নিপতিত হবেই। মানুষ তখন উপলব্ধি করতে পারে, তারা কতো দুর্বল, কতো অক্ষম। তখন মানুষ নিজের অজান্তেই আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অসহায়ের মতো আল্লাহর নিকট রোনাজারি করতে থাকে। সে আল্লাহর কুদরতের মুকাবেলায় নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের এই অবস্থা ততোক্ষণ থাকে যতোক্ষণ সে মসিবতের মধ্যে থাকে। মসিবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় গাফেল ও অবাধ্য হয়ে যায়। এমন লোকদের ইবাদত বন্দেগী আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। কারণ বন্দেগী বা ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো, সুখে-দুঃখে সবসময় সর্বাবস্থায় আল্লাহর সামনে নত হওয়া, তার আনুগত্য স্বীকার করা। বিপদের সময় আল্লাহ মুখী হওয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।

মানুষ নিজের সব কাজের একটি বৈধতা অনুসন্ধান করে। মানুষ যদি অবাধ্যতাকে নিজের জন্য পছন্দ করে, তাহলে তার মস্তিষ্ক অবাধ্যতার পক্ষে যুক্তি খুঁজতে থাকে। যদি সে বাস্তবেই অবাধ্যতা করে ফেলে, তাহলে তার মস্তিষ্ক তার এই অবাধ্যতাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য সুন্দর শব্দাবলী একত্রিত করতে থাকে। কুরআনে মানুষের এই প্রবণতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষ নিজের ভুল-ত্রুটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে নিজেকে সন্তুষ্ট করে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে। কিন্তু এটা এমন হলো, যেমন কোনো ব্যক্তি আগুনের অঙ্গার নিজের হাতে নিলো এবং ভাবলো যে, এটা তাকে জ্বালাবে না। কেননা সে এর নাম দিয়েছে লাল ফুল।

সবক : ১১১

তারা নিজেদের কৃত গুনাহের কথা ভেবে অস্থির হয়

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ○ وَ اَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَه مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ○

বলো, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করো। আযাব আসার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।[১১৪]

ব্যাখ্যা : যাদের ভেতরে সত্যানুসন্ধানী অন্তর রয়েছে, তারা যখন আল্লাহর পরিচয় লাভ করে, তারা তখন এই চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে যে, আজ পর্যন্ত তাদের থেকে যে গুনাহ হয়ে গেছে তার কি মু'আমালা হবে? তার কি ব্যবস্থা হবে? একইভাবে আল্লাহর অনুগত জীবনযাপন করার পরও মানুষের থেকে বারবার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় এবং সেইসব কৃতকর্মের জন্য তার মনে অনুতাপ জাগে। এই অনুতাপ অনেককে হতাশার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এ সব লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা নিজের কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের মু'আমালা এমন এক আল্লার সঙ্গে যিনি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু; তিনি মানুষের অতীত নয় বরং বর্তমান দেখেন, তিনি মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখেন না; বরং তার ভেতর দেখেন। বান্দা নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

মানুষ যখন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তিনি তাকে নিজের রহমতের ছায়ায় আবৃত করে নেন। তার থেকে যতবড় অপরাধই সংঘঠিত হোক না কেনো, তাকে ক্ষমা করে দেন।

---

[১১৪] সূরা যুমার, আয়াত, ৫৩-৫৪

সবক : ১১২

অনেক জাতি পতনের গহ্বরে হারিয়ে গেছে

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো, তাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারা এদের তুলনায় যমীনে শক্তিমত্তা ও প্রভাব বিস্তারে প্রবলতর ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন তাদের পাপাচারের কারণে। আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিলো না।

এটি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসতো, কিন্তু তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতো। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চই তিনি শক্তিমান, আযাব দানে কঠোর।[১১৫]

ব্যাখ্যা : পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে। অনেক জাতি উত্থানের কিছুদিন পরই পতনের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। অনেক জাতি পৃথিবীতে তাদের নিজস্ব রীতি ও সংস্কৃতির প্রচলন ঘটিয়েছিলো। আজও তাদের ওই নিদর্শনের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে পাওয়া যায়। যে জাতিগুলো একদিন পৃথিবীতে রাজত্ব করতো, আজ তাদেরকে শুধু ইতিহাসের একটি ঘটনা হিসেবে স্মরণ করা হয়।

বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস সকলেরই জানা। তবে মানুষ এ ঘটনাগুলোকে সাময়িক দুর্ঘটনা অথবা রাজনৈতিক বিপ্লবের ফল মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ সবকিছুই ছিলো আল্লাহর ফায়সালা; যা সত্য অস্বীকার করার কারণে ওই সব গোত্রের উপর আপতিত হয়েছে। আমরা যদি বাস্তবতা দেখার অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরাও প্রত্যক্ষ করতে পারবো যে, এ সব কিছুই আল্লাহর ফেরেশতাদের মাধ্যমে ঘটে। যদিও বাহ্যত তা দুনিয়াবী কোনো কারণে ঘটে বলে মনে করা হয়।

---

[১১৫] সূরা মু'মিন, আয়াত: ২১-২২

সবক : ১১৩

প্রভাবশালীরা অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে গিয়েছিলো

هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ فَاِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ○
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنّٰى یُصْرَفُوْنَ○ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا
بِالْكِتٰبِ وَ بِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ○ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ
اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ○ فِی الْحَمِیْمِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ○ ثُمَّ
قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ○ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ
نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَیْـًٔا كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِیْنَ○ ذٰلِكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ○
اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِیْنَ○

তুমি কি লক্ষ্য করনা তাদেরকে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে? তাদেরকে কীভাবে বিপথগামী করা হচ্ছে?

যারা কিতাব এবং আমার রসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে–

ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে'

'আল্লাহ ছাড়া'? তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে', বস্তুত পূর্বে আমরা কোনো কিছুকে আহ্বান করিনি'। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।

এটা এ জন্য যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা অহঙ্কার করতে।

তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করো চিরকাল তাতে অবস্থানের জন্য। অহঙ্কারীদের বাসস্থান কতইনা নিকৃষ্ট![১১৬]

---

[১১৬] সূরা মু'মিন, আয়াত: ৬৯-৭৬

ব্যাখ্যা : নিজেদের অন্যায়-অপকর্ম নিয়ে আনন্দিত ও উদ্ধত কারা ছিলো? তারা ছিলো সমাজের প্রভাবশালী এবং দাপুটে ব্যক্তিরা। যারা দুনিয়ার কিছু নাজ-নেয়ামত, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার কারণে অহংকারী হয়ে উঠেছিলো। তাদের দুনিয়াবী সফলতা তাদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলো যে, তারা সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী। অথচ বাস্তবতার দিক থেকে তারা ছিলো পথভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত।

সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রথমে হক অস্বীকার করে। অতঃপর তাদের অনুসরণে সাধারণ জনগণও হক অস্বীকার করতে থাকে। ওপরে বর্ণিত এই আয়াতগুলোতে তাদের পরকালীন শাস্তির দৃশ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পরকালে এই লোকগুলোকে তাদের অহংকারের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের মিথ্যা বড়ত্ব অবশেষে তাদেরকে যেখানে পৌঁছে দেবে সেখানে শুধু লাঞ্ছনা আর লাঞ্ছনাই থাকবে। সেই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো রাস্তা তাদের সামনে থাকবে না।

সবক : ১১৪

সত্যিকারের তাওবা আখেরাতের জ্যোতি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'[১১৭]

ব্যাখ্যা : এই দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা, তাই মানুষের ভুল-ত্রুটি হয়। আর

---

[১১৭] সূরা তাহরীম, আয়াত: ৮

তার এই ভুল-ত্রুটি থেকে পরিত্রাণের জন্যই তাওবার ব্যবস্থা। তওবা অর্থ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। মানুষ যদি সত্যিকারার্থে নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় আর তার এই অনুতাপই তাকে পরে আবার এই কাজ করতে বাঁধা দেয়। হাদীসে এসেছে,

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

অনুতাপই তওবা।

এক সাহাবী বলেন, সত্যিকারের তওবা হলো,

يَتُوْبُ ثُمَّ لاَيَعُوْدُ

মানুষ গুনাহের কাজ থেকে ফিরে আসবে। আর
পুনরায় জীবনে কখনো ওই কাজ করবে না।

সত্যিকারের তওবাকেই তওবা বলে। শুধু তওবার শব্দাবলী মুখে উচ্চারণের নাম তওবা নয়।

হযরত আলী রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নিজের কোনো অপরাধের পর মুখে 'তওবা' 'তওবা' বলছে। তিনি বলেন,

تَوْبَةُ الْكَذَابِيْنَ

এটাতো মিথ্যুকদের তাওবা।

সত্যিকারের তওবা আখেরাতের জ্যোতি আর মিথ্যা তওবা আখেরাতের অন্ধকার।

সবক : ১১৫

আল্লাহর ভয়ের দীনের বদলে মানুষ উৎসবের দীন চায়

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰـذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ○ وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ○ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ○ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَآءَه اِنْ اَوْلِيَآؤُه اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ○ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ○

তাদের ওপর যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা

বলে, শুনলাম তো; যদি আমরা চাই, তাহলে এর অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এ তো পিতৃ-পুরুষদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছু না।

স্মরণ করো, যখন তারা বলেছিলো, 'হে আল্লাহ, যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের ওপর অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিন'।

আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

এবং তাদের কী বা বলার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না, যখন তারা মসজিদুল হারাম থেকে লোকদের বাধা প্রদান করে, তারা এর অভিভাবকও নয়। তার অভিভাবক তো শুধু মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না।

কা'বার নিকট শুধু শিষ ও করতালি দেওয়াই তাদের সালাত, সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।[১১৮]

ব্যাখ্যা : কাফেররা বলতো, আমরাও তো এরকম বাণী বানাতে পারি। আমরা যদি অন্যায়ের ওপরই থাকি তাহলে আমাদের উপর কেনো পাথর বর্ষণ হয় না। এরকম উদ্ধত কথাবার্তার পরও তাদেরকে আল্লাহ তখনই শাস্তি দিতেন না। মানুষ যখন দুনিয়াতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, যখন সে দেখে হক অস্বীকার করার অথবা হককে এড়িয়ে চলার পরও তার কোনো ক্ষতি হয় না তখন সে সাহসী হয়ে ওঠে। একটা মিথ্যা ভরসা তার মধ্যে জন্ম নেয়। সে ভাবে আমি যা করছি তা সম্পূর্ণ সঠিক। তার এই উপলব্ধি তার মুখ থেকে এমন শব্দাবলী বের করে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় কারো মুখ থেকে বের হতে পারে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সুযোগ দেয়ার নিয়ম থাকার কারণেই এই লোকগুলো এ ধরনের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন; কিন্তু আল্লাহর নীতি হলো, তিনি সর্বদাই মানুষকে ওই সময় পাকড়াও করেন যখন হক ও বাতিলকে পরিপূর্ণভাবে তার সামনে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়। হেদায়াতের দাওয়াত পরিপূর্ণতায় পৌঁছার আগে তিনি কাউকে ধ্বংস করেন না। এমন কি দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে যদি একজন বা দু'জন করে মানুষও প্রভাবিত হয়ে নিজেকে সংশোধন করে নিতে থাকে, তাহলেও তিনি শাস্তি আটকে রাখেন। যেনো এই দাওয়াত পরিপূর্ণতায়

---

[১১৮] সূরা আনফাল, আয়াত: ৩১-৩৫

পৌঁছতে পারে এবং যতো সৌভাগ্যবান রূহ আছে সবগুলো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বেরিয়ে আসতে পারে।

উম্মতের মাঝে কিছু মানুষ অবাধ্য ও উশৃঙ্খল হয়ে ওঠার মানে এই নয় যে, তাদের মধ্য থেকে দীন মিটে যাবে। পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মধ্যে নবীর যুগের পর আরও কয়েক যুগ কেটে গেলে আল্লাহকে ভয় করার দীন বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তার জায়গা দখল করতো উৎসব নির্ভর দীন। অর্থাৎ দীনের বিধি বিধান তারা মেনে চলতো না। কিন্তু পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের নামে প্রতিষ্ঠিত খানকাসমূহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে ভাবতো, তারাও সেই মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাবে যে মর্যাদা ওই মহান ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের খানকাসমূহ নিজেদের কাজের কারণে অর্জন করেছিলো। অথচ তারা নিজেরা অন্তঃসারশূন্য। বড় বড় নামের সাথে নিজেদের জড়িয়ে রেখে এবং কিছু লোকদেখানো কাজ করে তারা ভাবতো, তারা দীনের জন্য অনেক কিছু করছে।

মক্কার লোকগুলোও এ ধরনের দীন মানতো। তাদের অহংকার ছিলো যে, তারা বাইতুল্লাহর অভিভাবক। ইবরাহিম আ. এর মত মর্যাদাবান নবীর উম্মত। তারা কা'বা শরীফের খাদেম হওয়ার মতো মর্যাদার অধিকারী। তাদের ধারণা ছিলো, যেহেতু এতো ইজ্জত-সম্মান তারা লাভ করেছে এবং বড় বড় দীনি কাজ করছে, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সবক : ১১৬

দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী পুরস্কার নয়

قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰنِيْ رَبِّيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ لَا شَرِيْكَ لَه وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ○ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ○ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَ اِنَّه لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

বলো, 'নিশ্চয় আমার রব আমাকে সরল পথের হিদায়াত দিয়েছেন। তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের আদর্শ, সে ছিলো একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না'।

বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।

'তার কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম'।

বলো, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব অনুসন্ধান করবো' অথচ তিনি সব কিছুর রব'? আর প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই উপর বর্তায় আর কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের রবের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে সেই সংবাদ দেবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

আর তিনি সে সত্ত্বা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১৯]

ব্যাখ্যা : কুরআনে কারীম নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নিজের চূড়ান্ত ও একমাত্র দীন নাযিল করেছেন। এই দীনই তিনি হযরত ইবরাহিম আ. এবং অন্য পয়গম্বরদেরকে দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য এবং রহমত পেতে চায়- সে যেনো এই দীনকে আঁকড়ে ধরে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদত করে। সে যেনো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে যেনো আল্লাহর জন্যই বেঁচে থাকে আর যদি তার মৃত্যু আসে তাহলে যেনো আল্লাহর পূর্ণ বান্দা অবস্থায় তার মৃত্যু আসে।

মানুষ এই দীন ছাড়া অন্য মতাদর্শ কীভাবে গ্রহণ করতে পারে? দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য না করে, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কেউ সফল হতে পারে না। এটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। কেউ কারো পুরস্কারে শরীক হতে পারবে না। কারো শাস্তিতেও শরীক হতে পারবে না। মানুষের উচিত দীন নিয়ে এবং তার পরকালীন পরিণাম নিয়ে খুব সতর্কতার সাথে চিন্তা ভাবনা করা। যেমন নিজের ব্যক্তিগত দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ বা সমস্যা নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে।

---

[১১৯] সূরা আনআম, আয়াত: ১৬১-১৬৫

দুনিয়ার নিয়ম হলো এই জায়গা থেকে একজন চলে যায়, তার স্থলে আরেকজন চলে আসে। এক গোত্রকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, অন্য গোত্র তাদের স্থলে যমীনের মালিক হয়ে যায়। এটা বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে- এখানে কারো ক্ষমতা স্থায়ী নয়, এখানে কারো প্রতাপ চিরদিনের জন্য নয়।

কিন্তু মানুষের অবস্থা হলো, যখনই সে কোনো সুযোগ লাভ করে, তখন অতীতের চলে যাওয়া লোকদের পরিণামের কথা ভুলে যায়। সে নিজের জুলুম এবং অবাধ্যতা বৈধ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের দলীল প্রস্তুত করে। তবে আল্লাহ তাআলা যখন বাস্তবতাকে স্পষ্ট করবেন তখন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যে, তার এ সকল কথার কোনো মূল্য ছিলো না, যেগুলোকে সে নিজের অবস্থানের বৈধ প্রমাণের জন্য শক্তিশালী দলীল মনে করেছিলো।

দুনিয়াতে ভোগ বিলাসের উপকরণ লাভ করে মানুষ সেগুলোকে নিজেদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার মনে করে। অথচ দুনিয়াতে যে যা কিছুই লাভ করে তা শুধু পরীক্ষাস্বরূপ, পুরস্কারস্বরূপ নয়। দুনিয়ার জিনিসপত্রকে যখন মানুষ পুরস্কার মনে করে, তখন তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয় আর পরীক্ষাস্বরূপ মনে করলে, তার মাঝে শোকর ও বিনয় সৃষ্টি হয়। অহংকার নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা এবং অবাধ্যতা সৃষ্টি করে আর শোকর ও বিনয় আনুগত্য সৃষ্টি করে।

সবক : ১১৭

নিজেকে নিজের মালিক মনে করা সব অন্যায়ের মূল

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ○

আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।

নিশ্চয় আমি যমীন ও এর উপরে যা রয়েছে তার চূড়ান্ত মালিক হবো এবং আমারই নিকট তাদের ফিরিয়ে আনা হবে।[১২০]

ব্যাখ্যা : মানুষ দুনিয়াতে কোনো কিছুতে ব্যর্থ হলে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তখনও তার সামনে পুনরায় নতুন করে কাজটি শুরু করার সুযোগ থাকে। তার সঙ্গী এবং সাহায্যকারীরা তাকে বোঝানোর জন্য দাঁড়িয়ে যায়। সবার উৎসাহে এক সময় সে আবার কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পরকালের ব্যর্থতা এমন এক

---

[১২০] সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৩৯-৪০

ব্যর্থতা যে ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বার নতুন করে কিছু করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। যে ব্যর্থতার পর তাকে বোঝানোর মতো কেউ থাকবে না। আফসোস করলেও কিছু করার সুযোগও থাকবে না। কতো কঠিন আক্ষেপের মুহূর্ত হবে তখন, যখন মানুষ জানবে, সে সব কিছু করতে পারতো, কিন্তু সে কিছুই করেনি। করার সময়ও শেষ হয়ে গেছে।

সকল অপরাধের মূল হলো মানুষের মাঝে এই ভাবনা আসা যে, সে নিজেই নিজের মালিক। এই মালিকানা কিছু সময়ের জন্য। পূর্বেও আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক ছিলেন এবং পরেও তিনিই সবকিছুর মালিক থাকবেন। আল্লাহ ব্যতিত আর কারো মালিকানাই চিরস্থায়ী নয়।

সবক : ১১৮

হক গ্রহণ করলে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয়

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার রব এই সবের পর , তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

স্মরণ করো সেই দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[১২১]

ব্যাখ্যা : যে সমাজে অন্যায় প্রবল, সেখানে কেউ হক কবুল করলে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। চতুর্দিক থেকে চাপে পড়ে সে। সবাই তাকে পুনরায় প্রথাগত ধর্মের দিকে ফিরে যেতে বলে। যদি সে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং হকের জন্য সবকিছু এমন কি পৈতৃক সম্পত্তি ও জন্মভূমি পর্যন্ত ছেড়ে দেয়, কিন্তু হক না ছাড়ে তাহলে সে মুহাজির[১২২] ও মুজাহিদ[১২৩]। আল্লাহর নিকট সে অনেক বড় প্রতিদান লাভ করবে।

দুনিয়ার পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে হকের উপর অটল-অবিচল থাকতে

---

[১২১] সূরা নাহল, আয়াত: ১১০-১১১

[১২২] যারা রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন।

[১২৩] অকুতোভয় মুসলিম যোদ্ধা।

সহযোগিতা করে আখেরাতের স্মরণ। প্রতিটি মানুষই অতিক্রুত এক ভয়ানক দিনে উপনীত হবে। সেই দিন এতো কঠিন হবে যে, মানুষ নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত ভুলে যাবে। সেদিন না কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষে ওকালতি করতে পারবে আর না কোনো ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে। যদি কোনো ব্যক্তি সেদিনের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সে সব ধরনের ক্ষতি মেনে নেবে; কিন্তু হক ছাড়বে না।

সবক : ১১৯

নিজের কাজ নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّه وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْ فُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেই না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে– স্বজনদের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন, যেনো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১২৪]

ব্যাখ্যা : ইয়াতীম সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষ। মানুষ সাধারণত অন্যের সঙ্গে যেসব কারণে ভালো ব্যবহার করে, সেসব বেশিরভাগ কারণ তার ক্ষেত্রে থাকে না। 'ইয়াতীম' -এর দায়িত্বশীল এমন ব্যক্তিই হতে পারে যে নীতিবান এবং

---

[১২৪] সূরা আনআম, আয়াত: ১৫২-১৫৩

খোদাভীরু। এমন ব্যক্তি নয় যে নিজের স্বার্থে ন্যায় অন্যায় সব রকম কাজ করতে পারে। ইয়াতীমের সাথে মানুষ যেমন আচরণ করে তাই তার আসল চরিত্র। যে ব্যক্তি এতিমের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, সে প্রকৃত ভালো মানুষ এবং অন্যদের সঙ্গেও সে ভালো ব্যবহার করে।

এ বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তু একটি অপরটির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত রয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুকে সেটাই দেয় যা তার দেয়া উচিত। আর অন্যের থেকে ওই জিনিসই নেয় যা তার প্রাপ্য। মানুষেরও উচিত এই নীতি মেনে চলা। মানুষ যখন অন্যের জন্য ওজন করে তখন যেনো ন্যায্যভাবে ওজন করে এবং নিজের জন্যও ন্যায্যভাবেই ওজন করে। এমন যেনো না হয় যে, নিজের জন্য এক পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করলো অন্যের জন্য অন্য পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করলো। একই কাজকে নিজের ক্ষেত্রে ন্যায় মনে করলো আর অন্যের ক্ষেত্রে অন্যায় মনে করলো।

সাধরণত একজন মানুষ জীবনে বহুবার অন্যের বিরুদ্ধে রায় দেয়। তখন তার উচিত ন্যায্য কথা বলা, হক কথা বলা। ওই ব্যক্তি আপন হোক বা পর হোক, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকুক বা শত্রুতার সম্পর্ক থাকুক, তার কাছে তার কোনো স্বার্থ থাকুক অথবা না থাকুক, মানুষ যেনো রায় দেওয়ার সময় ওই কথাটাই বলে, যা বাস্তবিক সত্য এবং সঠিক।

প্রতিটি মানুষ কিছু বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কোনো অঙ্গীকার লেখা থাকে, কোনো অঙ্গীকার শব্দে লেখা থাকে না; কিন্তু মানুষের ঈমান, তার মানবতা এবং আভিজাত্যের দাবি থাকে যে এক্ষেত্রে এমন করতে হবে। উভয় প্রকারের অঙ্গীকার পূর্ণ করা মুসলমানদের কর্তব্য। এই সব বিষয় খুব স্পষ্ট। আসমানের অহী এবং মানুষের জ্ঞান এগুলোকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়।

এ সকল বিধান আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের মৌলিক বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তাই মানুষের উচিত এগুলোর ওপর আমল করা এবং আল্লাহর সরল রাজপথে চলা। যদি সে নিজের বানানো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি ভ্রান্তির পথে চলে তাহলে সরল পথ থেকে ছিটকে পড়বে। নিজের বানানো পথে মানুষ কখনোই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

সবক : ১২০

ভালো ও খারাপ উভয় অবস্থাই মানুষের পরীক্ষার জন্য

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ○ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗ اَحَدٌ○ وَّ لَا يُوْثِقُ وَ ثَاقَهٗ اَحَدٌ○ يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ○ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً○ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ○ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ○

সে বলবে, 'হায়! যদি আমি কিছু আগে পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য'!

সেদিন তার আযাবের মতো আযাব কেউ দিতে পারবে না।

কেউ তার বন্ধনের মতো বন্ধন করতে পারবে না।

হে প্রশান্ত আত্মা!

তুমি ফিরে এসো তোমার রবের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে।

আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।

আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।[১২৫]

ব্যাখ্যা : দুনিয়াতে মানুষ দু'ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়। কখনো পায় আবার কখনো বঞ্চিত হয়। উভয় অবস্থাই আসে মানুষের পরীক্ষার জন্য। মানুষ কোন অবস্থায় কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় তা যাচাই করাই হয় মূল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি কিছু পেলে অহংকার করতে থাকে আর তার থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়া হলে কুকর্মে ডুবে যায়, সে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়।

যে কিছু পেলে আল্লাহর সামনে নত হয়ে শোকরিয়া আদায় করে আর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হলেও আল্লাহর সামনে নত হয়ে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে, সেই সফল। যার সম্পর্কে উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, نفس مطمئنة অর্থাৎ প্রশান্ত চিত্ত।[১২৬]

'নফসে মুত্বমায়িননাহ' অর্থাৎ প্রশান্ত চিত্তের মর্যাদা ওই ব্যক্তিই লাভ করে- যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকেও উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করে। যে প্রমাণ করে দেয় যে, তার স্বার্থ এবং হক মুখোমুখী অবস্থানে চলে এলে সে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হকের ওপর দৃঢ়

---

[১২৫] সূরা ফজর, আয়াত: ২৪-৩০

[১২৬]. যে চিত্ত আল্লাহর স্মরণেই শান্তি লাভ করে। যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই। [অনুবাদক]।

থাকবে। যে একবার হককে মেনে নেয়ার পর আর কখনো হক ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাও সে করে না; যদি এর জন্য তাকে বেদম প্রহার করা হয়, পদদলিত করা হয় অথবা হত্যাও করা হয়।

সবক : ১২১

অহংকার ও দুনিয়া পূজা হক গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ○ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ○

নিশ্চই যারা কুফরী করেছে, তুমি তাদেরকে সতর্ক করো কিংবা না করো, উভয়ই তাদের জন্য বরাবর, তারা ঈমান আনবে না।

আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব।

মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিনের ওপর', অথচ তারা মুমিন নয়।[১২৭]

ব্যাখ্যা : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের চোখ বন্ধ করে রাখে, তাহলে চোখ থাকতেও সে সূর্য দেখতে পাবে না। কোনো ব্যক্তি যদি তার কানে তুলা গুজে রাখে, তাহলে কান থাকার পরও সে বাইরের কোনো আওয়াজ শুনবে না। হকের ব্যাপারটাও এমনই। হকের ঘোষণা যতো স্পষ্টভাবেই দেওয়া হোক না কেনো, কারো জন্য তখনই তা উপলব্ধি করা এবং গ্রহণ করা সহজ হবে যখন সে হকের জন্য নিজের অন্তরের দরজা খুলে রাখবে। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের দরজা বন্ধ করে রেখেছে, তার জন্য আল্লাহর নিদর্শন এবং দাঈর ঘোষণা সবই নিস্ফল।

হকের দাওয়াত এতো বেশি স্পষ্ট হয় যে সবাই এটা বুঝতে পারে। যে কেউ মুক্ত ও খোলা মনে হকের বাণী শোনে, তার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, এটা বাস্তবিকই সত্য। কিন্তু চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি, তার নিজের স্বার্থ অথবা অহংকারের কারণে সে দীন গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের সমাজে ধর্মীয় ও অধর্মীয় বিভিন্ন

---

[১২৭] সূরা বাকারা, আয়াত: ৬-৮

সিংহাসন তৈরি হয়েই যায়। কিছু লোক এসব সিংহাসনের কর্তা হয়ে বসে থাকে। মানুষের বানানো অনেক পদ ও মার্যাদাও তৈরি হয়। কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক স্বার্থও থাকে যা হকের বিরোধী বা অন্যায়। বহু মানুষ সেসব অন্যায় পন্থায় অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত থাকে।

এই অবস্থায় যখন এক অপ্রসিদ্ধ স্থানে আল্লাহ তাআলা নিজের কোনো বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দেন এবং তার মুখে নিজের বক্তব্য প্রচার করা শুরু করেন, তখন প্রতিষ্ঠিত লোকে নিজেদের মর্যাদা হারানোর আশংকা করতে থাকে। অনেকে ভাবে নতুন দীন গ্রহণ করলে তাদের ভোগ বিলাসের জীবন শেষ হয়ে যাবে। হকের বাণী সত্য এবং স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দুটি জিনিসের কারণে তারা হককে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না–

এক. অহংকার

দুই. দুনিয়া পূজা

যারা প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনগুলো দখল করে বসে আছে, তারা এই 'তুচ্ছ লোকটির' কথা মেনে নিজের সম্মানের আসন থেকে নেমে আসতে চায় না। এ কারণেই তারা হককে হক হিসেবে চিনতে পেরেও অস্বীকার করে। হকের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। অনেকে দাঈকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ মনে তার দাওয়াতকে এড়িয়ে যায়। একইভাবে দুনিয়াবী স্বার্থও হককে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা হকের দাঈ তার অন্যায় উপার্জনের বিরোধিতা করে। আবার সে যেহেতু একটি নতুন ও অপ্রসিদ্ধ আওয়াজ নিয়ে দাঁড়ায়, তাই তাকে মেনে নিলে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকে -এসব কারণে তারা দীন গ্রহণ করে না। কুরআনে কারীমে এদের অন্তরের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।'

যে ব্যক্তি অহংকার এবং দুনিয়া পূজায় লিপ্ত থাকে তার মস্তিষ্কের ওপর এমন একটি পর্দা পড়ে যায় যা হক কথাকে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে দেয় না। কোনো কিছুর সম্পর্কে যদি মানুষের মনে বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে সে সহজে আর সেটাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না; যতো শক্তিশালী দলীল প্রমাণই তার সামনে তুলে ধরা হোক না কেনো।

সবক : ১২২

আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ○ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ○ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ○ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ○ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ○ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ○ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং শেষ দিনের ওপর', অথচ তারা মুমিন নয়।

তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায় অথচ তারা যে নিজদেরকেই ধোঁকা দেয়, তারা তা অনুধাবন করে না।

তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলতো।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না', তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'।

জেনে রাখো, নিশ্চই তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বোঝে না।

যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আনো যেমন সব লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনবো যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে? জেনে রাখো, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।

> যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।
>
> আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।
>
> এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয়।[১২৮]

ব্যাখ্যা : যারা নিজের স্বার্থ এবং উপকারকে বেশি গুরুত্ব দেয় তাদের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে হকের রাস্তায় সমর্পণ করে দেয়া মুর্খতা ও বোকামি। এমন ব্যক্তিদের মূল টার্গেট থাকে দুনিয়াবী স্বার্থ। দুনিয়ার স্বার্থ ঠিক রেখে যতোটুকু সম্ভব হকের সাথে সম্পর্ক রাখে সে। এটা করে নিজেকে সে অনেক চালাক ও জ্ঞানী ভাবে। সে ভাবে, এভাবে তার দুনিয়াও ঠিক আছে আর আখেরাতে মুক্তিও সে পাবে। কিন্তু এটা তাদের কল্পিত আত্মতৃপ্তি। দীনের নামে তার স্বার্থ পূজা আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। যখনই দীনের সাথে তার স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয়, তখন সে দীন থেকে দূরে সরে যায় এবং স্বার্থ পূজারীদের দীনে প্রবেশ করে। এভাবে তার নেফাকির ব্যাধি বাড়তেই থাকে।

এই লোকগুলো যখন সত্যিকারের মুসলমানদের দেখতে পায় তখন তারা আফসোস করে যে, তারা শুধুশুধুই সত্যের জন্য নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর বিপরীতে তারা নিজেদের তরীকাকে দূরদর্শী ও বুদ্ধিদীপ্ত তরীকা মনে করে। কেননা তারা দেখতে পায় এই তরিকায় থাকলে কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা ছাড়াই নিজের জীবন সুন্দরভাবে শেষ করা হয়। কিন্তু এটা একদমই নিবুদ্ধিতা। যদি তারা গভীরভাবে ভাবতো তাহলে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ হলো বান্দা শুধু নিজের মালিকের হয়ে যাবে। আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্ক যদি গড়ে না ওঠে এবং বান্দা যদি আল্লাহর পরিপূর্ণ অনুগত না হয়, তাহলে তার ইসলাম গ্রহণ পরিপূর্ণ হয় না। তাদের নিকট এটা বাহ্যত লাভের সওদা মনে হলেও বাস্তবে তা লোকসানের সওদা। কেননা তারা প্রকৃত হক ছেড়ে মিশ্রিত হককে নিজেদের জন্য পছন্দ করেছে যা তাদেরকে পরকালীন প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করছে।

যে নিজের দুনিয়ার কাজকে গুরুত্ব দেয় আর আখেরাতের কাজের ক্ষেত্রে

---

[১২৮] সূরা বাকারা, আয়াত: ৮-১৬

লোক দেখানো কিছু কাজকেই যথেষ্ট মনে করে, সে কোনো প্রতিদানের উপযুক্ত হয় না। যারা এমন করে, তারা অতিদ্রুতই জানতে পারবে, আল্লাহর কাছে তাদের এই ভণ্ডামির জন্য শুধু শাস্তিই আছে।

সবক : ১২৩

পরকালের ফয়সালা হবে কাজ অনুযায়ী

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিরা– যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১২৯]

ব্যাখ্যা : উপরের আয়াতের মাঝে চারটি দলের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

এক. মুসলমান। যারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত।

দুই. ইহুদি। যারা নিজেদেরকে হযরত মুসা আ. এর উম্মত বলে।

তিন. খ্রিস্টান। যারা হযরত ইসা আ. এর উম্মত হওয়ার দাবিদার।

চার. সাবি[১৩০]। যারা নিজেদেরকে হযরত ইয়াহইয়া আ. এর উম্মত বলতো। তারা ইরাকে বসবাস করতো। তারা আহলে কিতাব ছিলো এবং কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায পড়তো। কিন্তু বর্তমানে সাবি দলটির অস্বিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোথাও এখন আর তাদেরকে দেখা যায় না।

এখানে মুসলমানদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং অন্য পয়গম্বদের উম্মতদের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বোঝানো যে, দল হিসেবে আল্লাহর নিকট সকলেই সমান মর্যাদা রাখে। কোনো দলের মানুষ শুধু সেই দলভুক্ত হওয়ার কারণে অন্য দলের মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। সকলের মুক্তির ফয়সালা হবে ঈমান ও নেক আমলের ওপর ভিত্তি করে।

---

[১২৯] সূরা বাকারা, আয়াত: ৬২

[১৩০]. সাবি অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে। [কুরতুবী]। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন হতে তাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিলো। তারা নক্ষত্র ও ফেরেশতা পূজা করতো। হযরত উমর রা. তাদেরকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

কোনো দল যদি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলো অথবা তারা নিজেদের ইহুদি অথবা খ্রিস্টান বলে অথবা সাবি বলে দাবি করলো, তাদের মধ্য থেকে কোনো দলেরই শুধু এই নামের কারণে আল্লাহর নিকট আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং ওই দলের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করেছে। নেক আমলের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করেছে।

সব নবীদেরই অনুসারী হিসেবে তারাই বিবেচিত হতো যারা তার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ঈমান আনতো, নেক আমল করতো এবং নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে নিজের জীবনধারা পাল্টে ফেলতো। তাদের মাঝে এক নতুন সংকল্প জন্মাতো। তাদের যিন্দেগীর নকশা যা কুরিপুর অনুসরণ করে চলতো, তা আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার ওপর চলতে শুরু করতো। এরাই প্রকৃত অর্থে নবীর উম্মত। তাদের জন্যই নবীর পবিত্র যবানে আখেরাতের বিভিন্ন পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু নবীদের মৃত্যুর পর কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা পাল্টে যেতো। তাদের কাছে আল্লাহর দীন কিছু রীতি নীতি, ঐতিহ্য ও উপাখ্যান হিসেবে বিবেচিত হওয়া শুরু করতো। যে সুসংবাদ ঈমান এবং নেক আমলের কারণে দেয়া হয়েছিলো, সেটাকে তারা শুধু ওই উম্মতভুক্ত হওয়ার পুরস্কার মনে করতো। তারা ধারণা করতো যে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের এই দলের বিশেষ কোনো সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের নেই। যে ব্যক্তি এই বিশেষ দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তার আকীদা-বিশ্বাস এবং আমল যেমনই হোক না কেনো, তার মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। জান্নাত একমাত্র তাদের এই দলের জন্য আর জাহান্নাম অন্য সব মানুষের জন্য।

কিন্তু আসল কথা হলো, আল্লাহর কোনো বিশেষ দলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানুষ তার চিন্তা-ভাবনা এবং আমলে কেমন। পরকালের মানুষের মুক্তির ফায়সালা তার কর্মের উপর ভিত্তি করে হবে, বংশীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়।

সবক : ১২৪

আল্লাহর নিদর্শন নীরব ভাষার হয়ে থাকে

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَه جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَه فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَه ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি; ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

তামাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে যায়? এভাবেই আল্লহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।[১৩১]

ব্যাখ্যা : মানুষ যখন প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে কাজ করে তখন সে নিজের অন্তরকে প্রবৃত্তির দাস বানায়। মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে তাহলে সে তার অন্তরকে আল্লাহর দাস বানায়। উভয় ক্ষেত্রেই কখনো সহজ কাজ আসে, কখনো কঠিন কাজ। মানুষ নিজের দুনিয়াবী স্বার্থে অনেক কঠিন পরিস্থিতিতেও কাজ করে। এমন কি প্রাণের ঝুঁকিও নেয়। দীনি কাজের গুরুত্ব মানুষের মনে এরকম থাকা উচিত। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় নিজের টাকা-পয়সা খরচ করা সওয়াবের কাজ, কিন্তু কঠিন পরিস্থিতে আল্লাহর

---

[১৩১] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৫-২৬৬

রাস্তায় নিজের টাকা-পয়সা খরচ করলে সওয়াব অনেক বেড়ে যায়। যে স্থানে খরচ করা দুনিয়ার হিসাবে নিস্ফল সেই স্থানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করা, যাকে দিতে মন না টানে তাকে আল্লাহর জন্য দেয়া। যার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে মন সায় দেয় না তার সঙ্গেও আল্লাহর জন্য ভালো ব্যবহার করা –এগুলো এমন কাজ যা মানুষকে আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি, রহমত ও সাহায্যের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়।

মানুষ যৌবন বয়সে বাগান লাগায় যেনো বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তার ফল খেতে পারে। ওই ব্যক্তির চাইতে হতভাগা আর কে আছে যার সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে রঙিন বাগান তার চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে যায় এমন সময়, যখন সে তার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। এমনই অবস্থা হবে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের, যারা দীনের কাজ দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান ও নিজের স্বার্থে করেছে। তারা যদিও বাহ্যত ভালো এবং নেকের কাজ করছে, কিন্তু তাদের এই কাজ শুধু বাহ্যতই দুনিয়াদারদের থেকে আলাদা ছিলো। বাস্তবতার দিক থেকে তাদের উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

সাধারণ দুনিয়াদাররা দুনিয়ার আয়-উন্নতি এবং খ্যাতির জন্য দুনিয়ার কাজে দৌড়ঝাপ করে, একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দুনিয়ার আয়-উন্নতি এবং সুখ্যাতির জন্য তারা দীনি কাজে দৌড়ঝাপ করে।

সাধারণ মানুষ দুনিয়াবী কাজ করে মানুষের কাছে মর্যাদা পেতে চায়, তারা এই দুনিয়াবী মর্যাদাই পেতে চায় আখেরাতের কাজ করে।

এই লোকগুলো যখন মৃত্যুর পর পরকালে পৌঁছবে, তখন সেখানে তাদের জন্য কিছুই থাকবে না। কেননা তারা যা কিছু করেছে সবই দুনিয়ার জন্য করেছে। সুতরাং তারা তাদের কর্মের ফল আখেরাতে কিভাবে পেতে পারে? আল্লাহর নিদর্শন সর্বদাই প্রকাশ্য হয়, কিন্তু তা বিবৃত হয় নিরব ভাষায়; এর থেকে ওই ব্যক্তিই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যার মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা রয়েছে।

সবক : ১২৫

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ○ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ○

হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।

হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[১৩২]

ব্যাখ্যা : হাঁটতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে মানুষের পদস্খলন ঘটে, তেমনিভাবে জ্ঞানের সফরেও পদস্খলন ঘটে। জ্ঞানের পদস্খলন হলো, কোনো বিষয়কে সঠিকভাবে না দেখতে পারা। কোনো বস্তুর হাকীকত মানুষ ওই সময় বুঝতে পারে, যখন সে তাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। যদি সে ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, তাহলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না; সারাজীবন ভুলের মধ্যেই ডুবে থাকে।

সবক : ১২৬

ইহুদিরা শুধু নিজেদেরই হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করতো

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ○ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ

---

[১৩২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮-৯

مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ○ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ○

কিতাবীদের একদল বলে, 'মুমিনদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনো, আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার করো; যাতে তারা ফিরে আসে'।

'তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস করো, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে'। বলো, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত। এটা এ জন্য যে, কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হবে যেরূপ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের সাথে বিতর্কে পরাজিত করবে'। বলো, 'নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লহর হাতে, তিনি যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'।

তিনি যাকে চান, তাঁর অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

কিতাবীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি তার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখো, তবুও সে তা ফেরত দেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যদি তুমি তার নিকট এক দীনার আমানত রাখো, তবে সর্বোচ্চ তাগাদা ছাড়া সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। এটি এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন পাপ নেই'। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলে।

হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।[১৩৩]

ব্যাখ্যা : যে দলে আম্বিয়া এবং নেককারদের জন্ম হয়েছে, দীর্ঘদিন দীনের চর্চা হয়েছে, তারা হেদায়াতকে তাদের দলীয় জিনিস মনে করে। ইহুদিদের ধারণা এমনই ছিলো। তারা মনে করতো, যারা আমাদের দলের মধ্যে রয়েছে, তারা হেদায়াতের ওপর আছে। যারা আমাদের দলের বাইরে আছে, তারা হেদায়াত থেকে দূরে আছে। হককে দলীয় জিনিস মনে করার কারণে তাদের

---

[১৩৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭২-৭৬

দলের বাইরে হকের আবির্ভাব হলে তারা তা মেনে নিতে পারেনি।

হক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। কোনো দল বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়। তারা যদিও নিজেদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসারী বলতো, কিন্তু তাদের দীন ছিলো দলের পূজা করা। আল্লাহর পূজা তারা করতো না। এ কারণেই নিজের দলের বাইরের কারো বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তারা স্বীকার করতে পারতো না। স্পষ্ট দলীলাদি সামনে আসার পরও তারা তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। তারা নিজেদের দলের বাইরের যে কোনো দাওয়াতের কঠিন বিরোধিতা করতো। বিভিন্ন ভাবে হকের দাওয়াতকে রুখে দেয়ার অপচেষ্টা চালাতো। তারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা রটিয়ে দিয়ে লোকদেরকে দাওয়াতের সততার ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলার চেষ্টা করতো। তারা নিজেদের কাজকর্ম এক মানদণ্ডে এবং নিজেদের দলের বাইরের লোকদের কাজকর্ম অন্য মানদণ্ডে বিচার করতো।

কাউকে নিজের দীনের প্রতিনিধি হিসেবে কবুল করা তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত। এর ফায়সালা দলীয় শক্তি-সামর্থের উপর ভিত্তি করে হয় না। এই সৌভাগ্য ওই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যাকে আল্লাহ নিজের জ্ঞান অনুযায়ী উপযুক্ত মনে করেন। আল্লাহ ওই ব্যক্তিকেই নিজের দাঈ হিসেবে কবুল করেন, যে আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে এভাবে জড়িয়ে নেয় যে– তিনি রক্ষক হয়ে যান, যাকে সে ভয় করে, তিনি তার মনিব হয়ে যান, যার সঙ্গে কৃত আনুগত্যের অঙ্গীকারকে সে কখনো এড়িয়ে যায় না।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই নিজের অঙ্গীকারের উপর অটল-অবিচল থাকে। এমন লোকদের ওপরই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এর বিপরীতে যারা অঙ্গীকার রক্ষায় অবহেলা করে অঙ্গীকার পূর্ণ করার গুরুত্ব অনুভব করে না, আল্লাহর নিকট তাদের কোনো মূল্য নেই। এমন লোকদেরকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

সবক : ১২৭

আল্লাহর পরিচয় লাভের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ○ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ○ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ○ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে এদের জন্য কোনো অংশ নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্যই রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব।

তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা নিজদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে করো, অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা আল্লহর উপর মিথ্যা বলে, অথচ তারা জানে।

কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে'।

তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করো। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন?[১৩৪]

---

[১৩৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৭-৮০

ব্যাখ্যা : কেউ যখন ঈমান আনে তখন সে আল্লাহর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং ওই সকল দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করবে যা আল্লাহর শরীয়ত তার ওপর আবশ্যক করে। মুমিনের জীবন অনুগত জীবন। প্রবৃত্তির স্বাধীনতাকে বিলীন করে দিয়েই মুমিন হতে হয়। নিজের সব দুনিয়াবি স্বার্থ কুরবানি দিতে হয়। এ জন্য ঈমানের অঙ্গীকার সেই পূর্ণ করতে পারে, যে ক্ষতির মুখে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ঈমান গ্রহণ করে।

নিজের উপর কোনো আঘাত এলে অথবা দুনিয়ার স্বার্থ ক্ষতির মুখে পড়লে কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভুলে যায় এবং নিজের স্বার্থের দিকে ঝুকে পড়ে, সে যেনো আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করলো। যখন আখেরাত এবং দুনিয়ার কোনো একটাকে বেছে নিতে বলা হয়, তখন সে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি আখেরাতকে এতো মূল্যহীন মনে করে সে আখেরাতে কিভাবে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হতে পারে?

যারা আখেরাতকে পণ্য বানায় তারা দীন এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে না; বরং দীন এবং আখেরাতকে স্বীকার করেই এমনটি করে। অতঃপর এই দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে নানা ভুল যুক্তি ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এক জায়গায় আনতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ তারা দীনি শিক্ষাকে নিজেদের মনগড়া অর্থে গ্রহণ করে। এই লোকগুলো নিজের দুনিয়া পূজাকে আল্লাহর আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য দীনি শিক্ষাকে নিজের মতো করে বর্ণনা করে। কখনো আল্লাহর কথাকে পরিবর্তন করে আবার কখনো আল্লাহর কথাকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার স্থলে আল্লাহর কিতাবকেই পরিবর্তন করে। নিজের অধার্মিক জীবনকে ধার্মিক প্রমাণ করতে আল্লাহর কিতাবে যা নেই তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে; যা অনেক বড় গুনাহের কাজ।

যে শিক্ষা আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, মানুষের ভয় এবং ভালোবাসার আগ্রহকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এর বিপরীত যে শিক্ষা মানুষের আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু গাইরুল্লাহকে বানিয়ে দেয়, সেটা ভ্রান্তি ও কুফুরির শিক্ষা। বাহ্যত তার উপর যতই হকের লেবেল লাগানো হোক না কেনো, তারপরও তা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট।

সবক : ১২৮

তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ○ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا○ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا○

তুমি কি সে সব লোককে দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং চায় যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং আল্লহ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবেও।

ইহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম'। আর তুমি শোন না শোনার মতো, তারা নিজদের জিহ্বা বাঁকা করে এবং দীনের প্রতি খোঁচা মেরে বলে, 'রা'ইনা'[১৩৫]। আর তারা যদি বলতো, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং তুমি শোনো ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো' তাহলে এটি হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে।[১৩৬]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কিতাব কোনো দলকে দেয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে তারা এর মাধ্যমে নিজের চিন্তা-চেতনা এবং আমলকে সংশোধন করবে। কিন্তু যখন

---

[১৩৫] আরবীতে 'রা'ইনা শব্দের অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধান করুন'। ইহুদিরা শব্দটিকে বিকৃত করে উচ্চারণ করতো, যা তাদের ভাষায় [হিব্রুতে] গালি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ সম্পর্কে আরো দ্র. সূরা বাকারার ১০৪ নং আয়াতের টীকা।

[১৩৬] সূরা নিসা, আয়াত: ৪৪-৪৬

আসমানি কিতাবের ধারক কোনো সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়, তখন তারা আল্লাহর কিতাব থেকে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী গ্রহণ করতে থাকে। ধর্ম বিশ্বাসের নামে তারা নিজেদের উদ্ভাবিত দর্শন প্রচার করে। তারা এমন এক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটায়, দীনের প্রকৃত বিধিবিধানের সাথে যার কোনো সম্পর্কই নেই।

এই লোকগুলো নিজেদেরকে হকের মানদণ্ড মনে করার কারণে নিজের প্রতিটি কথাকে আল্লাহর কথা হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা চালায়। তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডগুলোকে দীনি ও বৈধ কর্মকাণ্ড বলে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর কিতাবকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেয়। আল্লাহর কালিমাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। তারা শব্দকে উল্টে পাল্টে এমন উদ্দেশ্য বের করে, আল্লাহর প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

'ইহুদিরা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছিলো।' এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা তো আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলো; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের ওপর আমল করা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিলো। শব্দের বিচারে তারা কিতাবের ধারক ঠিকই ছিলো; কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে তারা দুনিয়াপূজারীদের মতোই আমল করতো। সাধারণ দুনিয়াদাররা নিজেদের দুনিয়াদারীকে দুনিয়াদারীর নামেই করে থাকে। কিন্তু তারা আরও জঘন্য কাজ করতো। তারা নিজেদের দুনিয়া লাভের জন্য আল্লাহর কিতাব থেকে দলীল পেশ করতো।

অতঃপর তাদের এই ভ্রান্তি শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর দীনের প্রতিনিধি ভাবতো। এ জন্য যখন ইহুদি ছাড়া অন্য আরব গোত্রের লোকেরা শেষ নবীর ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলো, তখন ইহুদিরা নিজেদের ধর্মের সুখ্যাতি টিকিয়ে রাখার জন্য নবীর বিরোধি হয়ে গেলো। তারা নবীর জীবন এবং শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত যুক্তি বের করে জনগণকে এই সন্দেহে নিপতিত করতে লাগলো যে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত নন; বরং ইনি নিজেই নিজেকে আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডাবাহী দাবি করছেন।

সবক : ১২৯

মিশ্রিত দীন ও খাটি দীন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না।

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করতো, তা সম্পূর্ণ বাতিল।[১৩৭]

ব্যাখ্যা : দীন দুই ধরনের–

এক. ভেজাল দীন

দুই. খাটি দীন

ভেজাল দীন লেবেল লাগানো দুনিয়াদারির নাম। দুনিয়া এবং দীন একত্র করার চেষ্টা থেকে এই দীনের জন্ম। প্রত্যেক যুগেই ভেজাল দীনের ওপর ভিত্তি করে বড় বড় সংগঠন ও খানকা গড়ে ওঠে। স্বার্থ পূজারী লোকগুলো এসব সংগঠনের মাধ্যমে দীনের নামে দুনিয়া উপার্জন করে নেয়।

সত্যিকারের দীনের দাওয়াত হয় পুরোপুরি আখেরাতমুখী। দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করাকে কখনো সত্যিকার দীন বলা হয় না। যারা ভেজাল দীনের নামে ইজ্জত-সম্মান লাভ করেছে, তাদের সামনে যখন সঠিক দীনের দাওয়াত আসে, তখন তারা খুব ভীত শংকিত হয়ে ওঠে। তারা ভাবে, আমরা যদি সঠিক দীন মেনে নেই, তাহলে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের সব উপকরণ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তাদের কোনো এলাকায় যখন সঠিক দীনের দাওয়াতের আবির্ভাব হয়, তখন দাঈকে খুব ভয়ানক পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। সত্য দীন গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যারা দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান এবং স্বার্থকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সত্যিকার দীন গ্রহণ না করে, তাদের সব কাজ দুনিয়ার উদরে চলে যায়। কেননা তারা ওই দীনের অনুসরণ করে, যাতে তাদের

---

[১৩৭] সূরা হুদ, আয়াত: ১৫-১৬

দুনিয়াবী স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। দুনিয়াবী স্বার্থ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহর সত্য দীনের অনুসরণ করে না। তারা বাহ্যত দীনি কাজকর্মের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। কিন্তু দুনিয়া উপার্জনই হয় তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাদের জন্য পরকালে কোনো ভালো পরিণামের আশা করা যায় না।

তারা যদিও নিজেদের কর্মকাণ্ডকে দীন বলতো; কিন্তু তারা নিজস্ব গোত্রের মেলার ওপর ধর্মীয় উৎসবের সাইনবোর্ড লাগাতো। তারা নিজেদের স্বগোত্রীয় যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ বলতো। তারা দুনিয়াবী স্বার্থে কাজ করতো আর সেটাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতো।

সবক : ১৩০

আল্লাহর নিকট আমল অনুযায়ী ফয়সালা

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّه فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ○ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّه لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ اِنِّيْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ○ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِه عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ○

নূহ তার রবকে ডেকে বললো, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক'।

তিনি বললেন, 'হে নূহ, সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেনো তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও'।

সে বললো, 'হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো'।[১৩৮]

ব্যাখ্যা : হযরত নূহ আ. এর প্লাবনের সময় যারা পানিতে ডুবে গিয়েছিলো তাদের মধ্যে হযরত নূহ আ. এর ছেলে কিনআনও ছিলো। হযরত নূহ আ. তাকে

---

[১৩৮] সূরা হুদ, আয়াত: ৪৫-৪৭

নিজের নৌকাতে ওঠাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তার জন্য ডুবে যাওয়ার ফায়সালা ছিলো; তাই সে নৌকাতে ওঠেনি। তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেয়া হয়েছিলো, এটা মূর্খতা; এমন প্রার্থনা করো না।

আল্লাহর ফায়সালা বংশ পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে হয় না। যারা বুযুর্গদের সন্তান অথবা হযরতের জামাই, তারা কেয়ামতের দিন কোনো বিশেষ সুবিধা পাবে না। আল্লাহর দরবারে মুক্তির ফায়সালা হবে আমলের ওপর ভিত্তি করে।

হযরত নূহ আ. এর প্লাবন এসেছিলো মানুষের মধ্যকার অন্য সকল বিভক্তি ভেঙ্গে দিয়ে শুধু ঈমান ও কুফরের দিক থেকে ভাগ করতে। যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহর নৌযানে আরোহণ করিয়ে রক্ষা করা হয়েছিলো আর সকল কাফের প্লাবনের নির্দয় তরঙ্গে ডুবে মরেছিলো। এরকম ঘটনাই কিয়ামতের ময়দানে ঘটবে।

সবক : ১৩১

আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ○

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।[১৩৯]

ব্যাখ্যা : জুলুমের কারণে পাকড়াও করার একটি পদ্ধতি হলো, জুলুম করার পরপরই জালিমকে পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি দেয়া। কিন্তু আল্লাহর নিয়ম এটা নয়। যদি আল্লাহ তাআলা এমনটি করতেন তাহলে পৃথিবীর কেউ বেঁচে থাকতে পারতো না। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ব্যক্তি এবং গোত্রকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ দিয়েছেন। ওই সময় পর্যন্ত সকলকে তিনি অন্তরের নিঃশব্দ আহ্বান অথবা বাহ্যিক সতর্কবাণী শুনে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দেবেন। নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ মানুষের পেছনের সকল অপরাধ ক্ষমা

---

[১৩৯] সূরা নাহল, আয়াত: ৬১

করে দেন। তওবাকারী পুরোপুরি নিষ্পাপ হয়ে যায়; যেনো তওবার পর নতুন করে তার জীবন শুরু হয়েছে, যেনো সে কখনো কোনো পাপ করেনি।

অবকাশের সময়ের মধ্যে যেমন পাকড়াও না করা আল্লাহর নীতি, সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে পাকড়াও করাও তার নীতি। সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর তিনি অবকাশ দেন না।

সবক : ১৩২

মানুষ হক প্রত্যাখ্যানের শাস্তি তৎক্ষণাৎ পায় না

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ○ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ○

তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান, তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা হতে তারা কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।

ওই সব জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট কাল।[১৪০]

ব্যাখ্যা : মানুষ হক প্রত্যাখ্যান করে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। তারপরও তৎক্ষণাত সে এর শাস্তি পায় না। শাস্তি না পাওয়ার কারণে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করতে থাকে। আরো বেশি গুনাহ করতে থাকে। অথচ তাকে পাকড়াও না করাটা হয় পরীক্ষা। সুখে শান্তিতে থাকার অর্থ এই নয় যে তার অপরাধের শাস্তি সে পাবে না।

মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। অতীতের পাপীদের পরিণাম তাদের সামনে বিদ্যমান। এ থেকে উপদেশ নিতে পারে। পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু গোত্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্থান হয়েছিলো। অবকাশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যেহেতু পূর্ববর্তীরা তাদের অবধ্যতার শাস্তি পেয়েছে, তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব মানুষকেই নিজেদের অপরাধগুলোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব সাবধান! সাবধান!!

---

[১৪০] সূরা কাহাফ, আয়াত: ৫৮-৫৯

সবক : ১৩৫

হকের দিকে ডাকলে মানুষ শত্রু হয়ে যায়

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ○ وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ○ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ○

যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ প্রতিহত করো; তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।

বলো, 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'।

হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।'[১৪৩]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর দাঈ যখন হকের পথে আহ্বান করে তখন লোকজন তার শত্রু হয়ে যায়। তারা তার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করতে থাকে। তারা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে থাকে। ওই সময় দাঈর মাঝেও জবাব দেওয়ার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তার মনে এই খেয়াল আসে যে, যারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, আমিও তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবো। আমি নীরব থাকলে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে এবং তারা আরো বেশি খারাপ কাজ করবে।

এরকম চিন্তা ভাবনা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান কঠিন মুহূর্তে মানুষকে প্রতারিত করতে চায়। তাকে সঠিক রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এই অবস্থায় দাঈ এবং মুমিনের উচিত হলো, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। প্রতিশোধমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়া।

---

[১৪৩] সূরা মুমিনূন, আয়াত: ৯৬-৯৮

সবক : ১৩৬

দেখার পর মেনে নেওয়ার গুরুত্ব নেই

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ○ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ○ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ○ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُوْنِ○

'আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করা হতো না?' তারপর তোমরা তা অস্বীকার করতে'।

তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিলো, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট'।

'হে আমাদের রব, এ থেকে আমাদেরকে বের করে দিন, তারপর যদি আমরা আবার তা করি তবে অবশ্যই আমরা হবো জালিম।'

আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাকো, আমার সাথে কথা বলো না।'[১৪৪]

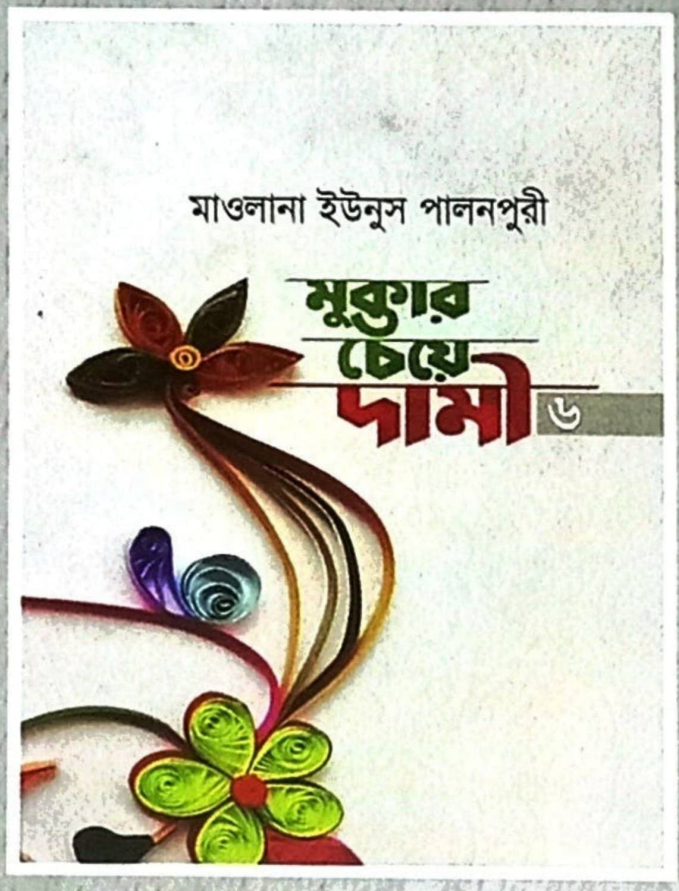
ব্যাখ্যা : আখেরাত নিজের চোখে দেখার পর কাউকে আবার বর্তমান দুনিয়ায় ফিরে এসে সঠিক আমল করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এই জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ দেখতে চান, না দেখে কারা তাকে বিশ্বাস করে, তার বিধি বিধান মেনে চলে। পরকালীন জীবন দেখে ফেলার পর আর পরীক্ষা বাকি থাকবে না। তখন আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করারও কোনো মূল্য থাকবে না।

॥ আলহামদুলিল্লাহ ॥

---

[১৪৪] সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১০৫-১০৮





আকিক পাবলিকেশন্স

শুনি অসীমের আহ্বান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৩৩২১৪, ০১৭২৪৬০৪১৩৬
E-mail : akikpublication@gmail.com